শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী

পঞ্চম খণ্ড

গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী
প্রণীত

ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
সম্পাদিত
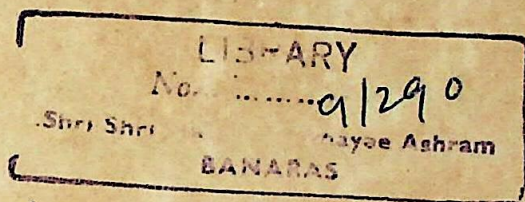
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী

কারুণ্যামৃত ধারা

পঞ্চম খণ্ড

গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী
সম্পাদক, মহানাম সম্প্রদায়
প্রণীত

মহেশ লাইব্রেরী।
পুস্তক-বিক্রেতা।
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-১২

ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
সম্পাদিত

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণীর পৃষ্ঠাঙ্ক প্রথম খণ্ড হইতে চতুর্থ খণ্ড পর্য্যন্ত ৯২৩ পৃষ্ঠা হইয়াছিল। এই পঞ্চম খণ্ডে ভুলক্রমে পৃষ্ঠাঙ্ক ১ হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব খণ্ড সহ মিলনে এই খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ১২২২ হইল।

॥ জয় জগদ্বন্ধু ॥

পুজ্যপাদ কুঞ্জদাদার বাণী

অনাস্বাদিত মাধুর্য্য প্রদানায়াবতারণং।
শ্রীহরিপুরুষং বন্দে শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরম্॥

হা করুণার সিন্ধু! হা জীবপাবন অনাথ বন্ধু! "মাধুর্য্যে ভগবত্তাসার।" জীবের কি সৌভাগ্য। শ্রীশ্রীবন্ধুহরি শ্রীমুখে কোন সময়ে বলিয়াছিলেন, "যে দিন রাস্তার ইট পাটকেল সজীব পদার্থের মত নৃত্য করতে থাকবে, সেদিন জগদ্বন্ধু নামের সার্থকতা জান্‌বি।" কৃপাসিক্ত ভাগ্যবান্ ভক্তগণ শ্রীবন্ধু নামের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন।

"কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণ লীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ॥"
"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"
"প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ।"

শ্রীনাম যখন কৃপা করে জিহ্বায় স্ফুরিত হন, তখনই নাম করিতে পারে। শ্রীরূপ যখন কৃপা করে আত্মপ্রকাশ করেন ও শ্রীলীলা যখন স্বেচ্ছায় উদিত হন তখনই দর্শন ভাগ্যে হয়। যাহাকে অন্যে প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু যাহা নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে তাহাই স্বপ্রকাশ। যেমন সূর্য্য নিজে উদিত না হইলে জীব তাহাকে দেখিতে পায় না।

"মহাউদ্ধারণ আরম্ভ। একান্ন রাগে মহাউদ্ধারণ গান করিতে হয়।" শ্রীশ্রীমহানাম কীর্ত্তন সঙ্গে শ্রীশ্রীমহানামী বন্ধুর লীলাকথা প্রকাশ হইতেছেন। তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন অপ্রাকৃত লীলাকথা প্রকাশ করিতে কে সমর্থ!

"যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্য সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।"

পরম দয়াল শ্রীশ্রীপ্রভুর করুণায় বন্ধুলীলাকথা শ্রীশ্রীবন্ধু-লীলা তরঙ্গিণীতে দর্শনের ভাগ্য পাইলাম। জয় জগদ্বন্ধু

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধাম
ডাহাপাড়া
মুর্শিদাবাদ

কাঙ্গাল—
কুঞ্জদাস

জয় জগদ্বন্ধু হরি...

নিবেদন

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেইজন যায় কৃষ্ণচৈতন্যের পাশ॥

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হইলেন। সূর্য্যের মত স্বপ্রকাশলীলা আপন ইচ্ছায় প্রকাশ পাইলেন। চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন প্রায় চারি বৎসর পুর্ব্বে। প্রত্যেক বৎসর এক খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইবেন এইরূপ ক্ষীণ সংকল্প মনের তলায় ছিল। তাহা পুর্ণ হয় নাই। আজ দীর্ঘ বিলম্বের পর পঞ্চম খণ্ড ব্যক্ত হইলেন। বিলম্বের কৈফিয়ৎ আর কি দিব? ইচ্ছাময়ের লীলাকথাও ইচ্ছাময়। ইহাই প্রকৃত কারণ মনে করি।

তবে এই দীর্ঘকাল পঞ্চম খণ্ড ব্যক্ত না হইবার জন্য ভক্তগণের মধ্যে বিশেষ আর্ত্তিপুর্ণ আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিয়াছি। অনেকেই আন্তরিক আগ্রহের সহিত গ্রন্থ চাহিয়াছেন, পত্র দিয়াছেন, কালবিলম্বের জন্য প্রীতির ভৎর্সনাও করিয়াছেন। তাহাদের লালসা গ্রন্থকে বাহির করিয়া আনিয়াছে এমত বলিতে পারি। স্বেচ্ছাময় হইলেও তিনি ভক্তেচ্ছা-পুরণব্যগ্র। "ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু"। তাঁহাকে আস্বাদনের সেতুস্বরূপ এই লীলাগ্রন্থও ভক্তের আকুতিতে আলোতে আসিলেন।

শ্রীউপেন্দ্র... সরকার

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যে তাহাদের দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডও ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহাকে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করিয়া—ষষ্ঠ খণ্ড যে কতদিনে প্রকটিত দেখিতে পাইব তাহা বলিবার শক্তি রাখি না। যাহারা বন্ধু-সুন্দরের কথা ভালবাসেন তাহারা যতই আকুলভাবে অন্তরে গ্রন্থ চাহিবেন, ততই শীঘ্র পাইবেন—এমত আশা করি।

এই খণ্ডে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গন স্থাপনের সূচনা পর্য্যন্ত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী খণ্ডে ১৩০৯ সনে শ্রীঅঙ্গনে মহামৌনব্রতের আরম্ভ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইবেন মনে করি। এই পর্য্যন্ত পাণ্ডুলিপি খসড়া তৈয়ারী আছে। তৎপরবর্ত্তী ১৬ বৎসর ৮ মাস মহাগম্ভীরা বাসের মহালীলা সপ্তম খণ্ডের বিষয়বস্তু হইবেন। উহা যে কীভাবে ব্যক্ত হইবেন—লীলাশক্তিই জানেন। ভক্তগণ কৃপাশক্তি সঞ্চার না করিলে ঐ দুর্বেদনীয় লীলাগহনে প্রবেশ লাভ কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না। তাই সর্ব্বচরণে কৃপাভিক্ষা করি। ঐ সময়কার লীলাকাহিনী যার যেটুকু জানা আছে লিখিয়া পাঠাইয়া এ জীবাধমকে কৃতকৃতার্থ করিবেন।

এই খণ্ডে দেবী সুরতকুমারী, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ব্রজেন্দ্র নিয়োগী, সুধন্ব সরকার, রাধাবল্লভ সাহা প্রমুখ ভক্তগণের কথা যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সকলই তাঁহাদের মুখে শ্রুত। রমেশচন্দ্রের যে কয়েকখানি পত্র আছে, উহা পূর্ণচন্দ্র ঘোষের নিকট প্রাপ্ত। রমেশদাদার পদপ্রান্তে বসিয়াও কিছু লীলাকথা শ্রবণের ভাগ্য আমার হইয়াছিল। গ্রন্থের কতকাংশ নবদ্বীপ দাস দাদাজীবনের নিকট পাওয়া। কিয়দংশ মহেনদার জগদগুরু গ্রন্থ হইতে লওয়া। গ্রন্থের প্রান্তে "হরিকথা আস্বাদন" নিবন্ধটি প্রীত্যাস্পদ শ্রীনবদ্বীপ ঘোষ মহোদয়ের লেখনী প্রসূত। ওটি পূর্ব্বে হরিকথা গ্রন্থের ভূমিকাকারে লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থ প্রারম্ভে শ্রীপত্রখানি ভক্তবর শ্রীহরিদাস সাহার দান।

গ্রন্থের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি পূজ্যপাদ কুঞ্জদাদার দৃষ্টিগোচর করিয়াছি। তাঁহার উপদেশ ও ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছি। লীলার কাহিনী ভক্তমুখের দান। খসড়া তৈয়ারী আমার অযোগ্য হাতে। শেষ প্রেসকপি শ্রীমান মহানামব্রতের সাজান। প্রুফ সংশোধন ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য শ্রীমান কৃষ্ণকুমারের সমাধান। সকলের মূলে লীলাময়ের কারুণ্যশক্তি ক্রিয়াবতী।

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীলেখনীতে ব্যক্ত, নন্দনন্দন শ্যামসুন্দরের একটি মধুর উক্তি :—

আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়॥

অভিন্ন নন্দনন্দন দীননাথ-প্রাণধন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের লীলা নিত্যই নব-নবায়মান। পরিবেশকদের সর্ব্বত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া প্রেমাতুর ভক্তগণ নিজ নিজ প্রেমানুরূপ আস্বাদন করিবেন—ইহাই গলবাসে প্রার্থনীয়।

দীন কাঙ্গাল

গোপীবন্ধু দাস
শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর

শ্রীশ্রীবন্ধু-নবমী
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩
হরিপুরুষাব্দ ৮৬

শ্রীবনমালী রায়ের প্রতি
কৃপাপত্রী

ওঁ

Nabadwip.

কল্যাণবরেষু

হেথায় আছি। ভোগ না ছাড়্‌লে অধিক দিন বাঁচা যায় না। নাড়ী মোটা হ'লে অপকার বই উপকার হয় না। অধিক খেলে অশান্তি ও ভার ভার বোধ হয়। যা খেতে মিষ্টি, তা ফেলে রাখ্‌তে হয়। উঠ্‌লে আনন্দ। না শু'য়ে যত ব'সে থাকা যায় ততই ভাল। একাসনে। পা যত লাগে লাগুক। সহ্য করতে হয়। খলের সহিত অধিক কথা কইতে নেই। ব্যবহারও। সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তিকে আকর্ষণ করাই ভাল।

খল ও কেউটেগুলিকে সরানই ভাল। সাবধানে, যতনে, গোপনে ও কৌশলে।

মন্দিরের চূড়ায় যেন চক্র না থাকে। চক্র ঐশ্বর্য্যান্তর্গত। শুধু বাঁশী ও রাজনন্দিনীর নাম। কাঁচা সোনার অক্ষরে লেখা চাই।

গান দুটি * উপহার দেওয়া গেল।

---

*এই দু'ইটি গানের মধ্যে একটি গান আমরা পাইয়াছি। উহা যেভাবে পাওয়া গিয়াছে সেইভাবেই পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। ঐ হস্তাক্ষর প্রভু বন্ধুসুন্দরের নহে, কোন প্রিয়জনের দ্বারা লিখাইয়াছেন, এরূপ মনে হয়।

রাগিনী ঝিঁঝিট — তাল মধ্যমান

শুনিলাম শ্যাম-অলি আসিবেনা এ গোকুলে।
ধরামনে কমলিনী ব্যথিতা বিরহ-শূলে॥
মধুর ব্রজ-কাননে,
শ্যাম-প্রেম-সমীরণে,
প্রফুল্ল প্যারী-প্রসূন,
হেঁসেছিল যৌবন্দুলে;
আর কি সে ভৃঙ্গ আসি বসিবেরে প্যারী-ফুলে॥

Presented to
Bhupani
Banamali das Ray
By
Jagat Bandhu Bhattacharjee-
Jakir

পত্রে ঠিকানা
Sashi Bhusan Bhagabatratn's Toal.
Nabadwip.

শ্রীবনমালী রায়ের প্রতি
কৃপাপত্রী

ওঁ

Nabadwip.

কল্যাণবরেষু

হেথায় আছি। ভোগ না ছাড়্‌লে অধিক দিন বাঁচা যায় না। নাড়ী মোটা হ'লে অপকার বই উপকার হয় না। অধিক খেলে অশান্তি ও ভার ভার বোধ হয়। যা খেতে মিষ্টি, তা ফেলে রাখ্‌তে হয়। উঠ্‌লে আনন্দ। না শু'য়ে যত ব'সে থাকা যায় ততই ভাল। একাসনে। পা যত লাগে লাগুক। সহ্য কর্‌তে হয়। খলের সহিত অধিক কথা কইতে নেই। ব্যবহারও। সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তিকে আকর্ষণ করাই ভাল।

খল ও কেউটেগুলিকে সরানই ভাল। সাবধানে, যতনে, গোপনে ও কৌশলে।

মন্দিরের চূড়ায় যেন চক্র না থাকে। চক্র ঐশ্বর্য্যান্তর্গত। শুধু বাঁশী ও রাজনন্দিনীর নাম। কাঁচা সোনার অক্ষরে লেখা চাই।

গান দুটি * উপহার দেওয়া গেল।

---

*এই দু'ইটি গানের মধ্যে একটি গান আমরা পাইয়াছি। উহা যেভাবে পাওয়া গিয়াছে সেইভাবেই পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। ঐ হস্তাক্ষর প্রভু বন্ধুসুন্দরের নহে, কোন প্রিয়জনের দ্বারা লিখাইয়াছেন, এরূপ মনে হয়।

রাগিণী ঝিঁঝিট — তাল মধ্যমান

শুনিলাম শ্যাম-অলি আসিবেনা এ গোকুলে।
ধরাসনে কমলিনী শ্যামচিন্তা বিরহ-শূলে ॥
মধুর ব্রজ-কাননে,
শ্যাম-প্রেম-সমীরণে,
প্রফুল্ল প্যারী-প্রসূন,
হেঁসেছিল যৌবনদুলে;
আরকি সে ভৃঙ্গ আসি বসিবেরে প্যারী-ফুলে ॥

Presented to
Dhupani
Banamali das Ray

By
Jagat Bandhu Bhattacharjee
Jakir

পত্রে ঠিকানা
Sashi Bhusan Bhagabatratn's Toal.
Nabadwip.

ভবের মু'টে

গভীরা রজনী, রাজত্ব করিছে, বাকচর গ্রাম জুড়ি।
প্রভুবন্ধু রঙ্গে, গোপাল মিত্র সঙ্গে, এল নানাদিক ঘুরি ॥
বৃদ্ধ হরিমিত্র, জড়াজীর্ণ গাত্র, রাতে চোখে ঘুম নাই।
তাহার বাড়ীটি, যেতে পাশ কাটি, সুধাল "কে যায় ভাই ?"

"গোপাল মিত্র আমি" উত্তরে গোপাল,
"তা' সঙ্গে আর আছে কেহ ?"
"একজন মু'টে," ভক্ত কহি উঠে,
সুচতুর বটে সেহ ॥

কতদূর গিয়া, অমিয়া বর্ষিয়া প্রভুবন্ধু হাসি কয়।
"শুনহে গোপাল, বলিয়াছ ভাল, আমার যে পরিচয় ॥"
আমি তোমাদের, মু'টে সকলের, ভবের মু'টে যে আমি।
দৈন্য ক্লেশ ভরা, পাপের পশরা, বহি রে দিবস যামী ॥

বোঝা দেও বলি, ডাকি ডাকি বুলি, জগতের দ্বারে দ্বারে।
বহিতে না পারে, পিঠ ভেঙ্গে পড়ে, তবু তো না দেয় মোরে ॥
বোঝা কাড়ি নিতে, সবে শান্তি দিতে, এবার এসেছি নামি।
পাতক-মন্দার, ভার বহিবার, একমাত্র মু'টে আমি ॥

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ॥

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী
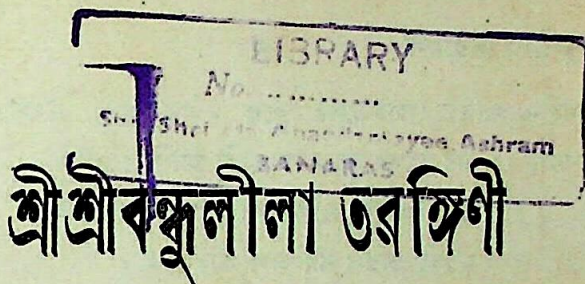
কারুণ্যামৃত ধারা

প্রেমের আকর্ষণ

পাত্রাপাত্র-বিচারণাং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষ্যতে
দেয়া দেয়-বিমর্শকো ন হি নবা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।
সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণ প্রণমন ধ্যানাদিনা দুর্লভম্
দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিঃ॥

—শ্রীপ্রবোধানন্দ

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের সুনির্ম্মল যশোসৌরভ চন্দ্ররশ্মির মত দশদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। দেশ-দেশান্তর হইতে অগণিত নরনারী রাতুল চরণ সন্নিধানে ছুটিয়া আসিতেছে। নিত্য নূতন লোক, স্রোতের মত আসে। যেথায় যখন থাকেন সর্ব্বদা লোক সংঘট্ট। স্থান সঙ্কুলন হয় না। কীর্ত্তন, নর্ত্তন, বিপুল আনন্দ কোলাহল। সকলের মুখে হরিনাম। নিত্য মহামহোৎসব লাগিয়াই আছে।

খোল করতালের ধ্বনিতে প্রাণ নাচে। উদ্দণ্ড নৃত্যগীত ও কীর্ত্তনের রোলে দিগদিগন্ত ভরিয়া যায়। নারী-কণ্ঠের উলু-ধ্বনিতে গ্রাম-গ্রামান্তর মুখর হইয়া উঠে। বালক-বালিকাদলে নৃত্যোল্লাস, বৃদ্ধের চোখে মুখে নব উদ্দীপনার উজ্জ্বল আভা,

দীনহীন পতিত কাঙ্গালের বুকে নবীন আশা উৎসাহের পূর্ণ জোয়ার। নব যুগের নূতন কাণ্ডারী আসিয়াছেন।

"প্রভু আইলা বলি লোক হৈল কোলাহল।
মনুষ্য ভরিল সব জল আর স্থল॥"

বন্ধুসুন্দরের অবস্থিতি স্থান কখনও বাকচর অঙ্গন, কখনও ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ী, কখনও বদরপুর প্রিয় বাদলের গৃহ, কখনও কৃপা-সঞ্জীবিত মোহান্ত ভক্তদের দীন পল্লীকুটির। যেখানেই থাকেন, সর্ব্বত্রই ভক্ত সমাগম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে।

কতজন কত ভাব কত অভিলাষ লইয়া আসে। রোগী আসিয়া স্বাস্থ্য কামনা করে। পতিত আসিয়া উদ্ধারণ চায়, রাঙ্গাপদে শরণ ভিক্ষা মাগে। ধর্ম্ম-পিপাসু ছুটিয়া আসে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার আগ্রহে। সংসার তাপদগ্ধজীব তাপ হইতে চির অব্যাহতির আশায় স্থান চায় শ্রীচরণ ছায়ায়।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের জীবনের মধ্যে সত্য নিষ্ঠা পবিত্রতা, বিশ্ব-জনীন উদারতা, হরিনামে প্রেম বিহ্বলতা দর্শন করিয়া কি বালক কি যুবক, কি প্রৌঢ় কি বৃদ্ধ, কি পুরুষ কি নারী সকলেই মুগ্ধ। সকলেই ঐ দেবদুর্ল্লভ চরণাশ্রয়ে কৃপা-কণিকা প্রার্থী। যিনি একবার প্রভুবন্ধুর কাছে আসিলেন, তিনি নূতন মানুষ হইয়া গেলেন। যিনি দর্শন স্পর্শন পাইলেন, তিনি চিরজীবনের জন্য আপন জন হইয়া রহিলেন।

বন্ধুসুন্দরের আপ্যায়ণ সরল মধুর। আনত নয়ন কারুণ্যপূর্ণ। ব্যবহার প্রাণময়। উপদেশগুলি প্রত্যেকের ভাব ও অবস্থানুকূল।

স্নেহপূর্ণ চাহনী একটিবার যাহার উপর বর্ষিত হইয়াছে, তিনি ফাঁদে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন।

জাতিবর্ণের বাদবিচার নাই। ছোট বড় বাছাই নাই। নীচ পতিত পথভ্রষ্টের প্রতি উপেক্ষা নাই। প্রেমের বিশাল বাহু, উদার বক্ষ সকলের জন্যই সদা উন্মুক্ত। চরিত্র সংগঠনের জন্য নির্ম্মল আদেশ, হরি সাধনের জন্য মঙ্গলময় উপদেশ, সকলেই সমভাবে পায়। সকলেরই জীবন-নদে ব্রজকুঞ্জের আনন্দপ্রবাহ ছুটিতে থাকে।

কৃপার ধারা দেখিয়া শ্রীপ্রবোধানন্দের উচ্ছ্বাসময় শ্লোক মনে জাগে। "পরমদয়াল প্রভু, পাত্র অপাত্র বিচার করেন না। আপন পর বিবেচনা করেন না। দেয় কিংবা অদেয় ইহা ভাবনা করেন না। কাল অকালের অপেক্ষা রাখেন না। ব্রহ্মাদির দুর্লভ যে ভক্তিরস তাহা অকাতরে অবিচারে যারে তারে বিতরণ করেন। এমন মহাবদান্য-শিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরই আমার জীবনের একমাত্র গতি।"

শ্রীনিতাইভাব সমন্বিত শ্রীগোরাচাঁদই শ্রীশ্রীবন্ধুহরি। তাঁহার মধুর লীলা জয়যুক্ত হউক।

"রমেশ, আমি তো ওদের জানাই নি"

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়
প্রসাদ লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥—শ্রীব্রহ্মা

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীহরিকে চিনিতে হইলে কৃপাশক্তিই একমাত্র কার্য্যকারী। তাঁহাকে জানিতে হইলে, জানিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে, তাঁহার লীলাগহনে প্রবেশপূর্ব্বক তাহা আস্বাদন করিতে হইলে একমাত্র কারুণ্যশক্তিই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়ণীয়।

শ্রীব্রহ্মা তাই বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি তোমার কৃপালাভে অনুগৃহীত, একমাত্র সে-ই তোমার তত্ত্ব অনুভব করিতে পারে। যে কৃপায় বঞ্চিত, সে চিরজীবন চেষ্টা করিলেও তত্ত্বসিন্ধুর এক বিন্দুর উদ্দেশ পায় না।" আচার্য্য গোপীনাথ পণ্ডিত সার্ব্বভৌমকে কহিয়াছিলেন,—

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে।
সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

সাধনদুর্ল্ভধন একমাত্র কৃপাপ্রসাদেই সুলভ হইয়া থাকেন। কৃপা ছাড়া অন্যপ্রকারে জানিলেও জানা হয় না। কৃপায় জানাই জানা। বুদ্ধিবিচারে তর্কে অনুমানে জানা, জানা নয়।

পরম করুণ শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর কতশত দীনহীন কাঙ্গালকে কৃপা করিয়া আপন প্রেমঘন স্বরূপতত্ত্বটি তাহাদিগকে জানাইয়াছেন। আবার কত ধনী মানী পণ্ডিতাভিমানীকে কিছুতেই জানিতে দেন

নাই। কখনও কেহ বা জৈব চেষ্টায় তাঁহার সন্ধান লইয়া জৈব বুদ্ধিতে প্রচারের চেষ্টা করিলে, করুণার ঠাকুর তাহা নির্ম্মমভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন!

কৃপাশক্তি সকল শক্তির রাণী। তাঁহার আনুগত্য ছাড়া দাসদাসী-স্বরূপ অন্যান্য শক্তিগণ যেন কিছুই করিতে পারেন না। সচ্চিদানন্দঘন শ্রীহরির তিনটি প্রধান শক্তি। সৎস্বরূপা সন্ধিনী-শক্তির কৃপায় জীবের হৃদয় শ্রীহরির বিহারের যোগ্য-ভূমিতে পরিণত হয়। চিৎস্বরূপা সংবিৎ-শক্তির কৃপায় শ্রীলীলাবিগ্রহের ভগবত্ত্ব অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়। "কৃষ্ণ ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।"

আর, হলাদিনী-শক্তির কৃপায় লীলাকুঞ্জে প্রবেশ ও সেবাভাগ্য লাভ হয়। সংবিৎ-শক্তির কৃপা হয় নাই, অর্থাৎ প্রভু নিজেকে নিজে জানান নাই, অথচ কোন কোন বিশিষ্ট ভক্ত তাঁহাকে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন জানিয়া বন্ধুসুন্দর রমেশচন্দ্রকে কহিয়াছিলেন,—"রমেশ, আমিত ওদের জানাই নি যে আমি এসেছি—ওরা জানলো কেমন করে?"

কাহিনীটি আনুপূর্ব্বিক রমেশচন্দ্র প্রমুখাৎ যথাশ্রুত লিপিবদ্ধ হইল।—

নবদ্বীপ ভক্তিমতী মাতার গৃহে

শ্রীধাম নবদ্বীপে ধর্ম্মশালার নিকট একটি দোতালা কোঠাবাড়ী ছিল। ঐ বাড়ীতে শ্রীহট্ট নিবাসী চন্দ্রশেখর দাস নামক একটি ভক্তপ্রাণ বাস করিতেন। শ্যামলা মাতা নাম্নী জনৈকা শ্রীহট্ট-বাসিনী ঐ বাড়ীটি তৈয়ারী করাইয়াছিলেন নবদ্বীপ ধামে বাস করিবার জন্য। ঐ বাড়ীতে তিনি নিজেও থাকিতেন, চন্দ্রশেখরও থাকিতেন।

চন্দ্রশেখরের মাতা পরমা ভক্তিমতী ছিলেন। মাতাপুত্র উভয়ে শ্রীল প্রেমানন্দ ভারতী মহাশয়ের বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। সদগুরু করুণায় চন্দ্রশেখরের মাতা শ্রীশ্রীবন্ধু-সুন্দরকে সাক্ষাৎ মহাপ্রভু বলিয়া জানিতেন। বাৎসল্য স্নেহে প্রভুবন্ধুকে ভালবাসিতেন। তাঁহার স্নেহের শক্তিতে প্রভু মুগ্ধ ছিলেন। যখন নবদ্বীপে আসিতেন, তখন উক্ত মাতার স্বহস্ত তৈয়ারী ছোলা ভাজা চাহিয়া খাইতেন।

প্রভু যখন নবদ্বীপে না থাকিতেন তখন মাতা বড় বিরহবেদনা ভোগ করিতেন। ঐ ব্যথা ভুলিবার জন্য তিনি বন্ধুর একখানি চিত্রপট সংগ্রহ করিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ মূর্ত্তির কাছে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। পলকহীন নেত্রে শ্রীমূর্ত্তির শ্রীমুখপানে তাকাইয়া থাকিতেন। তিনি ঐ শ্রীমূর্ত্তি মধ্যেই সাক্ষাৎ দর্শন পাইতেছেন, ইহা যিনি তাঁহার চক্ষুর দিকে দৃষ্টি করিতেন তিনিই অনুভব করিতেন।

এই মাতাটির আকর্ষণে শ্রীশ্রীপ্রভু একবার কয়েকদিন তাঁহার বাসায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন।

ভয়ানক বিপদ

"লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িলা"

—কবিরাজ গোস্বামী

শ্রীশ্রীপ্রভু নবদ্বীপধামে উক্ত ভক্তিমতী মাতার গৃহে আছেন। সে বৎসর নবদ্বীপে গঙ্গাস্নানের একটা বড় যোগ। দূর দেশাগত সহস্র সহস্র যাত্রী-সমাগমে নবদ্বীপ নগরী ভরপুর। শ্রীল প্রেমানন্দ ভারতী, শ্রীযুত শিশির কুমার ঘোষ প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ভক্ত ঐ সময় নবদ্বীপ উপস্থিত। শ্রীশ্রীপ্রভুর রূপগুণ প্রেমমাধুর্য্যে তাঁহারা মুগ্ধ।

তাঁহারা সংবাদপত্র ও বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচার করিয়াছেন যে, মহাপ্রভু স্বয়ং আবার নদীয়ায় প্রকাশ হইয়াছেন। গঙ্গাস্নানের যোগের দিন তিনি সকলের নয়ন গোচর হইবেন।

শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র তখন কলিকাতা হ্যারিসন রোডের একটি বাসায় আছেন। হঠাৎ নবদ্বীপ হইতে প্রভুর টেলিগ্রাম এল। "Pravoo in danger, Romesh's presence badly needed"-প্রভু বিপদগ্রস্ত, রমেশের উপস্থিতি একান্ত ভাবেই প্রয়োজনীয়।

টেলিগ্রাম পাইয়াই রমেশচন্দ্র নবদ্বীপে প্রভু সন্নিধানে উপনীত হইলেন। রমেশকে দেখিয়াই প্রভু বলিলেন—"রমেশরে এসেছিস্, আয়, আমার ভয়ানক বিপদ উপস্থিত।"

"কী বিপদ?"

"ওরা আমায় ভগবান্ করেছে। কাল গঙ্গাস্নানের কালে নাকি আমায় দেখাবে!"

"সে ত ভাল কথা, ভগবান্ হবে, সবাই দেখবে।"

"ওরে, ভগবান্ পেলে কি কেউ আমায় রাখবে? গ্রামদেশে যদি বাঘ ধরা পড়ে তবে কি আর আস্ত থাকে! নখ লোম দাঁত ছিন্নভিন্ন করিয়া লোকে লইয়া যায়। ভগবান্ পেলেও তাই করবে। আগে এই ঘরের ইটগুলি খসায়ে নেবে, তারপর আমায় টুক্‌রে টুক্‌রে করে ফেলবে।"

"তবে তো বিপদের কথাই" রমেশচন্দ্র সায় দিলেন। এখন তবে কী করতে চাও?"

"এক্ষুনি চলিয়া যাইব।"

এক্ষুনি ? তবে চল।

"এখন গেলে সবাই দেখে ফেলবে। ওরা ঘুমুলে শেষরাত্রে যাব।"

সূর্য্য স্বপ্রকাশ

শেষরাত্রে শ্রীশ্রীপ্রভু রমেশকে লইয়া নবদ্বীপ হইতে চলিয়া গেলেন। কোন প্রকারে একটা নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। পিছনে শত্রু তাড়া করিলে মানুষ যেমন প্রাণভয়ে ছুটে, প্রভুও সেইরূপ ভাবে ছুটিতেছেন।

সঙ্গে রমেশচন্দ্র প্রাণপণে দৌড়িতেছেন। দৌড়িতে দৌড়িতে রমেশ বলিলেন "বড় প্রস্রাব পেয়েছে, একটু দাঁড়াও।" প্রভু

সেকথা শুনিয়াও শুনিলেন না। একই ভাবে চলিতে লাগিলেন। অনেকদূর ছুটিয়া ঘর্ম্মাক্ত হইয়া প্রভু একটু থামিলেন। পরে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।

চলিতে চলিতে প্রভু রমেশকে কহিলেন "বল দেখি রমেশ, ভগবান্ যদি কাহাকেও না জানায়, তবে তার কথা কি কেউ জানতে পারে ?"

"না, তা জানিবে কেমনে ?" রমেশচন্দ্র উত্তর দিলেন। গম্ভীর ভাবে প্রভু কহিলেন, "রমেশ, আমি তো ওদের জানাই নি যে আমি এসেছি ! তা ওরা জানলো কেমন করে ? ওরা দেখছি— ভগবানেরও ভগবান্। আমি যে কাল প্রকাশ হব, একথা আমি জানি না, অথচ ওরা জানে !"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া চলিতে চলিতে ঈষৎ হাস্যমাখা বদনে প্রভু আবার বলিতে লাগিলেন,—"রমেশ, তুই শিশির ও ভারতীকে বলিস, তারা যেন আমাকে এভাবে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ না করে। তাদের বলিস্ যে সূর্য্য স্বপ্রকাশ। বাতির আলোয় সূর্য্য প্রকাশ করতে হয় না।"

"দে আর একটা দে"

তখন পূর্ব্ব গগনে বেলা উঠিয়াছে। প্রভু হাঁসখালি আসিয়াছেন। অনেক পথ ছুটিয়া প্রভু ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন বুঝিয়া রমেশ একটা মিঠাইর দোকান হইতে কিছু রসগোল্লা কিনিলেন। দোকানী যখন পাল্লা তুলিয়া মাপ ঠিক হইয়াছে কিনা নজর করিতেছিল, তখন প্রভুও সেইদিকে দৃষ্টি দিয়া দোকানীকে আর একটা রসগোল্লা দিতে বলিলেন। দোকানী বলিল, "ঠাকুর, আর লাগিবে না।" প্রভু বলিলেন "দে, আর একটা দে, লাগিবে।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর এই মধুর বালকভাব দেখিয়া রমেশের পরম আনন্দ বোধ হইল। একদিকে বিরাট প্রতিষ্ঠাকে বিষবৎ ত্যাগ, আর একদিকে স্বপ্রকাশ সূর্য্যের মত প্রভুত্ব, অন্যদিকে শিশুর মত রসগোল্লার আবদার—একাধারে এই তিনের সমবায় দেখিয়া রমেশ নির্বাক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। রমেশের ভাবনাকে অন্যদিকে লইবার জন্যই যেন প্রভু কহিলেন "রমেশ, তোর না প্রস্রাব পেয়েছিল? এখন যেতে পারিস্।" রমেশ চলিয়া গেল।

ঘোড়ার গাড়ী করিয়া রমেশ প্রভুকে লইয়া বগুলা আসিল। ট্রেণ আসার বহু বিলম্ব। প্রভুর কষ্ট হইবে মনে করিয়া রমেশ প্রভুর জন্য রান্নার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

একটা দোকান ঘরের একটি অংশ গোময় লিপিয়া পর্দ্দা টানাইয়া রমেশ সব ঠিক করিয়া দিলেন। প্রভু সব দ্রব্য মিশাইয়া

খিচুরী রান্না করিয়া কলার পাতায় ঢালিয়া লইলেন। নিজে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন ও অবশিষ্ট রমেশকে আদর করিয়া খাইতে বলিলেন ও পাশে বসিয়া খাওয়াইলেন।

প্রভু রমেশকে কাহারও ভুক্তাবশেষ খাইতে দিতেন না। নিজের প্রসাদও নয়। আজই দিলেন। এই দিনটির কথা স্মরণ করিয়া রমেশচন্দ্র বলিতেন, জীবনে ঐ একদিনই ডাকিয়া সাধিয়া কাছে বসিয়া নিজ ভুক্তাবশেষ খাওয়াইয়াছিলেন।

ট্রেণ আসিলে প্রভু ফরিদপুর চলিয়া আসিলেন। রমেশচন্দ্র কলিকাতা গেলেন। আবার কিছুদিন পরেই প্রভুর আদেশমত কতিপয় ফরমাইজি দ্রব্য লইয়া ফরিদপুর পৌঁছিলেন। ধূপ, গুগ্‌গুল, থান, বস্ত্র, সিলই চাদর (সেলাইকরা দেড়পাট্টা গাত্র বস্ত্র) কলম, কাগজ কালি নিব, খাম পোষ্টকার্ড ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্যের ফরমাইজ প্রভু ভক্তদের দিতেন। প্রভুর অর্ডার আসিলে ভক্তদের আনন্দের সীমা থাকিত না। অর্ডারী দ্রব্যের কিয়দংশ পাইলেও প্রভু আহ্লাদে আত্মহারা হইতেন। যাহা আনা হয় নাই তাহার জন্য কিছু জিজ্ঞাসাও করিতেন না। প্রভুর বালসুলভ আহ্লাদিত-বদন ভক্তগণের উপভোগ্য বস্তু ছিল।

"পদাতিক সৈন্য"

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যংগতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥

—শ্রীশুক

প্রভু বন্ধুসুন্দরের অপার্থিব প্রেমের মর্ম্মস্পর্শী আকর্ষণে যাহারা ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে ছুটিয়া আসিতেছিল, তন্মধ্যে ফরিদপুর সহরের তরুণ বালকদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুরেশ, দেবেন, সুরেন, অক্ষয়, রসময়, বিধু, নকুল, উপেন, অমৃত, কালীমোহন, তারকেশ্বর প্রমুখ তরুণ অরুণ-সন্নিভ প্রিয় বালক-বৃন্দকে প্রভুবন্ধু আপন "পদাতিক সৈন্য" কহিতেন।

বন্ধুহরির অযাচিত স্নেহের প্লাবনে পরিস্নাত হইয়া এই "সৈন্য" গণ প্রভুর চিহ্নিত দাসরূপে তাঁহার শ্রীচরণপঙ্কজে সংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মধুলোলুপ মধুকরের মত তাঁহারা বন্ধুসুন্দরের আশে পাশে শোভা পাইত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে আজ্ঞাপালন করিত। এই দলের সেনানায়ক ছিলেন শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র।

বন্ধুসুন্দর তাহার পদাতিক সৈন্যগণকে সৈন্যবিভাগের নিয়মানু-বর্ত্তিতার মত কঠোর নিয়মনিষ্ঠা শিক্ষা দিতেন। প্রত্যেককেই এক একটি চরিত্রবান্ কর্ম্মঠ বীর সেনানী তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তৎকালে স্কুল কলেজে এই বালকদের জীবনযাত্রার প্রণালী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

বর্ত্তমানে দেশে শিক্ষালয়ের ভিতর দিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষালাভ করিয়া চরিত্রগঠনের কোন সুনির্দ্দিষ্ট পথ নাই। এইজন্য কৈশোরের উন্মেষে জড়ীয় শিক্ষা ও ঐশ্বর্য্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া স্কুলের ছাত্রগণ প্রায়শঃ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতঃ অপরিণত বয়সেই শক্তি ও আনন্দহীন হইয়া পড়ে। যে দেশে যুবশক্তি শক্তিহীন, সে দেশের উন্নতির আশা কোথায় ?

বর্ত্তমানে সমগ্র মানব সমাজের প্রকৃত উন্নতি লাভের ঘোর অন্তরায় হইতেছে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। এই সত্য মর্ম্মে অনুভব করিয়া প্রভু বন্ধুসুন্দর ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তার কথা গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। এই বিষয় কেবল উপদেশাবলী মুখে বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আপন নির্ম্মল জীবনে উহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। আর ঐ আদর্শানুরূপে একদল বালককে গঠন করিয়া তুলিয়া প্রচারিত সত্যকে আচরণের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ করিয়া ধরিয়াছেন। এই বালকদলকেই পদাতিক সৈন্য কহিতেন।

প্রভুবন্ধু আপনি যেমন অটুট ব্রহ্মচর্য্যের জীবন্ত বিগ্রহ, পদাতিক সৈন্যদলও ছিল তদ্রূপ সত্যও সংযমতার ফুটন্ত কুসুম। শৌর্য্যে বীর্য্যে দৃঢ়তায়, জ্ঞানে গুণে পবিত্রতায় ইহারা নিজ নিজ জীবনে বন্ধুসুন্দরের কল্যাণময়ী শিক্ষাকে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছিল।

কৈশোরের উন্মেষে স্ফুটনোন্মুখ তেজশক্তিকে সংযত করিতে না পারিয়া যখন ইহারা গতানুগতিক ভাবে গড্ডালিকা স্রোতে ভাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল ঠিক তখনই "ভয় নাই আমি আছি" বলিয়া অভয় হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক প্রভু বন্ধুসুন্দর ইহাদিগকে আশ্রয় দান করেন।

সৈন্যদলও বন্ধুসূর্য্যের প্রভায় প্রভান্বিত হইয়া লক্ষ বাধা অতিক্রম করতঃ ক্রমশঃ ত্যাগ ও তপশ্চর্য্যার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রভু-নির্দ্দেশিত তপস্যার পথে চলিতে বালকদের মধ্যে কাহারও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিলে, অতি স্নেহ-ব্যঞ্জক অথচ শাসনস্বুরে কহিতেন, "আমি পূর্ণ, পূর্ণ মাত্রায় কাজের চাপ দেবো, তোরা যা পারিস্ করিস্। না পারিস্ আমায় বলিস্। আমি যা বলি তোদের মঙ্গলের জন্যই বলে থাকি।"

"হৈ চৈ হুজুক ক'রো না"

প্রভু বন্ধুসুন্দর কোনকালেই হৈ চৈ হুজুগের পক্ষপাতী নহেন। কৃপাশ্রিতগণকে স্থির ধীরভাবে সাগরগামিনী নদীর ন্যায় একলক্ষ্যে ছুটিয়া যাইতে উপদেশ দিতেন। একদিন নানা কথা প্রসঙ্গে বালকগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"মানুষ কেবল হুজুগ চায়, হৈ চৈ ভালবাসে। তোমরা হুজুগ করো না, ধীরে মহাপ্রেমে, নিতাই নিষ্ঠায়, নিত্যানন্দ স্মরণে চলে যাও। হতাশ হ'য়ো না। আমি আছি, ভয় কি? হরিনামে প্রাণমন শীতল রেখে চলতে থাক। মানুষ তোমাদিগকে জটিল পথে লইতে চা'বে, কষ্ট দিতে চা'বে, তাতে ভীত হ'য়ো না। কর্ত্তব্য ছে'ড়ো না। পদে পদে আমায় দেখে, বিচার করে চল্‌বে।"

বালকগণও এই উপদেশে বলীয়ান হইয়া শান্ত সমাহিত ভাবে প্রভুবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সত্য ও পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। সত্যরক্ষা সম্বন্ধে বন্ধুসুন্দর বালকগণকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত উপদেশ দিতেন। অনেক সময় তাহাদের চিত্তে দুর্ব্বলতার আভাস দেখিলে উৎসাহপূর্ণ আদেশ দিয়া প্রাণস্পর্শী প্রেরণা জাগাইয়া দিতেন। বলিতেন,—

"তোমরা সদাকাল সত্য কথা বলিবে। কদাচ মিথ্যা কথা কহিবে না। প্রাণপণ করে সত্যরক্ষা করিবে। যে সত্য পথে চলে কেহ তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে না। কেহ মেরে ফেললেও মিথ্যা কইবে না।"

"একান্ত ইচ্ছায় মানুষ সব পারে"

প্রভু বন্ধুসুন্দরের শিক্ষার মধ্যে পাওয়া যায় নৈতিক জীবন গঠন ও হরিনাম সাধনের এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। কোনও কোনও উপদেষ্টা শুধু কঠোর তপশ্চর্য্যার কথা বলেন। কেহবা সব ছাড়িয়া হরি ভজনের কথা বলেন। কিন্তু নিতাই নিষ্ঠায় থাকিয়া, হরিনামে তনুমন শীতল রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও ন্যায়নিষ্ঠ সত্য তপস্যায় ব্রত উদ্‌যাপনের অভিনব শিক্ষা প্রভুবন্ধুর আচরণে পরিস্ফুট। তিনি ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা দিয়া নাম-ভজনকে সুদৃঢ় করিয়াছেন, হরিসাধনের মাধুর্য্য দিয়া তপশ্চর্য্যাকে সরস করিয়াছেন।

প্রভুর উপদেশ বা নির্দ্দেশ শুনিয়া যদি কোন বালক কখনও বলিত, "আচ্ছা করা যাবে" কিংবা "যদি পারি চেষ্টা করব" তখনই

প্রভুবন্ধু কহিতেন "দেখা যাবে, করা যাবে, যদি পারি করবো এসব তোমরা কদাও বলো না। তোমরা বলো—'অবশ্য আসবো, নিশ্চয়ই করবো।' যা মুখফুটে বল্‌বে তা কর্‌বেই কর্‌বে। এরকম না বললে বুকে বল বাঁধে না, মানুষ মরা হয়ে যায়।"

"আচ্ছা দেখ্‌বো, যদি পারি চেষ্টা কর্‌বো, ওসব না করার ফাঁকি। যা বলবে তা করার একান্ত ইচ্ছা হলে নিশ্চয়ই করতে পারবে। ও রকম বললে তোমাদের মিথা বলা হবে না। সংকর্ষণ করায়ে দেবেন। তেজ অচল অটল থাকলে একান্ত ইচ্ছায় মানুষ সবই পারে। একান্ত ইচ্ছা হইলে ভগবান্ দর্শন দেন।"

সত্য আশ্রয় পূর্ব্বক কর্ত্তব্য পরায়ণতার উজ্জ্বল বর্ত্তিকা লইয়া যাহাতে বালকগণ হরিসাধনের পথে নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইতে পারে ও মরজীবনে অমৃতত্বের সন্ধান পায়, গুরুবন্ধু পরম আদরে তাহাদিগকে সেই পথ দেখাইয়া দিতেন।

"অজ্ঞানের হরিভক্তি হয় না"

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।—শ্রীকৃষ্ণ

প্রভু বন্ধুসুন্দর বালক ভক্তগণের অধ্যয়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। বালকগণ তখন সকলেই বিদ্যার্থী। কোন কোন বালককে বন্ধুসুন্দর স্বয়ং অর্থ সাহায্যও করিয়াছেন। কাহাকেও পাঠ্যপুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

"কেহ মূর্খ থাকিও না। মূর্খে আমার কথা বুঝিতে পারিবে না। অজ্ঞানের হরিভক্তি হয় না।" এই সকল কথা সর্ব্বদা

সকলকেই কহিতেন। ঐ সময় অনেক ছাত্রই গাড়ী ঘোড়া চড়িবার উদ্দেশ্যে পড়াশুনা করিতেন। ঐরূপ আদর্শ যাহাতে প্রিয় বালকগণের অন্তরে স্থান না পায় সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন।

"পড়ে কেন লোক কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা তরে।
তাই যদি না হইল পড়িয়া কি করে॥"

জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হরিভক্তি লাভ। পার্থিব বিদ্যা ঐ পথের সোপান স্বরূপ। এই ভাবাদর্শে বালকগণকে সর্ব্বদা অনুপ্রাণিত করিতেন।

একদিন কোন এক বালককে লক্ষ্য করিয়া সকল বালকগণকেই বলিলেন, "সকল ছাত্রবাবুদের বলিও, কেহ যেন গ্রাজুয়েট না হয়ে পড়া না ছাড়ে।" পরীক্ষার পূর্ব্বে ঘন ঘন পত্র লিখিয়া জানাইতেন, "অমুকের অঙ্ক ভাল হয় নাই, অমুকের ইতিহাসে কসুর আছে।" এইরূপ বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক জানাইয়া দিয়া ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের জন্য চিন্তিত থাকিতেন।

এক বৎসর পরীক্ষার পূর্ব্বে একটি প্রিয় বালককে লিখিয়াছিলেন, "এক্‌জামিন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নিঃসঙ্গ হইও। সর্ব্ব রাত্রি পড়িও। স্বস্তি ও আনন্দে রহিও।"

বালক ভক্তগণের মধ্যে যে কোন বালকের নামে প্রভুর পত্র আসিলে তাহা প্রত্যেকেই আপন পত্র বলিয়া মনে করিত। দেহের যে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করিলে যেমন দেহকে স্পর্শ করা হয়, প্রভু যাহাকেই সম্বোধন করুন, বালক ভক্তগোষ্ঠি সকলেই তাহাতে সাড়া দিত। তাহারা যৌথভাবে বন্ধুসুন্দরের কৃপা-মাধুর্য্য ভোগ করিত।

প্রভু বন্ধুসুন্দরের অভিপ্রায় বুঝিয়া বালকগণ পরমানন্দে নিষ্ঠা পবিত্রতার সহিত কঠোর পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিত। তাহাদের সকলেরই তখন স্কুলে যথেষ্ট সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল।

পরীক্ষার ফল ভাল হইলে সুনাম সুযশ হইবে এই জন্য তাহারা পড়িত না, পরিণামে হরিভক্তি হইবে এই জন্যও তাহারা ভাবিত না। পরীক্ষার ফল ভাল হইলে তাহাদের প্রাণের দেবতা প্রভুবন্ধু সুখী হইবেন, এই ভাবনাই তাহাদের অন্তর জুড়িয়া বিরাজমান থাকিত।

আদেশ পালন করিলে প্রভুবন্ধু প্রীত হইবেন, এইজন্য তাহারা তখন অতি কঠোর আদেশ পালন করিতে পরান্মুখ হইত না। প্রভুর নির্দ্দেশে তাহারা চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যা ত্যাগ করিত। শৌচ স্নানাদি করিয়া উপাসনা ও ব্যয়ামাদি করিত। সহরের পথ ঘুরিয়া প্রভাতি টহল করিত। নিয়মিতভাবে স্কুলের পাঠাভ্যাস করিত।

তাহাদের আহার বিহারাদির সম্বন্ধেও যথেষ্ট কঠোরতা ছিল। তাহারা কাহারও সহিত এক শয্যায় শয়ন বা উপবেশন করিত না। এক সঙ্গে ভোজন ও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিত না। অত্যধিক বাক্যালাপ করিত না। রাস্তায় নিম্নদৃষ্টিতে পথ চলিত। কাহারও মুখের দিকে তাকাইত না। নিজ দেহ বস্ত্রাচ্ছাদনে রাখিত, এইরূপ বহু কঠোর নিয়ম নিত্য যত্নের সহিত প্রতিপালন করিত। তাহারা ওজস্বী হইলে তাহাদের প্রভুবন্ধুর বদন হাস্যোজ্জ্বল হইবে, এই একটি ভাবনাই তাহাদের সর্ব্ব কর্ম্মের প্রেরণা যোগাইত।

ভীষণ বাধা

কি কব বিশেষ, আঙ্গিনা বিদেশ,
না যাই যমুনা ঘাটে।

—শ্রীউদ্ধব দাস

পাবনায় যেরূপ বালকগণের অভিভাবকেরা ক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ফরিদপুরও সেইরূপ হইল। দুর্দ্দান্ত হিরণ্যকশিপু চিরকালই দুর্নিবার্য্য।

পাবনায় অত্যাচারটা পড়িয়াছিল স্বয়ং প্রভুবন্ধুর উপরে। ফরিদপুরে অত্যাচার চলিতে লাগিল নিরীহ শান্ত বালকগণের উপরে। সে অত্যাচার যে কি অমানুষিক তাহা ভাবনা করিতেও কল্পনা হার মানিয়া যায়। কোন কোন অভিভাবক ক্রোধান্ধ হইয়া নিজ সন্তানকে প্রহার করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বস্ত্রখানা কাড়িয়া লইয়া উলঙ্গ ভাবে বাড়ীর বাহির করিয়া দিতেন।

বালকগণ কাহারও নিকট এতটুকু সহানুভূতির ভাষাও শুনিতে পাইত না। পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, সহপাঠী, প্রতিবেশী, স্কুলের মাষ্টারগণ কেহই তাহাদের সঙ্গে মিষ্টিমুখে কথা কহিত না। সাধু ও সৎ হইতে চেষ্টা করিয়া তাহারা যেন কত গুরুতর অপকর্ম্ম করিতেছে, যে-জন্য সর্ব্বদার তরে ভীত শঙ্কিত ও সতর্ক থাকিতে হইত।

সমাজ কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত। অভিভাবকগণের কি অন্ধতা। তাহাদের সন্তানেরা কুসংসর্গে ডুবিয়া নিলয়গামী হইতেছে, অসংযত জীবন যাপন করিয়া অন্তঃসার শূন্য হইতেছে, শুধু পুথিগত বিদ্যার বুলি আওড়াইয়া মেরুদণ্ডহীন জীব হইয়া সংসার

অন্ধকার দেখিতেছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। আর যেই মাত্র তাহারা সৎ সাধু সুন্দর সুধী হইয়া মনুষ্যত্বের পথে চলিল অমনি তাহাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল।

যদি কোন দিন এই অশান্ত মানব সমাজ প্রকৃত শান্তি-সম্পদের অধিকারী হইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে প্রত্যেক অভিভাবককে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে হইবে যে, সর্ব্বপ্রকার উন্নতির ভিত্তি আধ্যাত্মিকতাতেই নিহিত। কৈশোর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে আধ্যাত্মিকতার বীজ উপ্ত না হইলে শান্তি লাভের আশা সুদূর পরাহত।

ভারতের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ ইহা ভালভাবেই বুঝিতেন। জীব-শিক্ষাগুরু প্রভু বন্ধুসুন্দর এই যুগসন্ধিক্ষণে যুগোপযোগী ভাবে শাশ্বত ঋষি-নির্দ্দিষ্ট পথেরই পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বালকগণ সেই মহান্ আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে।

সত্য-প্রতিষ্ঠ বালকগণের উপর হৃদয়বিদারক গালি, মর্ম্মঘাতী কটূক্তি বর্ষণ ও নৃশংসভাবে শাসন কার্য্য চলিত। তাহারা সাত্ত্বিক আহার করিবে, তাহাতে বাধা। উষা স্নান করিবে, তাহাতে বাধা। প্রভাতি কীর্ত্তন করিবে, তাহাতে বাধা। জীবন্ত আদর্শ বন্ধুসুন্দরের কাছে গিয়া তাঁহার মধুময় সান্নিধ্যে জীবন ধন্য করিবে, তাহাতে বাধা। পাঁচ জন একত্রে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী সৎ প্রসঙ্গ করিবে, তাহাতেও পর্য্যন্ত বাধা।

অমানুষিক অত্যাচার ও প্রবল নির্য্যাতন বালকগণের সাধন পথে নির্ম্মমভাবে অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল।

ব্রজের বৈরাগ্য

"যে সংসারে শান্তি পায় না,
সে সংসার ত্যাগ করিয়াও শান্তি পায় না।"
—বন্ধুবাণী

কেহ মনে করিতে পারেন প্রভু জগদ্বন্ধুর সঙ্গ করিয়া বালকগণ গৃহত্যাগী হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় অভিভাবকগণ অত্যাচার করিত। কিন্তু এরূপ ধারণা করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই।

প্রভু বন্ধুসুন্দর বালকগণকে সংসার পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিতেন না। বরং কেহ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া ঘর সংসার পরিত্যাগ করিবার ভাব প্রকাশ করিলে, গম্ভীর ভাবে বলিতেন,—"অমন করে ভ্রষ্টবুদ্ধি হ'য়ে পিতা মাতার মনে কষ্ট দিতে নেই। যে সংসারে শান্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ করেও শান্তি পায় না।"

প্রভুবন্ধু বলিতেন, ভোগ্যবস্তু ত্যাগ অপেক্ষা তৎপ্রতি লালসা পরিবর্জ্জন করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। ভোগ্যবস্তু বর্জ্জনই বৈরাগ্য নহে। বস্তুর প্রতি স্পৃহা-হীনতাই বৈরাগ্য। বন্ধুসুন্দর বালকদিগকে ভোগের মধ্যে ত্যাগের আদর্শ শিক্ষা দিতেন। অনেককেই বলিতেন, "অকৈতবে বিষয়বৃত্তি করিও।"

সেই ত্যাগই সুখের আকর। সেই বৈরাগ্যই মহদ্ভাগ্য, যাহার ফলে জীব তাহার যাবতীয় ভোগ্য বিষয় গোবিন্দ সেবায় অর্পণ করিয়া আপনি শরণাগত সেবক হইয়া থাকিতে পারে।

কৃষ্ণৈকশরণ হইয়া অমায়ায় বিষয় ভোগ ত্যাগ, ইহাকে ব্রজের বৈরাগ্য বলা যায়। এই ব্রজের বৈরাগ্যই প্রভুবন্ধুর আদরণীয় ও সকল শিক্ষার সার মর্ম্ম। প্রভুবন্ধুর অনুবর্ত্তী বালকগণ এই শিক্ষাই জীবনের কণ্ঠহার করিয়া রাখিয়াছেন।

পিতা মাতা শিক্ষক প্রভৃতি পূজ্যবর্গকে যথোপযুক্ত সম্মান ও ভক্তি করিতে প্রভুবন্ধু বালকগণকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতেন। কোন বালককে লিখিয়াছিলেন, "জননীও ভ্রাতৃগণকে চিরদিন সর্ব্বতঃ পালন করিবে।"

শত অত্যাচারের মধ্যেও গুরুজনের মর্য্যাদা যাহাতে কেহ লঙ্ঘন না করে এইরূপ উপদেশ প্রায়শঃই দিতেন। সত্য সত্যই ইহা অতি বিস্ময়ের বিষয় ও বালকগণের পক্ষে পরম গৌরবের কথা যে, অভিভাবকগণের সহস্র অত্যাচার ও উৎপীড়নের মধ্যেও তাহারা স্থির ধীর অচল অটলভাবে লক্ষ্য পথে ছুটিয়াছিল এবং শত নির্য্যাতনেও কাহারও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে নাই।

প্রেমের প্রবল টান

গোবিন্দাপহৃতাত্মনঃ স ন্যবর্ত্তত মোহিতাঃ। —শ্রীশুক

বিপুল বাধা বিপত্তি। বালক ভক্তগণ তথাপি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। প্রেমের প্রবলটানে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। বন্ধু-প্রেমের অপ্রতিহত আকর্ষণ। তাঁহার শক্তিতেই তাহারা বাল-সুলভ চাপল্য ও যৌবন-সুলভ ভোগস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া আকুল আগ্রহে ছুটিয়াছিল।

বেগবতী স্রোতস্বিনী যেমন নিয়ত সমুদ্রের অভিমুখে ধাইয়া যায়, বালকগণ সেইরূপ প্রত্যহ ব্রাহ্মণকান্দার পর্ণকুটীর পানে উধাও হইয়া ছুটিত। কেন এই ছুটাছুটি তাহা তাহারা নিজেরাও বলিতে পারিত না। হৃদয়ের গভীর অনুভব প্রায়শঃ অনুভবিতার বুদ্ধির গোচর থাকে না।

বোবার স্বপনের মত বালকগণ তাহাদের মর্ম্মস্থলের প্রগাঢ় অনুভব ভাষায় ফুটাইয়া বলিতে পারিত না। তাহারা জানিত জগদ্বন্ধু তাহাদের প্রাণের মানুষ। তাঁহার হাসি সুন্দর, চাহনী সুন্দর, কথা সুন্দর, হাব ভাব চাল চলন সবই সুন্দর। জগদ্বন্ধুর নাম, জগদ্বন্ধুর সঙ্গ, প্রসঙ্গ সবই বালকগণের নিকট প্রাণ উন্মাদনাকারী নিরুপম বস্তু।

বালকগণ জানিত, বন্ধু তাহাদের ভালবাসার জন। এমন প্রিয় এমন সুহৃদ, এমন আপনজন পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টী নাই। জগদ্বন্ধুর ভালবাসা অপার্থিব, অতুলনীয়, নির্ম্মল শুদ্ধ। সংসারে মা বাবা ভাই বোন কত জনেইত ভালবাসে কিন্তু বন্ধুসুন্দরের কাছে তাহারা যে ভালবাসা পাইত, তাহা যেন এক অভিনব অনির্ব্বচনীয় সামগ্রী।

ভালবাসা যে মানুষকে এমনভাবে আপন করিয়া লইতে পারে, এমনভাবে হৃদয় ও মনকে আলোড়িত করিয়া ঘরের বাহির করিয়া লইয়া যাইতে পারে, এমনভাবে দেহ গেহ ভোগ সুখ ভুলাইয়া দিয়া এক অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব মাধুর্য্য-রসে ডুবাইয়া দিতে পারে, ইহা বালকগণ ইতঃপূর্ব্বে কখনও জানিত না।

বালক ভক্তগণ ফরিদপুর সহরের ভিন্ন ভিন্ন বাসায় থাকিত, স্কুলে পড়াশুনা করিত ; সংসারে কাজ কর্ম্ম দেখিত। তদুপরি ছিল শিক্ষক ও অভিভাবকগণের কড়া পাহাড়া। সহপাঠী, আত্মীয় কুটুম্ব পাড়া-প্রতিবেশী সকলের নিন্দা ঠাট্টা ও বিদ্রূপ। এ সত্ত্বেও প্রতিদিন তাহারা সকলেই মিলিত হইত। অন্ততঃ একটিবার দুই মাইল দূরবর্ত্তী ব্রাহ্মণকান্দা গ্রামে পৌঁছিত। কিছুক্ষণ প্রাণ ভরিয়া প্রাণারাম বন্ধুসুন্দরের সঙ্গ-সুখ লাভ করিত। ইহাতে বাধা জন্মাইবার মত শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে কাহারও ছিল না। এ যেন বংশীধারী অভিমুখে ব্রজগোপীকাগণের অভিসার! কোন বাধাই বাধা নয়।

প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই বালকগণ সকলে মিলিয়া সহর পরিভ্রমণ করিত, টহল কীর্ত্তন করিত। তৎপর উষা স্নানান্তে ব্রাহ্মণকান্দা গিয়া প্রভুবন্ধুকে দর্শন করিয়া আসিত। গভীর রাত্রে আর একবার যার যার মত ছুটিয়া প্রভুর কাছে যাইত। অভিভাবক বা শিক্ষকদের বাধা বা প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ কোন-দিনই তাহাদের এই সব কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

নকুলেশ্বর নামক একটি বালক ভক্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এমনই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন যে, তিনি ভাইকে নিজ শয্যার কাছাকাছি শোয়াইতেন যাহাতে সে কিছুতেই উষাকালে উঠিয়া টহল কীর্ত্তনে যাইতে না পারে। ঐ বালক নিজ পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলির সঙ্গে একগাছি শক্ত সূতা দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া তাহার অপর প্রান্ত শয়ন প্রকোষ্ঠের বাহিরে ঝুলাইয়া রাখিত। বালকগণের মধ্যে

পরস্পরের সঙ্কেত জানা থাকিত। বালক ভক্ত শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র আসিয়া প্রত্যহ ঐ সূতা ধরিয়া টান দিয়া নকুলেশ্বরকে জাগরিত করিত। নকুল অতি সন্তর্পণে উঠিয়া বাহিরে যাইয়া যথা-কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হইত। টহল কীর্ত্তন, উষা স্নান ও ব্রাহ্মণ-কান্দায় বন্ধুসুন্দরকে দর্শনান্তে যখন বাসায় ফিরিত, তখনও রাত্রি কিছু বাকী থাকিত। নকুলেশ্বর গৃহে ফিরিয়া ভ্রাতার পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিত; যেন কিছুই ঘটে নাই। এইরূপ ভাবে একাদিক্রমে দুই তিন বর্ষ চলিয়াছে নকুলেশ্বরের দাদা কোনদিনও জানিতে পারে নাই। এ যেন যোগমায়ার আবরণে গোপীকৃষ্ণের লীলা খেলা।

"রাই বাস আড়ে হাস"

"প্রতিযাত স্ততো গৃহান" —শ্রীশুক

বালভক্তগণের অধিনায়ক শ্রীমান্ রমেশচন্দ্রকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—"রাই বাস আড়ে হাস বন্ধু তোর রয়।" রমেশচন্দ্র সকলকে চিঠি দেখাইলেন। চিঠি পড়িয়া বালক ভক্তগণ ইহাই বুঝিলেন যে, তাহারা রাইয়ের মত জটিলা কুটীলার কড়া শাসনের মধ্যে বাস করিতেছে। এইসব দেখিয়া তাহাদের বন্ধু আড়ালে থাকিয়া হাসিতেছেন এবং নিরন্তর তাহাদের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন।

এরূপ ভাবে প্রতীক্ষায় থাকিয়াও কখনও কখনও এমন ঘটিত যে, বালক ভক্তগণ শ্রীচরণসমীপে আসিলে তিনি অতি

বালক ভক্তগণ ফরিদপুর সহরের ভিন্ন ভিন্ন বাসায় থাকিত, স্কুলে পড়াশুনা করিত ; সংসারে কাজ কর্ম্ম দেখিত। তদুপরি ছিল শিক্ষক ও অভিভাবকগণের কড়া পাহাড়া। সহপাঠী, আত্মীয় কুটুম্ব পাড়া-প্রতিবেশী সকলের নিন্দা ঠাট্টা ও বিদ্রূপ। এ সত্ত্বেও প্রতিদিন তাহারা সকলেই মিলিত হইত। অন্ততঃ একটিবার দুই মাইল দূরবর্ত্তী ব্রাহ্মণকান্দা গ্রামে পৌঁছিত। কিছুক্ষণ প্রাণ ভরিয়া প্রাণারাম বন্ধুসুন্দরের সঙ্গ-সুখ লাভ করিত। ইহাতে বাধা জন্মাইবার মত শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে কাহারও ছিল না। এ যেন বংশীধারী অভিমুখে ব্রজগোপীকাগণের অভিসার ! কোন বাধাই বাধা নয়।

প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই বালকগণ সকলে মিলিয়া সহর পরিভ্রমণ করিত, টহল কীর্ত্তন করিত। তৎপর ঊষা স্নানান্তে ব্রাহ্মণকান্দা গিয়া প্রভুবন্ধুকে দর্শন করিয়া আসিত। গভীর রাত্রে আর একবার যার যার মত ছুটিয়া প্রভুর কাছে যাইত। অভিভাবক বা শিক্ষকদের বাধা বা প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ কোন-দিনই তাহাদের এই সব কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

নকুলেশ্বর নামক একটি বালক ভক্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এমনই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন যে, তিনি ভাইকে নিজ শয্যার কাছাকাছি শোয়াইতেন যাহাতে সে কিছুতেই ঊষাকালে উঠিয়া টহল কীর্ত্তনে যাইতে না পারে। ঐ বালক নিজ পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলির সঙ্গে একগাছি শক্ত সূতা দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া তাহার অপর প্রান্ত শয়ন প্রকোষ্ঠের বাহিরে ঝুলাইয়া রাখিত। বালকগণের মধ্যে

পরস্পরের সঙ্কেত জানা থাকিত। বালক ভক্ত শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র আসিয়া প্রত্যহ ঐ সূতা ধরিয়া টান দিয়া নকুলেশ্বরকে জাগরিত করিত। নকুল অতি সন্তর্পণে উঠিয়া বাহিরে যাইয়া যথা-কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হইত। টহল কীর্ত্তন, উষা স্নান ও ব্রাহ্মণ-কান্দায় বন্ধুসুন্দরকে দর্শনান্তে যখন বাসায় ফিরিত, তখনও রাত্রি কিছু বাকী থাকিত। নকুলেশ্বর গৃহে ফিরিয়া ভ্রাতার পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিত; যেন কিছুই ঘটে নাই। এইরূপ ভাবে একাদিক্রমে দুই তিন বর্ষ চলিয়াছে নকুলেশ্বরের দাদা কোনদিনও জানিতে পারে নাই। এ যেন যোগমায়ার আবরণে গোপীকৃষ্ণের লীলা খেলা।

"রাই বাস আড়ে হাস"

"প্রতিযাত স্থতো গৃহান" —শ্রীশুক

বালভক্তগণের অধিনায়ক শ্রীমান্ রমেশচন্দ্রকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—"রাই বাস আড়ে হাস বন্ধু তোর রয়।" রমেশচন্দ্র সকলকে চিঠি দেখাইলেন। চিঠি পড়িয়া বালক ভক্তগণ ইহাই বুঝিলেন যে, তাহারা রাইয়ের মত জটিলা কুটীলার কড়া শাসনের মধ্যে বাস করিতেছে। এইসব দেখিয়া তাহাদের বন্ধু আড়ালে থাকিয়া হাসিতেছেন এবং নিরন্তর তাহাদের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন।

এরূপ ভাবে প্রতীক্ষায় থাকিয়াও কখনও কখনও এমন ঘটিত যে, বালক ভক্তগণ শ্রীচরণসমীপে আসিলে তিনি অতি

নিষ্ঠুরের মত তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেন। একদিন বলিয়াছিলেন তোমরা "আমাকে যদি চাও, তবে সুখের আশা করো না। আমার জন্য অনেক কষ্ট সইতে হবে। লোকে পাগল, মতলবি বলবে, গায়ে ধূলা দিবে, চোর লম্পট বলে গাল দিবে কত যন্ত্রণা করবে। সব ছেড়ে আমার পিছনে পিছনে জলে জঙ্গলে ঘুরতে হবে। খেতে, শুতে, ঘুমাতে পারবে না। ঘরে ফিরে যাও, সুখে সচ্ছন্দে থাকতে পারবে।"

রাসে উপেক্ষিতা গোপীকাগণের মতই বালকগণ ঐ কঠোর উক্তির উত্তরে বলিত "আমরা সুখ চাইনা, সংসার চাইনা, বিষয় সম্পত্তি কামনা করি না। শত দুঃখ যন্ত্রনার মধ্যেও আমরা তোমাকেই চাই। তোমাকে ও গুরুভাইদিগকে ছাড়িয়া অন্য কিছুই চাই না।"

ভক্তগণের এইরূপ উক্তি শুনিয়া করুণাময় সহাস্য বদনে বলিতেন "তোমরা নিত্য চিরকাল আমার। আমি চিরকাল তোমাদিগকে রক্ষা করিব। চিন্তা করো না। তোমরা আমার জন্য সবই সইতে পারিবে। তোমাদের উপর দিয়া ঝড়ের মত সব দুঃখ যন্ত্রণা বয়ে যাবে। কিন্তু কেহ তোমাদের কেশাগ্র ছুঁইতে পারিবে না। আমি রক্ষা করিব। তোমরা সবাই হরিনামের বল বাধ, নিষ্ঠায় থাক। আমি ভিন্ন একুলে ওকুলে তোমাদের কেউ নাই। এ কথা ধরাধামে একমাত্র আমিই জানি। কহিলাম সত্য কথা, এ কথা নহে অন্যথা।"

নিষ্কাম প্রেম

"আত্ম সুখ বাঞ্ছা কভু নাহি গোপীকার"

বালভক্তগণ প্রাণের দেবতা বন্ধুসুন্দরকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিত বলিয়াই তৃষিত চাতকের মত ছুটিয়া আসিত। তাহাদের কোন কামনা-বাসনা ছিল না। তাহাদের প্রাণমন বন্ধুময় হইয়া গিয়াছিল।

বন্ধুসুন্দরের কাছে আসিতে যখন তাহাদের কাল বিলম্ব ঘটিত, তখন তাহারা পরস্পরে একত্র হইয়া বন্ধুসুন্দরের হাব ভাব গতিভঙ্গি অনুকরণ করিত। রমেশচন্দ্রের হস্তাক্ষর ও চিঠি লিখিবার ভঙ্গি প্রায় বন্ধুসুন্দরের মতই হইয়া গিয়াছিল। অনেকেরই বস্ত্রাদি পরিধান করিবার ঢং সারা গায়ে কাপড় জড়াইবার কৌশল বন্ধুসুন্দরের মত ছিল। তাহারা সকলে বন্ধুময় হইয়া কাজ করিত।

বালকগণ প্রত্যহ টহল কীর্ত্তন করিত, অনেক নিয়ম নিষ্ঠা ও তপশ্চর্য্যা করিত। কিন্তু তাহারা এসকল করিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে এরূপ মনে করিয়া করিত না। তাহারা ঐরূপ করিলে তাহাদের প্রিয়তম বন্ধুসুন্দর সুখী হইবেন একমাত্র এই ভাবনাই তাহাদের সকল কর্ম্মের প্রেরণা যোগাইত। নিজেদের সুখ সৌভাগ্য, উন্নতি অবনতি যা কিছু সকলই তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরকে তাহারা সম্মান মর্য্যাদা করিত যথেষ্ট, আবার সহজ সরল প্রীতির ভাবে মধুর সখ্য রসময়

ব্যবহারও করিত। অনেক সময় বন্ধুকে তাহারা "হরেকৃষ্ণ" "হরিবোল" বলিয়া ডাকিত। কখনও বা "তুমি" বলিয়া আদর মাখা সম্বোধন করিত। প্রভুবন্ধুও তাহাদিগকে নানাজনকে নানা নাম করিয়া ডাকিতেন। সকলেরই এক একটা আদরের নাম ছিল। কাহাকেও ডাকিতেন "সোয়া তিন হাত", কাহাকেও বলিতেন "নেপোলিয়ন", কাহাকেও বলিতেন "পাঠক", কাহাকেও কহিতেন "সুবল বটু", কাহাকেও বলিতেন "গুপ্ত শিষ্য", কাহাকেও ডাকিতেন "হরেকৃষ্ণ দাস।" বন্ধুসুন্দরের আদরের ডাকে বালকগণ আনন্দে বিগলিত হইয়া যাইত।

তামসী নিশার স্মৃতি

বালকভক্তগণ নিজেদের প্রাণের দুঃখ কখনও মুখ ফুটিয়া বন্ধু-সুন্দরকে বলিত না। পাছে তাহাতে তাঁহার কষ্ট হয়। অথচ বলিবার আগেই অন্তর্দ্রষ্টা বন্ধুহরি তাহাদের মনের সকল কথা হৃদয়ের ব্যথা জানিতেন। একটি বালক তাহার জীবনের কোন একটি গুরুতর পাপের কথা চিন্তা করিয়া সর্ব্বদা বিষাদিত থাকিত। এই বালকটিকেই বন্ধুসুন্দর "সোয়া তিন হাত" বলিয়া ডাকিতেন।

একদিন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"সোয়া তিন হাতের মনে একটা আক্ষেপ আছে। তা আমি ভিন্ন ধরাধামে আর কেউ জানে না। ওসব ভাবতে নেই। ভাব্‌লে চিত্ত মলিন হয়। মরা হয়ে যায়।"

এই কথা শুনিয়া বালকের বিষাদিত প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রভু তখন একখানি কাগজে লিখিয়া দিলেন—

'"শ্রীশ্রী—বাবুজী" !!

"ক্ষেপ পাশরিও। কৈতব দেখিয়া, সখ্যে ভয় হয়॥ অকৈতবে, সখ্য, রাখিও॥"

"তামসী নিশার সেই দুঃখস্মৃতি, সুপ্তির ধাঁধাঁ মাত্র ; মিথ্যা। ইষ্টবাক্য, মিথ্যা নয়॥"

অন্যান্য বালকগণ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু যাহার কথা সে তামসী নিশার দুঃখ স্মৃতি কথাটি লেখা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। তারপর চক্ষুর জলে ভাসিয়া কাঁদিতে লাগিল। বন্ধুসুন্দর তাহাকে অনেক প্রকার সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া বিদায় করিলেন।

বালকের প্রাণে অনুতাপের আগুন জ্বলিতে লাগিল। মনের বেগ প্রশমিত করিতে না পারিয়া সে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিল। যখন সে সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে, ঠিক তখনি শ্রীশ্রীপ্রভু আর একটি বালক দ্বারা আর এক খানি চিঠি তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

বন্ধুসুন্দরের পত্র পাঠ করিয়া বালক কাঁদিয়া ফেলিল। স্নেহের সাগর প্রাণারাম দেবতার আদেশ আর লঙ্ঘন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। প্রেমময় প্রভু বন্ধুসুন্দর তাহাকে নিকটে ডাকাইয়া আনিয়া করুণায় করস্পর্শে তাহার হতাশ প্রাণে আশার আলোক সঞ্চার করিলেন।

"তোমরা আমার"
"আমি তোমাদের সকলের"
—বন্ধুবাণী

মানুষের ভিতর বাহির যখন দুই প্রকার হইয়া যায়, স্বচ্ছ সরলতার যখন অভাব ঘটে মানুষের জীবন তখনই মালিন্যময় হয়। ভিতরে যে-কথা গুমরিয়া মরে, সেই কথা বাহিরে ফুটিতে পারে না। এই অবস্থাতেই মানুষ ক্ষুব্ধ, বিষাদিত, তাপিত, এমন কি উন্মাদ রোগগ্রস্ত পর্য্যন্ত হয়। কেহ বা আত্মহত্যার পথে শান্তির উপায় খোঁজে।

জীবনে ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে তখন মানুষের প্রয়োজন হয় এমন কোন ব্যক্তির কাছে যাওয়া, যিনি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অন্তরের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পারেন। ঐরূপ দেখাতেই মানস-ব্যাধির নিরাময় হইয়া থাকে। অন্তর-দ্রষ্টার করুণার দৃষ্টি-রশ্মিতেই জীবের অবচেতনার পুঞ্জিত দুঃখ সন্তাপ দূরীভূত হইতে পারে।

প্রভু বন্ধুসুন্দর বালকগণের হৃদয়ের গভীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত নিজ স্নেহময় নখদর্পণে দেখিতে পাইতেন। তাই তাঁহার কাছে গিয়া তাহারা নির্ম্মল ছাপ ধবধবে হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে কেবল ঐশী ঐশ্বর্য্য শক্তি বা অন্তর্য্যামিত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাদের মন প্রাণের কথা কহিতেন, তাহা নহে। তিনি পূর্ণরূপে তাহাদিগকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন।

পূর্ণ প্রেমই অখণ্ড জ্ঞান। সর্ব্বতোভাবে ভাল বাসিয়াছিলেন বলিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতেন। ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া

অন্তর জানিতে হইত না। মাধুর্য্যের ঠাকুর প্রীতিময় মধুর ভাবেই প্রিয়জনদের অন্তর বাহির দর্পণের মত দেখিতে পাইতেন। আপনাকেও তাহাদের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন। একদিন কত আদরে প্রাণ জুড়ান স্বরে প্রিয় বালকগণকে কহিয়াছিলেন,—

"—তোমরা আমার, আমি তোমাদের সকলের।"

একটি তাপক্লিষ্ট আত্মা

"যুষ্মাকং হৃদয়ে চকাস্তু সততং চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা"

—শ্রীপ্রবোধানন্দ

যামিনী দ্বিপ্রহর, ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে ভক্তগণ বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছেন। চির জাগ্রত দেবতা বন্ধুসুন্দর জাগিয়াই আছেন। হঠাৎ "রামি ওঠ্, রামি ওঠ্" বলিয়া প্রিয় রামদাসকে ডাকিয়া তুলিলেন। রামদাস উঠিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে তাহাকে আদেশ করিলেন, "এখনই সব ভক্তদের ডাকিয়া তোল্, খোল করতাল লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ কর্।" রামদাস আদেশ পালন করিলেন। সকলে খোল করতাল লইয়া প্রস্তুত হইলেন। রামদাস করতাল হাতে লইয়া বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখের দিকে তাকাইলে, শ্রীমুখে "জয় জয় প্রাণচন্দ্র" কথাটি উচ্চারিত হইল। রামদাস গান ধরিলেন,—

জয় জয় প্রাণচন্দ্র নিত্যানন্দ রাম।
কমন কারুণ্য নিধি আনন্দ ধাম॥

(চাঁদ নিতাই আরে)
বীর-বসুধা-সখা জাহ্নবা-জীবন।
(আমার আনন্দ নিধি রে)
সন্তোষ-নরোত্তম-প্রেম-কুন্দন ॥
(মোর নয়নানন্দ রে)
জগাই মাধাই ত্রাতা পদ্মাবতী ধন।
(প্রভু ভব-ত্রাতা গো)
মঞ্জুল সরোজ-পদে বন্ধু-স্মরণ
(জীবের এই সব গো)

নৈশ কীর্ত্তনের রোলে ব্রাহ্মণকান্দা মুখরিত হইতে লাগিল। আকাশ বাতাস কাঁপিতে লাগিল। কীর্ত্তনীয়া বালকগণ সকলেই নামে প্রেমে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। অদূরে দাঁড়াইয়া বন্ধুসুন্দর কীর্ত্তনানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ তেতুল বৃক্ষটি নড়িতে আরম্ভ করিল। কীর্ত্তনের তালে তালে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা আন্দোলিত হইতে লাগিল। বৃষ্টি-পাতের মত ঝরঝর জল পড়িতে লাগিল। কীর্ত্তনকারীগণ কীর্ত্তনে একেবারে মাতিয়া গিয়াছিল। তথাপি ঐ ব্যাপারে তাহাদের ভয় ভয় করিতে লাগিল। রামদাস চক্ষু বুজিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনে অবর্ণনীয় আনন্দের প্রবাহ খেলিতে লাগিল।

অনেক সময় পরে প্রভুবন্ধু হাততালির শব্দ করিলেন। সঙ্কেত বুঝিয়া কীর্ত্তন শেষ করিলেম। সকলে আসিয়া প্রভুর কাছে দাঁড়াইলেন। সকলেরই অন্তরের আগ্রহ, ব্যাপারটা কি হইল প্রভুর মুখে শুনেন। মধুর হাসিয়া বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "একটি

তাপক্লিষ্ট আত্মা তোদের মুখে হরিনাম শুনে মুক্ত হ'য়ে গেলেন।" রামদাসের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "রামি; চক্ষু বুজিয়া না থাকিলে ঐ মুক্ত আত্মার জ্যোতির দর্শন পেতিস্।" রামদাস মস্তক অবনত করিয়া বন্ধুসুন্দরের চরণ পানে চাহিয়া রহিলেন। কীর্ত্তনে আনন্দাবেশ তাহার তখনও কাটে নাই।

সেইদিনকার কীর্ত্তনানন্দের কথা ও তেতুল বৃক্ষের আনন্দ-স্পন্দনের কথা রামদাসজী জীবনে কখনও ভুলেন নাই। কখনও ব্রাহ্মণকান্দা আসিলে ঐ তেতুল বৃক্ষকে দণ্ডবৎ না করিয়া ফিরিতেন না। ব্রাহ্মণকান্দার ভক্ত পাইলে ঐ বৃক্ষবর কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিতেন এবং ঐদিনকার প্রভুর কৃপার কথা গদগদ কণ্ঠে কহিতেন। উক্ত তেতুল বৃক্ষরাজ বহুদিন প্রকট ছিলেন। সম্প্রতি জল ঝড়ে তাহার দেহান্ত ঘটিয়াছে।

"মুখ থাকবে"

বালক ভক্তগণের মুখপাত্র ছিলেন শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র। প্রভুর আদরের পদাতিক সৈন্যগণের তিনিই ছিলেন বীর সেনাপতি। প্রভু তাহার নাম রাখিয়াছিলেন ধ্রুবানন্দ। এই সব কথা পূর্ব্বেই কিছু কিছু বলা হইয়াছে। ধ্রুবানন্দ নাম রাখিলেও বন্ধুসুন্দর রমেশচন্দ্রকে, "রমা, রমেশ, রমাজী, হরেকৃষ্ণ দাস" ইত্যাদি নানা রঙ্গে ঢঙ্গে ডাকিতেন ও লিখিতেন।

একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "বন্ধু ব্যথিষু", সত্য সত্যই রমেশচন্দ্র ব্যথার ব্যথী ছিলেন। তাঁহার উপর সকল

(চাঁদ নিতাই আরে)
বীর-বসুধা-সখা জাহ্নবা-জীবন ।
(আমার আনন্দ নিধি রে)
সন্তোষ-নরোত্তম-প্রেম-কুন্দন ॥
(মোর নয়নানন্দ রে)
জগাই মাধাই ত্রাতা পদ্মাবতী ধন ।
(প্রভু ভব-ত্রাতা গো)
মঞ্জুল সরোজ-পদে বন্ধু-স্মরণ
(জীবের এই সব গো)

নৈশ কীর্ত্তনের রোলে ব্রাহ্মণকান্দা মুখরিত হইতে লাগিল। আকাশ বাতাস কাঁপিতে লাগিল। কীর্ত্তনীয়া বালকগণ সকলেই নামে প্রেমে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। অদূরে দাঁড়াইয়া বন্ধুসুন্দর কীর্ত্তনানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ তেতুল বৃক্ষটি নড়িতে আরম্ভ করিল। কীর্ত্তনের তালে তালে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা আন্দোলিত হইতে লাগিল। বৃষ্টি-পাতের মত ঝরঝর জল পড়িতে লাগিল। কীর্ত্তনকারীগণ কীর্ত্তনে একেবারে মাতিয়া গিয়াছিল। তথাপি ঐ ব্যাপারে তাহাদের ভয় ভয় করিতে লাগিল। রামদাস চক্ষু বুজিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনে অবর্ণনীয় আনন্দের প্রবাহ খেলিতে লাগিল।

অনেক সময় পরে প্রভুবন্ধু হাততালির শব্দ করিলেন। সঙ্কেত বুঝিয়া কীর্ত্তন শেষ করিলেম। সকলে আসিয়া প্রভুর কাছে দাঁড়াইলেন। সকলেরই অন্তরের আগ্রহ, ব্যাপারটা কি হইল প্রভুর মুখে শুনেন। মধুর হাসিয়া বন্ধুসুন্দর কহিলেন, “একটি

তাপক্লিষ্ট আত্মা তোদের মুখে হরিনাম শুনে মুক্ত হ'য়ে গেলেন।” রামদাসের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “রামি, চক্ষু বুজিয়া না থাকিলে ঐ মুক্ত আত্মার জ্যোতির দর্শন পেতিস্।” রামদাস মস্তক অবনত করিয়া বন্ধুসুন্দরের চরণ পানে চাহিয়া রহিলেন। কীর্ত্তনে আনন্দাবেশ তাহার তখনও কাটে নাই।

সেইদিনকার কীর্ত্তনানন্দের কথা ও তেতুল বৃক্ষের আনন্দ-স্পন্দনের কথা রামদাসজী জীবনে কখনও ভুলেন নাই। কখনও ব্রাহ্মণকান্দা আসিলে ঐ তেতুল বৃক্ষকে দণ্ডবৎ না করিয়া ফিরিতেন না। ব্রাহ্মণকান্দার ভক্ত পাইলে ঐ বৃক্ষবর কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিতেন এবং ঐদিনকার প্রভুর কৃপার কথা গদগদ কণ্ঠে কহিতেন। উক্ত তেতুল বৃক্ষরাজ বহুদিন প্রকট ছিলেন। সম্প্রতি জল ঝড়ে তাহার দেহান্ত ঘটিয়াছে।

“মুখ থাকবে”

বালক ভক্তগণের মুখপাত্র ছিলেন শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র। প্রভুর আদরের পদাতিক সৈন্যগণের তিনিই ছিলেন বীর সেনাপতি। প্রভু তাহার নাম রাখিয়াছিলেন ধ্রুবানন্দ। এই সব কথা পূর্ব্বেই কিছু কিছু বলা হইয়াছে। ধ্রুবানন্দ নাম রাখিলেও বন্ধুসুন্দর রমেশচন্দ্রকে, “রমা, রমেশ, রমাজী, হরেকৃষ্ণ দাস” ইত্যাদি নানা রঙ্গে ঢঙ্গে ডাকিতেন ও লিখিতেন।

একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, “বন্ধু ব্যথিষু”, সত্য সত্যই রমেশচন্দ্র ব্যথার ব্যথী ছিলেন। তাঁহার উপর সকল

বালকগণের ভার দিয়া ও সকল গুরুতর কাজের দায়িত্ব দিয়া প্রভুবন্ধু নিশ্চিন্ত রহিতেন। একদিন কোন বিশেষ কর্ত্তব্যের ভার তার উপর ন্যস্ত করিয়া প্রভু লিখিয়াছিলেন, "ওহে ভাই, ভাই হে দেখব, দেখব এই কাজ হলে বুঝব আমি গুরু, হরেকৃষ্ণ দাস শিষ্য। তোরও মুখ থাকবে, আমারও মুখ থাকবে।"

"পোষা শুক পাখী"

বালকগণ যেরূপ আপন জীবনভার সম্পূর্ণরূপে প্রভুবন্ধুর উপর সমর্পণ করিয়াছিলেন, প্রভুও তেমনি তাহাদের উপর আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া মিলনানন্দের সমুদ্র পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রেমের এইত স্বভাব! কতনা আপন জানিয়া বালকদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমার নিত্য চিরকালের অভিভাবক।" তন্মধ্যে রমেশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন,—

"ভাই রাজালোক, তোমার পোষা শুক পাখী
সত্য জান। তুমি আমার অভিভাবক, অন্য নয়॥"

পত্রের কি মাধুর্য্যময় ভাষা! কি আদরের ডাক! "ভাই রাজা লোক!" আপনাকে ভক্তের পোষা শুক পাখী স্বীকার করিয়া তাহাকে একমাত্র অভিভাবক বলিয়া তাহার করে আপনাকে সমর্পণ! ইহাতে যে কি গভীর প্রেমের পরিচয় দিলেন, তাহা ভাগবত-রসিকগণের অনুভব-বেদ্য।

যিনি একমাত্র শরণ্য, তিনি প্রেমের দ্বারে প্রিয়তম ভক্তগণের শরণ গ্রহণ করিতেছেন। আর বলিতেছেন—"হে হে হে হে রমা হে তুমি এই কর যেন মোরে দয়া কর হে।"

"তুমি বন্ধুর সত্য প্রতিনিধি"

রমেশচন্দ্র যে কেবল বালকযূথ মধ্যে যূথপতি ছিলেন তাহাই নহে, বালকদের মধ্যে তিনি বন্ধুর প্রতিনিধি-স্বরূপও ছিলেন। একদিন একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "রমা, তুমি বন্ধুর সত্য প্রতিনিধি। নিজেকে বড় জ্ঞান করিও, স্বপদে ও প্রতিষ্ঠায় থাকিও। ব্রহ্মচর্য্য করিও, করাইও।"

নিজেকে প্রভুবন্ধুর প্রতিনিধি-স্বরূপ জানিয়া "বড় জ্ঞান" করিতে বলিয়াছেন। স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে লিখিয়াছেন। আপনাকে বড় জ্ঞান না করিলে রমেশচন্দ্র কখনও সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিতে পারিবেন না।

জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়াই রমেশচন্দ্রের কাজ। তাই তাহার কাছে যখন চিঠি দিতেন বা উপদেন দিতেন, তখন প্রায়শঃ "করিও, করাইও" এইরূপ ভাষা লিখিতেন। "সদা সর্ব্বতোভাবে নিত্য সবকে নানাবিধ উপদেশ দিও।" এই আদেশ রমেশচন্দ্রের উপর অর্পিত ছিল।

ফরিদপুর সহরের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড একটি মেলা বসিত। এই খ্যাতনামা মেলায় বহু দূর দূরান্তর হইতে নরনারী সমাগত হইত। মেলা উপলক্ষে যত লোক আসিত, সবার কানে যাহাতে হরেকৃষ্ণ নাম যায়, শেষ রাত্রে যাহাতে সকলে নাম শুনিতে পায়—এই গুরুদায়িত্ব রমেশচন্দ্রের উপর ন্যস্ত ছিল।

সমগ্র সহরটিকে ঘুরিয়া ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সবাইকে হরিনাম দিয়া "শীতল ছাপ সাদা বরফের মত ধবধবে" করিয়া দিবার আদেশ ও নির্দ্দেশ শ্রীশ্রীপ্রভু রমেশচন্দ্রকে দিয়াছিলেন। প্রত্যেক বৎসরই দিতেন এবং ঐ কার্য্য উদ্ধারের জন্য রমেশচন্দ্রকে পরম আশীর্ব্বাদ দানে শক্তি সঞ্চার করিতেন। কোন সময় শ্রীহস্তে চিঠিতে লিখিয়াছিলেন,—

"স্বাধীন থাকিও। সদা নির্ভয় নিশ্চিন্ত থাকিও।
চিন্তা করো না। চির গুরু রইলাম॥"

———

রমেশচন্দ্রের সাধনা

প্রাণারাম শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের প্রেমের দাবী পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে রমেশচন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। প্রভুবন্ধুর ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া বালকগণকে সংগঠন করা রমেশচন্দ্রের জীবনের ব্রত-স্বরূপ ছিল। বালকদিগকে কত উপদেশ দিতেন, কত স্নেহভালবাসা ঢালিয়া নিয়ম নিষ্ঠার পথে চালিত করিতেন। প্রত্যেকের ভাব ও অবস্থানুযায়ী চিঠিপত্র লিখিয়া পথের নির্দ্দেশ দিতেন। রমেশচন্দ্রের চিঠি পড়িলে ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য বশতঃ প্রভুবন্ধুর চিঠি বলিয়া ভ্রান্তি হইত। একটি বালককে লিখিয়াছিলেন,—"ত্যাগেই মহাতৃপ্তি লাভ হয়। ত্যাগই মুক্তি পথের পথিক হয়। নিয়ম নিষ্ঠা না থাকিলে দেহ দুর্ব্বল হয়। মন অলস অবশ হইয়া আসে। জীবের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না। এই সব বুঝিয়া চলিয়া সবল হইয়া নিজেরা সুখী হও।

তোমাদিগকে ভালবাসি, আমাকে সুখী কর। তোমাদের অবস্থায় প্রভু কত দুঃখী তাহা কি ভাব না ভাই! প্রভুর দুঃখে দুঃখী হওয়া মহাসাধন।" (বন্ধুকথা পৃঃ ৬৪)

অন্য এক সময় বালকদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা সদাচার ছাড়িও না। তোমাদের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য নিয়ম নিষ্ঠা করিতে বলি, আর বলি প্রভুর সুখের জন্য। তাহাতে তোমরা আমার দোষ লইও না।"

তোমাদিগকে নিয়ম নিষ্ঠা করিতে বলি "প্রভুর সুখের জন্য" "প্রভুর দুঃখে দুঃখী হওয়া মহাসাধন"—এই দুইটি কথার মধ্যে প্রভুবন্ধুর প্রতি রমেশচন্দ্রের হৃদয়ের সুগভীর প্রেম ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। রমেশচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াই বালকগণ পরস্পর অচ্ছেদ্য অকৃত্রিম স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বন্ধুসুন্দরের চারিদিকে মধুলোলুপ মধুপের মত লাগিয়া থাকিত।

আর রমেশচন্দ্রের প্রধান চিন্তা ছিল বালকগণের জীবন-দল দ্বারা একটি শতদল পদ্ম রচিয়া পরমারাধ্য প্রভুবন্ধুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিবেন। রমেশচন্দ্রের নিকট প্রভুর আদরমাখা পত্রের তিনখানি লিখিত হইতেছে।—

তিনটি আদরমাখা পত্র

(১)

শ্রীকন্বুপদপঙ্করূহ মুঞ্জিলমঞ্জুপেষু—

ভাই রাজা লোক ! তোমার পোষা শুক পাখী সত্য জেন। তুমি আমার অভিভাবক, অন্য নয়।

১। এই মেলা উপলক্ষে কত লোক আসবে। তাদের সবার কানে হরেকৃষ্ণ নাম যায়—ইহা করিও। এই ভার তোমার মস্তকে দিনু।

২। রাত্রিকাল পাপীতাপীর কলুষ শ্রাদ্ধের সময়। শেষ-রাত্রে তাহারা যাহাতে শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণ নাম শুনিতে পায়, তাহা সহরময় নিত্য করাইও। বন্ধু ভাট্

(২)

রমাজী রমাসু

লক্ষণে মানুষ চিনে নিও, তদ্রূপ ব্যবহার করিও, করাইও।

হরেকৃষ্ণ

১। আত্মরক্ষা করিও। ২। কোনও সঙ্গ ভাল নয়। ৩। স্বপাক ভিন্ন নয়। ৪। ছেলেদের খেলা খেলিও না, ধর্ম্ম নষ্ট হয়। ৫। অন্য চাহিও না মৃত্তিকা বই। ৬। শূন্য থেক না সদা স্মরণ বই। ৭। অন্য ভাবিও না গুরু গোবিন্দ বই। ৮। উদর ভরিও না ক্ষুধা বই।

(৩)

রমাস্থ—

দেখব কেমন ব্যথী। হরিবোল। হরিনাম হাজার হাজার ছড়াইছি। আরও কত কোটি পদ্মাধিক ছড়িয়ে বেড়াব। কিন্তু হে হে হে হে রমা হে! তুমি এইবার মোয় দয়া কর হে বটে। কঠিন হলেও হতে হবে বটে। যত্নাধীন সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। অদ্য এই বেলাই সমাধান করহে দয়াল মহারাজা।

কমিও কারুণ্যময়ী কটাক্ষ কমন,
শমিও আশীষ স্বস্তি মানসরঙ্গন,
উদ্দেশে অমল পাণি, অমিয়মঙ্গল বাণী,
অরপিও কৃষ্ণ কান্তা বন্ধু আকিঞ্চন।

ভারতীর পত্র

"প্রাণে ত জেনেছি, তুই প্রাণ কানাই রে"

একদিন প্রিয় ভক্ত গোপাল মিত্র মহাশয় বাকচর হইতে হরিগুণ গাইতে গাইতে ব্রাহ্মণকাঁদায় উপস্থিত হইয়াছেন। বন্ধুসুন্দর ব্রাহ্মণকাঁদার বাড়ীতে আছেন। মিত্র মহাশয় প্রভুবন্ধুকে দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে "হরেকৃষ্ণ" ধ্বনি করিলেন।

মিত্র মহাশয়কে দেখিতে পাইয়াই বন্ধুসুন্দর তাহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে নিকটে ডাকিলেন। নিকটে আসিলেই একখানি চিঠি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—"জেঠা, পড়িয়া দেখ, তোমাদের ভারতী মহাশয় আমাকে কি চিঠি লিখিয়াছে। মিত্র মহাশয় পত্রখানি প্রণাম করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন,—

প্রাণ কানাইয়া সেত তুই রে।
তবে মিলন বঞ্চিত কাঁহে মুই রে !
তুই গোলোক অবতার,
নীচ নরক মুই ছার,
তবু তোরে প্রেমে কেন আলিঙ্গিতে চাই রে ?
দেখা নাই কথা নাই,
কোন ত সম্পর্ক নাই,
তবু ভাবি আমি বড় তুই ছোট ভাই রে !
কোন কি জনমে মোর,
বড় ভাই ছিনু তোর,
স্নেহে হৃদে প্রেমসিন্ধু উথলে কি তাই রে !

"প্রেমানন্দ সুবল প্রেমবশ্য বন্ধু"

বাবা—প্রেমানন্দ ভারতী

কোন পাপে বল তবে,
জনমিনু পুনঃ ভবে,
হেন পাপাচারী হয়ে কাতরে সুধাই রে ?
বল্ বল্ প্রাণ কানাই রে !
প্রাণে ত জেনেছি তুই প্রাণ কানাই রে ;
ব্রজের সে কালাচাঁদ,
নদীয়ার গোরাচাঁদ,
সংশয় ত নাই ইথে সংশয় ত নাই রে।
ছিনু আমি তোর সাথে,
সংশয় নাহিক তাতে,
তোর প্রিয় কোনরূপে স্মরণ ত নাই রে !
হয়ে হেন অধিকারী,
এবে হেন পাপাচারী,
কেন হনু বল কানু ভাবিয়া না পাই রে ?
আর নাহি সরে কথা
আর নাহি সহে ব্যথা
পতিতে নিস্তার কর তোরই দোহাই রে।
বুকে আয় প্রাণ কানাই রে !

(প্রেমানন্দ ভারতী)

পত্রপাঠে মিত্র মহাশয়ের কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। পত্রের প্রত্যেকটি অক্ষর ব্রজের সখ্যরসপুটিত। প্রত্যেকটি পংক্তি সরস প্রাণস্পর্শী। মিত্র মহাশয় অনির্ব্বচনীয় রস-মাধুর্য্যে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে থাকিয়া পত্রখানি বুকে ধরিয়া

—"প্রাণে ত জেনেছি তুই প্রাণ কানাই রে ;
ব্রজের সে কালাচাঁদ,
নদীয়ার গোরাচাঁদ,
সংশয় ত নাই ইথে সংশয় ত নাই রে !"

এই সন্দেহাতীত শুভ সত্যবাণী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে উন্মাদের মত উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। পত্রখানি পড়িয়া শুনাইয়া এই আনন্দের অংশ অপর দশজনকেও দিবেন এই আশা করিয়া পত্র হাতে করিয়া শ্রীমন্দিরের বাহিরে চলিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দরও দ্রুতগতিতে ঘরের বাহিরে আসিয়া তাহার পশ্চাৎধাবন করিলেন। মিত্র মহাশয়কে নিকটে পাইয়াই আব্দারের সুরে বলিলেন.—

"গোপাল, আমার পত্র দাও"

মিত্র মহাশয় বলিলেন—"প্রভো, আপনাকে ধরেছি, আর লুকায়ে থাক্‌তে পার্‌বেন না। খেলার ছলে আপনি আপনার তত্ত্ব কত বলেছেন কত শুনেছি ; কিন্তু ছল ক'রে বল্‌লেও বুঝ্‌তে দেন নাই, ধরা দিলেও ধর্‌তে পারি নাই। আজ আর আমি আপনার কথা শুনবো না।"

লীলাময় প্রভু তখন বালকের মত সকরুণভাবে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া পুনঃ পুনঃ "গোপাল আমার পত্রখানি দাও, গোপাল আমার পত্রখানি দাও" বলিয়া পত্রখানি চাহিতে লাগিলেন। তখন মিত্র মহাশয় পত্রখানি লইয়া দৌড়িয়া গিয়া রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া ছুটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ধীর গম্ভীর প্রভুবন্ধুও চঞ্চল পাগলপারা

প্রিয়ভক্তের পেছনে পেছনে "গোপাল আমার পত্র দাও, গোপাল আমার পত্র দাও" বলিয়া রাখালিয়া অভিনয় করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তগণ প্রভুর এইরূপ অপূর্ব্ব লীলা-খেলা ও ভুবনমোহন রূপের শোভা নিরীক্ষণ করতঃ অনতিদূর হইতে করতালি দিয়া কীর্ত্তনানন্দ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশক্তিময় ভক্তাধীন বন্ধুহরি মিত্রগোপালকে ধরিতে পারিলেন না।

পরাজয় স্বীকার করিয়া চির-হাসির দেবতা শিশুবৎ কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটস্থ বাপীনীরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইলে, মিত্র গোপাল প্রাণারাম বন্ধুর নয়নে অশ্রুজল দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি ব্যস্তভাবে দ্রুতগতি নিকটে উপস্থিত হইয়া অবনত মস্তকে পত্রখানি প্রাণপ্রিয়তম প্রভু বন্ধুসুন্দরের শ্রীহস্তে প্রদান করিলেন। শঠ-শিরোমণি তখন ঐ পত্রখানি পাইয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মিত্র গোপাল ভাবময়ের অচিন্ত্যনীয় ভাব ভাবিতে ভাবিতে ধূলায় লুটাইয়া বিহ্বলভাবে রহিলেন।

"সর্ব্বদা হরিনাম শোনাবেন"

"হরিবলে অবহেলে নিয়তি এড়াই রে" —শ্রীবন্ধুহরি

গোয়ালচামট গ্রামে গুরুচরণ দে মহাশয় বাস করিতেন। তাহার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে জনৈক দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলেন যে, উহার গণ্ডযোগে জন্ম হইয়াছে এবং তার ফলে আঠার মাসের মধ্যে পিতার মৃত্যু অনিবার্য্য।

শ্রীযুত দে মহাশয় শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরকে বাৎসল্য স্নেহে ভালবাসিতেন এবং "জগৎ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। একদিন পুত্রটিকে কোলে লইয়া তিনি ব্রাহ্মণকাঁদায় গিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুকে কহিলেন "জগৎ, খোকাকে একটু দেখতো!" শ্রীশ্রীপ্রভু খোকাটির দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"দৈবজ্ঞ ঠাকুর যা বলিয়াছে ঠিকই। তবে এর আঠার মাসের সময় আপনার মৃত্যুবৎ অবস্থা হইবে, মৃত্যু হইবে না। কিন্তু এই ছেলের বয়স যখন ছয় বৎসর হইবে তখন ইহার মৃত্যু অবধারিত।

এই কথা শুনিয়া দে মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন "জগৎ, তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তুমি আমাদের রক্ষা কর। তুমি ইচ্ছা করিলেই পার।" গুরুচরণের কাতরোক্তি শুনিয়া প্রেমময় প্রভু কহিলেন—"নিয়তির হস্ত হইতে রক্ষা করিবার শক্তি একমাত্র হরিনামেরই আছে। আপনি এক কাজ করুন, ইহাকে সর্ব্বদা হরিনাম শোনাবেন। পাঁচ বৎসর বয়স হইলেই একখানা ছোট খোল কিনে তালে তালে নাচায়ে কীর্ত্তন করবেন। আপনি এখন হইতে সর্ব্বদা চল্‌তে ফির্‌তে হরিনাম মহামন্ত্র উচ্চারণ কর্‌বেন।"

প্রভুবন্ধুর কথায় দে মহাশয় তখনকার মত আশ্বস্ত হইয়া গেলেন। কিন্তু সর্ব্বদা নানারূপ বিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় ভাবী বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইবার মূলমন্ত্র দিনের পর দিন ভুলিয়া গেলেন।

আঠার মাস হইতে না হইতে দে মহাশয় কঠিন ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হইলেন। শ্মশানে শুইবার অল্প সময় পূর্ব্বে

প্রভুবন্ধুর উপদেশ মনে পড়িল। তখন কাতরকণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কেবল হরেকৃষ্ণ হরিবোল বলিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য কথা যে, এই ঔষধই তাহাকে শেষ রক্ষা করিল।

দে মহাশয় পুত্রটির নাম রাখিয়াছিলেন কেশব। ছয় বৎসরে কেশবের মৃত্যুর কথা দে মহাশয় মহামায়ার ছলনায় একেবারে ভুলিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে কেশব ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিতেই ভীষণ নিউমোনিয়া রোগে কাতর হইয়া পড়িল।

চিকিৎসায় কোনই ফল হইল না। বারদিন পার হইবার পর একদিন অবস্থা এমনই গুরুতর হইয়া উঠিল যে, ডাক্তার কবিরাজেরা সকলে বলিলেন অদ্য সন্ধ্যার মধ্যে সব শেষ হইয়া যাইবে। এই নিদারুণ কথায় বালকের পিতামাতা আত্মীয়স্বজন কাঁদিয়া আকুল হইলেন। দে মহাশয়ের বাড়ীর পার্শ্বে অশ্বিনী দত্ত মহাশয়ের বাড়ী। অশ্বিনী প্রভুবন্ধুর একনিষ্ঠ ভক্ত। দে মহাশয় আসিয়া অশ্বিনীর কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন, বলিলেন অশ্বিনী, তুমি তোমার প্রভুকে বলিয়া আমার কেশবকে রক্ষা কর। তার কাছে যাইবার আমার আর মুখ নাই।

অশ্বিনী প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া কেশবের শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করিলেন। সকল শুনিয়া প্রভু কহিলেন— "ওরে, আমি তো তাকে আগেই সাবধান করিয়া বলিয়াছিলাম; হরিনাম না করিলে এ বিপদে নিয়তির হাত হইতে কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না। যা হউক, তুই এখনই যা, তাড়াতাড়ি গিয়া তাহাকে ঘিরিয়া নিরন্তর হরিনাম কর।

প্রভুর আদেশ পাইয়া অশ্বিনী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। ঔষধ পথ্য আত্মীয়স্বজন সকল সরাইয়া দিয়া কেশবকে ঘিরিয়া মনেপ্রাণে হরিনাম করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি নাম করিবার পর বালক আশাতিরিক্ত সুস্থতা লাভ করিল ও আঠার দিনে অন্ন পথ্য করিয়া ক্রমে সম্পূর্ণ নিরাময় হইল। এই কেশব পরবর্ত্তীকালে মূল গায়ক হইয়া ব্রাহ্মণকাঁদায় কীর্ত্তনের দল গঠন করিয়াছিল।

"যদি বাঁচতে চাস্, ত হরিনাম কর"

গোপাল নামক জনৈক উচ্ছৃস্খলস্বভাব যুবককে শ্রীশ্রীপ্রভু একদিন বলিলেন, "গোপাল, তোর বাড়ীতে যে দুটি প্রকৃতি আছে, উহারাই তোর কাল-স্বরূপ জানবি। যদি বাঁচতে চাস্, কদাচার ত্যাগ করে হরিনাম কর।

মৃত্যুভয়ে ভীত গোপাল কিছুদিন সংযত থাকিয়া নিয়ম করিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল কিন্তু অল্পদিন পরেই আবার উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। অপর একদিন প্রভু বন্ধুসুন্দর তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—

"তুই যেমন হরিনাম ছাড়িয়া ব্যভিচারে নিযুক্ত হয়েছিস্, তেমনি আগামী জ্যৈষ্ঠমাস মধ্যে তোর মৃত্যু হবে, যদি বাঁচতে চাস্, ত হরিনাম কর।"

উচ্ছৃঙ্খল যুবক সে কথা কানে তুলিল না। দেখিতে দেখিতে জ্যৈষ্ঠমাস মধ্যে তার জীবনলীলা সাঙ্গ হইল।

——

"মহাপ্রভুর এক অঙ্গ খসে পড়েছে"

সন ১৩০৪, ভাদ্র মাস। জন্মাষ্টমী দিবস। ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে রাধাগোবিন্দজীর মন্দির-প্রাঙ্গনে কীর্ত্তন হইতেছে। গোপাল মিত্র মহাশয় পদকীর্ত্তন করিতেছেন। খলিলপুরের মধুসূদন গুহ বিখ্যাত গায়ক। বৈঠকী-অঙ্গের ওস্তাদ, কণ্ঠ মধুর। মধুসূদন খ্যাতনামা গায়ক, তাই মিত্র মহাশয় তাঁহাকে আগে গাহিতে দিয়া নিজে দোয়ারকি আরম্ভ করিলেন।

দৈবাৎ কীর্ত্তনে তাল কাটিয়া গেল। কীর্ত্তন-আনন্দরূপী বন্ধু-সুন্দর ইহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। তিনি মন্দিরের মধ্যে ছিলেন। একটি বালককে বলিলেন— "গোপাল মিত্রের নিকট হইতে খাতা লইয়া আয়।" বালক মিত্র মহাশয়ের নিকট খাতা চাহিলে তিনি দিলেন না। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, কীর্ত্তনে তাল কাটিবার জন্য প্রভু রাগ করিয়াছেন। প্রভুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পুনঃ তালের সহিত গান গাহিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর মর্ম্মবেদনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বালকগণ যাহারা নিকটে ছিল তাহারা প্রভুকে সুখ দিবার জন্য হরিবোল, হরিবোল ধ্বনি করিতে লাগিল। কেহ তাল পাতা, কেহ কলা পাতা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কিন্তু প্রভু কিছুতেই স্থির হইতে পারিলেন না। অবশেষে মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন ও বিষণ্ণ মনে গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিলেন।

কীর্ত্তন শেষ হইল। তাল কাটার জন্য বন্ধুসুন্দর যে এত বেদনা পাইয়াছেন তাহা মিত্র মহাশয় জানিতে পারেন নাই। তিনি বাকচর যাইবার জন্য বিদায় লইতে প্রভুর নিকট গেলেন। প্রভু কোন সাড়া দিলেন না। অনেক কাতর প্রার্থনার পর অতি ধীরে ধীরে বলিলেন—"আজ যা হয়েছে তোরা বুঝবি কি? মহাপ্রভুর এক অঙ্গ খসে পড়েছে। গোপাল মিত্র অপরাধী, ও কেন করতাল বাড়ি দিয়া গান ধরিল না?"

গায়ক মধু গুহ মহাশয় করজোড়ে কহিলেন—"প্রভু, এ অপরাধ আমার। আমি আগে গান ধরেছি। গান মুখস্থ নাই, তাই তাল কেটে গেছে।" এই বলিয়া বিষণ্ণ মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উপস্থিত ভক্ত মণ্ডলী সকলেই দুঃখিত অন্তরে করজোড়ে সমস্বরে কহিলেন,—"প্রভু, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।"

প্রভু বলিলেন—"তোমাদের কারও দোষ নাই। মাত্র গোপাল মিত্র অপরাধী।" প্রভুর কঠোর বাক্য শুনিয়া মিত্র মহাশয় বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রভু বলিলেন—"দল তোমার, অপরাধ হবে কার? এ অপরাধের ক্ষমা নাই।"

ভক্তবৃন্দ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ। মিত্র মহাশয়ের চোখের জলে অঙ্গের বসন ভিজিয়া যাইতেছে। অনেকক্ষণ পরে প্রভু বন্ধুসুন্দর অতি মৃদু স্বরে কহিলেন—"বাকচরের সকলে যদি দয়া ক'রে ওকে সঙ্গে করে কীর্ত্তন করে, তাহলে যদি কোন দিন অপরাধ যায়।" এই বলিয়া প্রভু নীরব হইলেন।

"গোপালের অপরাধ গিয়াছে"

পরদিবস প্রভাতে মলিন মুখে মিত্র মহাশয় বাকচর চলিয়া আসিলেন। মনের দুঃখে সারাদিন কিছুই খাইলেন না। রাত্রে অতি সামান্য জলযোগ করিলেন। প্রভু অপরাধ ক্ষমা করিলেন না ভাবিয়া কেবলই অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মিত্র মহাশয়ের সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। কোন কাজই ঠিক মত হইতেছে না। পরদিন স্নান করিতে যাইয়া প্রভু প্রদত্ত নামাবলীখানি ঘাটে ফেলিয়া আসিলেন। ভোগ রান্না করিতে গিয়া বহু রকম ভুল করিলেন। শেষে নিবেদন করিতে যাইবেন এমন সময় নামাবলীর কথা মনে পড়িল। ভোগ নিবেদন করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া যাইয়া ঘাটে নামাবলী পাইলেন। নামাবলী মাথায় জড়াইয়া গৃহাভিমুখে আসিতেই দূর হইতে হরিধ্বনি শোনা গেল।

মিত্র মহাশয় স্থির হইয়া উৎকর্ণ দাঁড়াইলেন। কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব রোল শুনিয়া বুঝিলেন সঙ্গে প্রভু আছেন। কীর্ত্তনে প্রভু থাকিলে যেরূপ ধ্বনি উঠিত, না থাকিলে কখনও সেরূপ হইত না। তাই প্রিয়জনেরা কীর্ত্তন শুনিয়াই বুঝিতে পারিতেন, প্রভু স্বয়ং বাহির হইয়াছেন কিনা। মিত্র মহাশয় ঊর্দ্ধমুখে কীর্ত্তন অভিমুখে ছুটিলেন।

বহুলোক সঙ্গে বিরাট কীর্ত্তন বাহির হইয়াছে। অগ্রভাগে মহিমদাস। তিনি মিত্র মহাশয়কে দেখিয়াই জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"তোমার অপরাধ গিয়াছে। ঐ দেখ পশ্চাতে প্রভু আসিতেছেন। তুমি চলিয়া আসিবার পর প্রভু আজ সকাল হইতে

বলিতেছেন—"গোপালের অপরাধ গিয়াছে। আমি বাকচরে যাব, এখানে থাকিতে পারিব না।" এই বলিয়া মহিম মিত্র মহাশয়ের হাতে একখানি কাপড় দিয়া বলিলেন,—"প্রভু তোমাকে কাপড় দিয়াছেন, তোমার মেয়েকে দিবার জন্য।"

মিত্র মহাশয় দেখিলেন পদ্মের মত হাসিভরা মুখে প্রভু হেলিয়া ছুলিয়া আসিতেছেন।

মিত্র মহাশয় চরণে পতিত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি করিতে লাগিলেন। নয়ন জলে পথের ধূলা ভিজিয়া গেল। ভক্তগণ ধরিয়া তুলিলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে নূতন গান আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন রোলে ধরণী কাঁপিতে লাগিল। সকলের মনে আনন্দ হইল। বিশ্বজীবের অপরাধ যেন ঘুচিয়া গেল।

একটি গান ফিরে ফিরে শতবার চলিতে লাগিল। কী বিপুল আনন্দ!

রাধা রাধা রাধা ব'লে কাঁদে গোরা রায়।
আবেশে অবশ অঙ্গরে অরুণ নয়নে চায়॥
করতালে বাজেরে মাদল;
নিত্যানন্দ নাচে আর বলে হরিবল;
হে'লে দু'লে বাহু তুলে
ডাকে সবে উভরায়॥
ভক্তবৃন্দ আনন্দে মগন;
গৌর গদাধরে ঘি'রে নাচে সর্ব্বজন;
প্রেম স্বরে প্রাণ ভ'রে
সবে হরি নাম গায়॥

হরি হরি রব নিরন্তর ;
গরজে গভীর নাদে শান্তিপুরেশ্বর ;
বন্ধু বলে ধরাতলে
প্রেমের বন্যা ভেসে যায় ॥

"সেও মানুষ আমিও মানুষ"

শ্রীশ্রীপ্রভু বাকচর অঙ্গনে আছেন। গোপালপুর গ্রামের যাদবচন্দ্র গোস্বামী মহোদয় আসিয়াছেন। আসিয়াছেন কোন নিজ বৈষয়িক কাজে। আনুষঙ্গিক ভাবে প্রভু জগদ্বন্ধুকে দেখিয়া গেলে মন্দ হয় না। আঙ্গিনার বহিঃপ্রাঙ্গনে প্রভুর প্রিয়ভক্ত বঙ্কুবিহারী সাহাকে দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় কহিলেন, "আমি প্রভুর দর্শন চাই, তুমি গিয়া তাঁকে খবর দাও।"

ভক্তবর বঙ্কু, গোস্বামিজীর বাক্য আনুযায়ী প্রভুর কাছে গিয়া তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "সেও মানুষ আমিও মানুষ সে আমায় দর্শন করে কি করবে!" বঙ্কুবিহারী ঠিক এই কথা গোস্বামী মহাশয়কে জানাইল। তিনি দুঃখিত ও সঙ্কুচিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একসময় শ্রীশ্রীপ্রভু স্বেচ্ছায় উক্ত গোস্বামী মহোদয়ের গোপালপুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীকানাই গোপালের মন্দিরের সম্মুখে কীর্ত্তনানন্দ করিয়াছিলেন। কৃপা দর্শন পাইয়াও গোস্বামিজীর প্রভুতে ঈশ্বর বুদ্ধি জন্মে নাই। বংশমর্য্যাদার অভিমানে নয়ন বাঁধাই রহিয়াছে।

কোন সময় কোন ব্যক্তির সঙ্গে প্রভু জগদ্বন্ধুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "সেও মানুষ আমিও মানুষ, বিশেষ আর কি ?" আজ অনেকদিন পরে শ্রীশ্রীপ্রভু তাহার সেই উক্তিটিই তাহাকে শুনাইয়া দিয়া স্বীয় অন্তর্য্যামিত্বের পরিচয় দিলেন। আর গোঁসাইজীও নিজে ধরা পড়িয়া কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন।

যাহারা কোনও না কোন কারণে অভিমানী, তাহারা প্রায়শঃ দর্শনে বিফল মনোরথ হইয়া যাইত। অন্ধ কাঙ্গাল পতিতকে অনেক সময় স্বেচ্ছায় দর্শন দিতেন। দর্শন সম্বন্ধে প্রভুর কোন নিয়ম ছিল না। কে দর্শন পাইবে, কে পাইবে না, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী প্রিয়জনেরাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না।

দর্শন প্রার্থী কাহাকেও বলিতেন, "ওর এখন সময় হয় নাই।" কাহাকেও বলিতেন, "ওর এখন দর্শন হবে না" কখনও বলিতেন, "ওকে দর্শন দেওয়া শ্রীমতীর নিষেধ।" কাহারও সম্বন্ধে বলিতেন, "দেবতারা নিষেধ করিতেছেন।" আবার কাহাকেও বা তৎক্ষণাৎ দর্শন দিতেন। কাহাকেও বলিতেন, "দু'দিন পরে দেখা পাবে" "পাঁচদিন পরে দর্শন মিলিবে।" আবার তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময় আসিলে সহজেই দর্শন দিতেন।

নায়েব চারু ঘোষের কথা

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।

—শ্রীগীতা

চারুচন্দ্র ঘোষ নামক এক ব্যক্তি যশোহর নড়াইল ষ্টেটের অন্তর্গত খলিলপুর কাচারীর নায়েব ছিলেন। তিনি অতিশয় দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রজাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালাইতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সকলেই তাহাকে বাহিরে ভয় ও অন্তরে ঘৃণা করিত। একদিন নায়েব মহাশয় ঘুরিতে ঘুরিতে বাকচর অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অভিমানী নায়েব জমিদারী চালে সগর্ব্বে প্রভুর দর্শন চাহিলেন। তিনি ভাবিলেন, নায়েব বাবু আসিয়াছেন বলিয়া সকলে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসনাদি দিবে। তিনি এমনও মনে করিয়াছিলেন যে, প্রভু নিজেই দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিবেন। কিন্তু সে আশায় নিরাশ হইলেন।

সেই সময় বনমালী সাহা ও বাকচর নিবাসী অন্যান্য ভক্তবৃন্দ করতাল বাজাইয়া প্রভাতী কীর্ত্তন করিতেছিলেন। মধুর কীর্ত্তন হইতেছিল। সকলেই তন্ময় ছিলেন। নায়েববাবুকে কেহ দেখিয়াও দেখিলেন না। ইহাতে তিনি অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া কাচারীতে ফিরিয়া গেলেন।

নায়েব মহাশয় সন্ধান লইয়া জানিলেন বাকচর অঙ্গন কাহার সত্ত্বাধিকারে আছে। অতঃপর খানসামা পাঠাইয়া অঙ্গনভূমির অধিকারী প্রহ্লাদ সাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন,—

"তোমার ঐ আঙ্গিনা-বাড়ীতে যে একটি সাধু আছে, আমি জানি সে ছোট লোকের সঙ্গে মিশিয়া থাকে। কিন্তু আমার সহিত দেখা করিতে চায় না। তোমরা সত্বর সেই সাধুকে আমার এলাকা হইতে তাড়াইয়া দেও।"

প্রহ্লাদ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলে ক্রুদ্ধ নায়েব বলিতে লাগিলেন, "কথা বলছ না কেন? আমার হুকুম যদি না শোন তাহা হইলে এই বেলার মধ্যে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা ও পঞ্চাশ জুতার বারি তোমার অদৃষ্টে ঘটিয়া যাইবে।"

কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া নায়েব আবার বলিলেন, "আর তা না হইলে সেই সাধুকে আমি দেখতে চাই। যদি দেখাতে পার, ভাল। যদি না পার, যাহা বলিয়াছি অবশ্যই করিব। বৈকালেই যাব পঞ্চাশ লাঠিয়াল লইয়া। সাধুর ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিব। আমি জমিদারের নায়েব। জমিদারীর মধ্যে কোন সাধু সন্ন্যাসী থাকিলে তাহা তদন্ত করা আমার কর্ত্তব্য।"

আসুরিকভাবে দেখা পাওয়া অসম্ভব

কামমাশ্রিত্য দুষ্পুরং দম্ভমানমদান্বিতা।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্ গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতা॥

—শ্রীগীতা

নায়েবের শাসন বাক্য শুনিয়া মলিন মুখে প্রহ্লাদ প্রভুর নিকটে আসিলেন এবং সকল কথা নিবেদন করিলেন। কথা বলিবার সময় যাহারা উপস্থিত ছিল সকলের মুখ শুকাইয়া

এতটুকু হইয়া গেল। প্রভুবন্ধু হাসিমুখে সবাইকে অভয় দিয়া বলিলেন, "সে আমার কি করিবে? নায়েব খাজনা আদায় করিবে। আর কিছু করিবার অধিকার নাই। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।" প্রভুর বাক্যে ভক্তেরা নির্ভয় রহিলেন।

কাচারীর অন্য অংশের নায়েব মদনমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভু বন্ধুসুন্দরের অপূর্ব্ব ভাব-মাধুর্য্যের কথা কিছু জানিতেন। তিনি ঐ হঠকারী নায়েব চারু ঘোষকে ঐরূপ কার্য্য করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঘোষ মহাশয়কে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন "মহাশয়, ঐরূপ দুঃসাহস করিবেন না। সে সাধু যে সে লোক নয়। আমিও তার দর্শনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আসুরিক ভাবে তাঁহার দেখা পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে যদি ভক্তি বলে তাঁহার দর্শন লাভ ঘটিয়া যায় সে পরম ভাগ্যের কথা।"

মদনবাবু নায়েবের কথার পর চারু ঘোষ আর ঐরূপ পাশবিক শক্তিতে প্রভুর আঙ্গিনার দিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না।

"এ জন্মে ওর দর্শন হবে না"

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥
—শ্রীগীতা

অপর একদিন কি যেন এক নূতন ফন্দী আটিয়া নায়েব মহাশয় গায়ে নামাবলী জড়াইয়া নগ্ন পদে পাঁচ সাতজন লোক সঙ্গে প্রভুর ভোগের দ্রব্যাদি লইয়া অঙ্গনে আসিলেন। শ্রীঅঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদি রাখিয়া "প্রভুর দর্শন চাই" এই কথা বলিলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীমন্দিরের ভিতর হইতে গোপাল মিত্র মহাশয়ের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন—প্রভুর জ্বর হইয়াছে, কিছু খাবেন না।

নায়েব মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয় দিন খাবেন না?" মিত্র মহাশয়ের মাধ্যমে প্রভু জানাইলেন, "একমাস খাবেন না।"

নায়েব।—প্রভু খান না খান, এসব জিনিষ গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

মিত্র মহাশয় মাধ্যমে প্রভু জানাইলেন, "ওকে বল, ওসব আচার্য্য বাড়ী দিয়া আসে।"

দর্শন সম্বন্ধে নায়েব জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু মিত্র মহাশয় দ্বারা বলিলেন—"এ জন্মে ওর দর্শন হবে না।"

কথাটী কানে আসিতেই নায়েব অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। তাহার আনীত দ্রব্যাদি প্রভু না নেওয়ায় নিজেকে বিশেষ ভাবে অপমানিত মনে করিলেন। ক্রুদ্ধ, অপমানিত নায়েব গ্রামবাসী

প্রভুর ভক্তগণের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন।

অসহায় গ্রামবাসীরা নিরুপায় হইয়া নায়েবকে বহু অভিসম্পাত দিতে থাকে। তাহা শুনিয়া প্রভুবন্ধু কহিলেন, "তোমরা আর ওকে অভিসম্পাত দিয়ে বিপদগ্রস্ত করো না! ওর নিজের কৃতকর্ম্মের ফল দেখে আমি এখনই শিহরিয়া উঠি।"

ইহার অল্পদিন পরেই নায়েব তেলেহাটী পরগণায় অনেক দূরে বদলী হইয়া যায়। সেখানেও তাহার অত্যাচারে উৎপীড়নে সকলে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। একদিন গ্রামের মাতব্বরের সঙ্গে তাহার বচসা হয়। ফলে মাতব্বরের পুত্রগণ ও গ্রামবাসীরা নায়েবের উপর খড়্গ হস্ত হইয়া উঠে। একদিন তাহারা তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া কুঠারের দ্বারা নির্ম্মম ভাবে হত্যা করে।

পরবর্ত্তী জন্মে চারুঘোষ বাকচর গ্রামে এক ভক্তগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার নাম হইয়াছিল গোকুলানন্দ। প্রভুর কৃপায় অনেক অল্প বয়সেই সে প্রভুর আঙ্গিনায় গিয়া ব্রহ্মচারী বেশে বাস করে ও প্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করে। গোকুলানন্দ অনেক সময় প্রকাশ করিত, "পূর্ব্ব জন্মে আমি চারু নায়েব ছিলাম।" এই কথা বলিয়া সে নিজের বক্ষদেশে একটী দাগ দেখাইত। আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার বক্ষে ঠিক কুঠারের আঘাতের অনুরূপ একটি চিহ্ন ছিল।

———

"বঙ্কারে, ঘুড়ি উড়ায়ে দি'ছি"

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ।

—শ্রীগীতা

চারু ঘোষের শাসন গর্জ্জনের সময় একদিন প্রভুবন্ধু বাকচরস্থ ভক্তবৃন্দকে ডাকিয়া বলিলেন "আমি এখানে থাকিলে তোমাদের অনেক কষ্টে পড়িতে হইবে। অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। আমি কিছু দিনের জন্য অন্যত্র যাইতেছি। তোমরা কীর্ত্তন ভুলিও না। কোন কারণেই কীর্ত্তন ছাড়িও না। সদা নিষ্ঠায় থাকিও। নিষ্ঠায় থাকিলে কেহ কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

এই বলিয়া প্রভু বাকচর ছাড়িয়া একাকী চলিলেন। কাহাকেও সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিলেন। কুমার বঙ্কবিহারীর আগ্রহাতিশয্যে তাহাকে সঙ্গে লইলেন। ঐ দিন পথে পথে প্রভু বন্ধুহরি বঙ্কুকে অনেক তত্ত্বকথা উপদেশ দিয়াছিলেন। তার মধ্যে যে কয়টি কথা তার স্মরণে আছে, তাহা লিখিত হইতেছে।—

"বঙ্কারে, ঘুড়ি উড়ায়ে দি'ছি, সুতো আমার হাতের মুঠে। যে যেদিক দিয়ে যাক না কেন, আমার কাছে আসতে হবে। আমি সেই পদ্মপলাশলোচন হরি। ভবভয়হারী। এবার সকলকেই উদ্ধার করবো। তোর কোন চিন্তা নাই। নির্ভয়ে থাকিস্। হরিনাম ভুলিস না। আর কিছু পারিস না পারিস নাম ছাড়িস না। শূয়োর খেলে এলেও—নাম করলে আমি নিস্তার করবো।"

———

হররায়ের কঠোরতা

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥

—শ্রীগীতা

কলিকাতা চাষাধোপাপাড়ার হররায় কয়েকদিন যাবত বাকচর আসিয়াছেন। নবদ্বীপ দাস প্রভুর সেবায় আছেন। হররায় নবদ্বীপ দাসের সঙ্গে প্রভুর সেবা-ভাগ্য বরণ করিয়াছেন। সেবাকার্য্যের প্রয়োজনে উভয়ে বাকচরবাসী ভক্তের গৃহে যাতায়াত করিতেন। সরল প্রাণ বাকচরবাসীর গৃহে গৃহে উহারা পরম সমাদর পাইতেন ও অনেক সময় নানা প্রকার সুস্বাদু দ্রব্যাদি আহার করিতেন।

একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু হররায় ও নবদ্বীপ দাসকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা আজ হইতে বাকচরবাসীর গৃহস্থের হাতের কিছুই খাইতে পারিবে না। দিনান্তে একবার আহার করিবে। আউসের চাউল ও খেসারীর ডাল ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করিবে না।" গ্রামবাসী ভক্তগণের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও বলিলেন, "সবাইকে নিষেধ করিয়া দিস্ নবদ্বীপ ও হরকে যেন কিছু খাইতে না দেয়।"

প্রভুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। মাসাধিক কাল এইরূপ ভাবে চলিতেছে। হররায় হাসি মুখে প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে। একদিন বাকচরবাসী ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন প্রয়োজনে সমবেত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রভু গোপাল মিত্র মহাশয়কে বলিলেন, "জেঠা, তুমি

হরকে জিজ্ঞাসা কর তার জীবনে অপব্যয়ে কত টাকা নষ্ট করিয়াছে।"

মিত্র মহাশয়ের জিজ্ঞাসায় হররায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আমার ঠিক নাই।" প্রভু মিত্র মহাশয়কে বলিলেন, "অনুমানে বলিতে বল।" আদেশ লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই দেখিয়া হররায় করজোড়ে কহিলেন, প্রভো, আমি যে একবৎসর পঞ্চাশ হাজার টাকা অপব্যয় করিয়াছি তাহা বেশ স্মরণ আছে। "কথা শুনিয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া উঠিলেন এবং মধুর হাসিয়া কহিলেন, "জেঠা, শুনিলে ত? এক বৎসরে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা অপব্যয় করিতে পারে তাহার একজীবনে কত টাকা ব্যয় হইতে পারে? এমন লোক তাকে আমি এক মুঠো আউসের চাউল ও খেসারীর ডাল খেতে বলিয়াছি তাই এক সন্ধ্যা খেয়ে কাটায়।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কতিপয় ভক্তকে লক্ষ্য করতঃ মিত্র মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বেদনার সুরে কহিলেন, "আর এরা সব আমার নিকট কথা বলে আবার কুক্রিয়ায় রত হয়। এদের ঘরে কত টাকা আছে রে?" এই কথা বলিয়া প্রভু নির্ব্বাক হইলেন এবং গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। ভক্তগণ আপন আপন দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ প্রভুর শ্রীচরণে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অতঃপর প্রভু কীর্ত্তনের আদেশ করিলেন। সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গভীর রাত্র পর্য্যন্ত তুমুল কীর্ত্তন চলিল।

অনাবৃষ্টিতে কীর্ত্তন ও বর্ষণ

সর্ব্ববিধ বাঞ্ছাপূর্ত্তি নাম হৈতে হয়।

বর্ষাঋতু কাটিয়া গিয়াছে। বৃষ্টি হয় নাই বলিলেই চলে। ভাদ্র শেষ হইয়া আসে। এক ফোটা জল নাই। প্রখর রৌদ্রে মাঠ ঘাট খাঁ-খাঁ করিতেছে। বৃক্ষলতা ফুল ফল শস্যাদি অগ্নি-দগ্ধের মত লাল হইয়া গিয়াছে। কোথাও আর সবুজের চিহ্ন নাই, নির্ম্মম শুষ্কতার আঘাতে সারাটা দেশ যেন কাঁদিতেছে।

একদিন গ্রামবাসী নরনারী ও কৃষকগণ প্রভুর আঙ্গিনায় আসিয়া কাতর ভাবে কহিলেন, "প্রভো, বৃষ্টি না হইলে মরিয়া যাইব, রক্ষা করুন। শ্রীশ্রীপ্রভু তৎক্ষণাৎ শ্রীকরে লিখনী লইয়া একখানি কাগজের পৃষ্ঠে বড় বড় অক্ষরে লিখিলেন,—

গদাধর কাদম্বিনী অদ্বৈত অম্বরে।
চৈতন্য চাতক পি পি পিয়াসে সম্বরে॥
(প্রভু পি পি করে রে)
বহমানা বরষিতা, শ্রীবাস-মরুতে।
(মরু জাগিল রে)
ভরমে ভরিল ভৈমী ভারতী মরুতে॥
(ভিমা ভরিল মা)
নিতাই ক্ষণদা ঘন চমকে চতুর।
(কত সুন্দর বা)
অমা ঘোরে তরাসিত বন্ধু বিধুর॥
(পাপে পলাইত রে)

———

লিখিত কাগজখানি সুধন্য মিত্র মহাশয়ের হাতে দিয়া প্রভু বলিলেন, "বৃন্দাবন, সকলকে ডাকিয়া আনিয়া এই গান খানি গাওয়াইবার ব্যবস্থা কর। নিতাইচাঁদের কৃপা হইলে ইহাতে বৃষ্টি হইবে।"

বৃন্দাবন দাসের উদ্যোগে অল্প সময়ের মধ্যে বাকচরবাসী সকল ভক্তগণ সমবেত হইলেন। তুমুল ভাবে কীর্ত্তন হইল। কীর্ত্তন খানি দুইফির গাওয়া হইতে না হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। যখন তৃতীয় বার গাওয়া হইতেছে তখন ঝম্ ঝম্ করিয়া মুসলধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। ঘণ্টা খানিক বর্ষণে চারিদিক জলময় হইয়া গেল।

বৃষ্টির আনন্দে চারিদিক হইতে বালক-বৃদ্ধ পুরুষ-নারী কৃষক-চাষী প্রভুর আঙ্গিনায় ছুটিয়া আসিল। আঙ্গিনা লোকে লোকারণ্য হইল। শ্রীশ্রীপ্রভু বৃন্দাবন দাসকে কহিলেন, "যারা এসেছে সবাইকে দুটো পেট ভরে খেতে প্রসাদ দিস্।" ভক্তবর বৃন্দাবন দাস ক্ষণেকের জন্য চিন্তান্বিত হইলেন, কোথায় চাল ডাল কাঠ খড়ি, পাতা, কোথায় রান্না হইবে, কে রাঁধিবে, চিন্তা করিতে করিতে ভক্তবর বাহিরে আসিয়া দুই পাঁচ জন বিশিষ্ট ভক্তের সঙ্গে একথা আলাপ করিতে লাগিলেন।

এই সময় এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। কোথা হইতে চাল-ডাল কাঠ-খড়ি-পাতা আসিতে লাগিল। বৃন্দাবন দাস নিজেই রান্নায় গেলেন। কে যে ডেক কড়াই আনিল, কাহারা তরকারী বানাইল, কেহই যেন কিছু বুঝিতে পারিলেন না। একটা ভৌতিক কাণ্ডের মত বিরাট মহোৎসব হইয়া গেল। বৃন্দাবন দাস

যন্ত্র চালিতের মত সহস্র লোকের জন্য রান্না করিলেন। কিভাবে যে পরিবেশন কার্য্য সমাধা হইল, কেহই যেন কিছু বুঝিতে পারিলেন না। ইহার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা তাহারা সেদিনকার অলৌকিক বর্ষণ ও অলৌকিক মহোৎসবের কথা কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

ইহার অব্যবহিত পরেই শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ তিনমাস ব্রজে বাস করেন।

একটি বালিসের খোল মাত্র

মাঘের প্রথমভাগে শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে বাংলায় ফিরিয়া আসেন। আসিয়াই বাকচর যান। বাকচর গিয়া শুনিতে পান গোপাল মিত্র ভীষণভাবে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। প্রভু শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। নবদ্বীপ দাসকে বলিলেন, "তুই দুয়ারে বসিয়া থাক। যত ভক্ত আমার কাছে আসিবে সবাইকে বলবি আগে গোপাল মিত্রকে দেখিয়া আসেন। সকল ভক্তের দর্শন ও আশীর্ব্বাদ পাইলে জেঠার অসুখ যাইবে।"

প্রথমে বাদল বিশ্বাস আসিলেন। নবদ্বীপের কথা শুনিয়া তিনি মিত্র মহাশয়কে দেখিতে গেলেন। বিশ্বাস মহাশয় মিত্র মহাশয়কে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "প্রভু আসিয়াছেন, আর ভয় নাই।" প্রভুর আগমন সংবাদে মিত্র মহাশয় বুকে নব বল পাইলেন।

বিশ্বাস মহাশয় আসিয়া প্রভুকে বলিলেন যে, মিত্র মহাশয়ের অবস্থা ভাল নয়। প্রভু তৎক্ষণাৎ বাদলকে ফরিদপুর শ্রীধর ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। বাদল ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেলেন। ডাক্তার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া প্রভু শশী কবিরাজকে ডাকিলেন। কবিরাজের ঔষধেই মিত্র মহাশয় অনেক সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

শ্রীধর ডাক্তার আসিয়া রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন. রোগীর ভয় কাটিয়া গিয়াছে। মিত্র মহাশয়কে দেখিয়া ডাক্তার বাবু অঙ্গনে আসিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু ডাক্তার বাবুর ভিজিট আট টাকা ও পাল্কীভাড়া পাঁচ টাকা এই তের টাকা নবদ্বীপ দাসকে দিয়া দিতে বলিলেন। নবদ্বীপ টাকা দিতে গেলে শ্রীধর বাবু বলিলেন, "গোপাল মিত্র ডাকিলে ভিজিট নিতাম। প্রভু যখন ডাকিয়াছেন তখন ভিজিট কিছুতেই লইব না। অগত্যা পাল্কীভাড়া পাঁচ টাকা লইয়া বিদায় হইলেন।

কবিরাজী চিকিৎসায় মিত্র মহাশয় সুস্থ হইলে একদিন কবিরাজ শশীভূষণ অঙ্গনে আসিলেন। প্রভু নবদ্বীপ দাসকে বলিলেন, কবিরাজকে জিজ্ঞাসা কর গোপালের চিকিৎসায় কত টাকার ঔষধ লাগিয়াছে। কবিরাজ বলিলেন "ঠিক বলিতে পারি না" প্রভু বলিলেন, "অনুমান করিতে বল।" কবিরাজ বলিলেন, "একটাকার ঔষধ কিনিয়া কতগুলি বটি করি, প্রত্যেক বটির কত দাম পড়ে, তাকি লিখিয়া রাখি ?"

প্রভু বলিলেন "যে চিরদিন নালতা পাতার জল খায় তার উপর কি কোন ঔষধের ব্যবস্থা করা যায় ?" কবিরাজ মহাশয়

বলিলেন "প্রভু আমায় পরীক্ষা করিতেছেন। যে চিরদিন নালতা পাতার জল খায় তাহাকে গোক্ষুর সাপের বিষ দিলেও কিছুই হইতে পারে না।"

অন্যান্য অনেক কথার পর কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "প্রভু, মিত্র মহাশয়ের চিকিৎসায় আমি টাকা চাই না—আপনি যদি দয়া করিয়া একবার দর্শন দেন তাহা হইলেই কৃতার্থ হই।" প্রভু নবদ্বীপ দাসকে বলিলেন "উহাকে বিকাল বেলা আসিতে বল।" নবদ্বীপ তাহাই বলিল। বৈকালে কবিরাজ মহাশয় দর্শনের জন্য আসিলেন। প্রভু তখন সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া মন্দিরের পিছনে একটি কাঁঠাল গাছের গোড়ায় পদ্মাসন করিয়া বসিয়া রহিলেন। নবদ্বীপ দাসকে বলিলেন "উহাকে মালা ও গোপীচন্দনের তিলক দিয়া এস আর এদিকে আসিয়া দর্শন করিতে বল। নবদ্বীপ মালা তিলক দিয়া বলিলেন, "প্রভু ঐদিকে আছেন গিয়া দর্শন করুন।"

কবিরাজ মহাশয় মালা তিলক গ্রহণান্তর মন্দিরের পিছনে গিয়া সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত প্রভুকে দর্শন করিলেন। প্রণাম করিয়া অঙ্গনে আসিলেন। প্রভু মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কতিপয় ভক্ত কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভুর দর্শন পেয়েছেন ?" তদুত্তরে সুরসিক কবিরাজ বলিলেন "কি জানি প্রভু ট্রভু বুঝি না, একটি বালিসের খোলমাত্র দেখিলাম !"

কবিরাজ মহাশয় প্রভুকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এত ভাল বাসিতেন যে প্রভুর সম্মুখে রহস্যপূর্ণ ক্রীড়া কৌতুক করিতেও সঙ্কোচ করিতেন না। কবিরাজ মহাশয়ের "বালিশের খোল" এর কথা শুনিয়া সকল ভক্ত হাসিতে লাগিলেন।

"শেয়ালের সঙ্গে শেয়ালের পীরিত"

শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু গোপাল মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে আছেন। মণীন্দ্র কবিরাজ নামক জনৈক ব্যক্তি শ্রীশ্রীপ্রভুকে দর্শন করিবার ইচ্ছা করিয়া আসিলেন। মিত্র মহাশয়ের নিকট ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন।

গৃহমধ্য হইতে কথা শুনিয়াই প্রভু একখানা কম্বলদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িলেন। প্রভু শুইয়া আছেন মিত্র মহাশয়ের কাছে এই কথা শুনিয়া কবিরাজ বসিয়া রহিলেন। একটু সময় পরেই শশীভূষণ বসু মহাশয় আসিয়া, কোন প্রয়োজনে কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিলেন। কবিরাজ মহাশয় উঠিয়া তাহার সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

উহারা চলিয়া যাইবামাত্রই শ্রীশ্রীপ্রভু উঠিয়া বসিলেন। বসিয়া মিত্র মহাশয়কে বলিলেন "দেখলি তো, ওকি আমায় দর্শন করতে এসেছিল? এই ত আমি উঠলাম। শেয়ালের সঙ্গে শেয়ালের পীরিত। এক শেয়াল এল, অমনি আর এক শেয়াল চলে গেল।

"গা পুড়ে গেল"

মাঘ মাস, বেশ শীত পড়িয়াছে। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর আছেন বদরপুর বাদল বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ী। কি জানি কেন আজ বাদলের গৃহে থাকিবেন না। স্বতন্ত্র ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়াছেন পাণের বরজের মধ্যে থাকিবেন। একে প্রবল শীতে বরজে বাস,

তাতে আবার শয্যা নিবেন না, পাকাটির (বাঁশের চটার বেড়া) উপর শয়ন করিবেন। কি কঠোরতা!

যাহা করিবেন, অন্যথা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। বাকচরের প্রিয়ভক্ত বঙ্কুসাহা আসিয়াছেন। বন্ধুসুন্দর তাহাকে বলিলেন, "বঙ্কু, তুই আমায় সাবধানে চৌকী দে।" বন্ধুর কথার ভাবে বঙ্কুর মনে হইল যেন, প্রভু কোন বিপদ আশঙ্কা করিতেছেন। আবার ভাবিলেন, প্রভু স্বয়ং, তাঁর আবার বিপদ কী হবে!

বঙ্কু জানে না, যিনি জগতের সঙ্গে আপনাকে মিলাইয়া বিলাইয়া দিয়াছেন, জগতের প্রত্যেকের বিপদই তাঁর বিপদ। কে জানে আজ কোন্ ভক্তের কোন্ বিপদের আঘাত নিজ অঙ্গে লইবেন! বঙ্কুকে পাহারা দিতে বলিয়াই প্রভুবন্ধু ঘুমাইয়া পড়িলেন। বঙ্কু বসিয়া রহিল।

খুব পাতলা কাপড়ে নিজ মুখখানি ঢাকিয়া প্রভু শয়ন করিয়া আছেন। বাতাস ধীরে বহিতেছিল। ক্রমে জোরে বহিল। বুঝি বা পবনদেবেরও বদনপদ্ম স্পর্শের সাধ। বায়ুর বেগাতিশয্যে শ্রীমুখমণ্ডল হইতে বস্ত্রের আচ্ছাদনটি সরিয়া গেল। ভক্তবর বঙ্কুর দৃষ্টি ঐ উন্মুক্ত ললাট দেশে পতিত হইল।

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে বঙ্কু দেখিল ললাট দেশ হইতে একটি দিব্য জ্যোতিঃ উদ্গীর্ণ হইতেছে। তাহার ছটায় চারিদিক আলোকিত হইতেছে। তাহার স্নিগ্ধতায় নয়ন মনপ্রাণ সুশীতল হইতেছে। শরীর এত শান্তস্নিগ্ধ হইয়া গেল যে, ক্রমে বঙ্কুর নিদ্রাবেশ হইল। মাদক সেবনে মানুষ যেমন ঘুমায়, বঙ্কু তেমন ভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে পাণের বরজের মধ্য হইতে বন্ধুর হাততালির শব্দ আসিতে লাগিল। বাদল অনতিদূরেই শয়ন করিয়াছেন। ঘুমাইয়াও কান রাখিয়াছেন বরজের দিকে। হাততালি শুনিয়াই বুঝিলেন প্রভু ডাকিতেছেন। ঘন ঘন শব্দে বুঝিলেন খুব ব্যস্ত হইয়া ডাকিতেছেন। বাদল ছুটিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি হতবাক্ হইয়া গেলেন।

প্রভু ছট্‌ফট্‌ করিয়া গড়াগড়ি করিতেছেন। বলিতেছেন, "ওরে, শীগ্‌গীর বঙ্কুকে ডাক, আমায় সাপে কামড়িয়েছে।" বিশ্বাস মহাশয় উদ্বিগ্ন হইয়া বঙ্কুকে ডাকিয়া উঠাইলেন। বঙ্কু চমকিয়া উঠিয়া বসিল। স্বীয় অসাবধানতার জন্য ঐরূপ ঘটিয়াছে মনে করিয়া হায় হায় করিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল। সকলে ছুটিয়া আসিল। সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। বন্ধুর ক্ষত স্থান হইতে রক্ত ঝরিতেছে!

বন্ধুসুন্দর পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, "ওরে, আমার সমস্ত গা পুড়ে গেল!" কাহাদের জ্বালাপোড়া অঙ্গে টানিয়া এমন মর্ম্মান্তিক ছট্‌ফটানি তাহা কে অনুধাবন করিবে? কেবল বলিতে লাগিলেন।—"জ্ব'লে গেল জ্ব'লে গেল।" বঙ্কুকে নিতান্ত অপ্রতিভ দেখে বন্ধুহরি কহিলেন—"চল, নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে স্নান করে আসি।"

বঙ্কু অনুসরণ করিল। একটি সরসীতে অবগাহন করিয়া বন্ধুসুন্দর অনেকক্ষণ জলমগ্ন থাকিয়া স্নান করিলেন। স্নান সারিয়া উঠিয়া বলিলেন, "শরীর ঠাণ্ডা হল।" বঙ্কুকে বলিলেন, "আমাকে সম্পত্তি মনে করে পাহারা দিতে হয়।" সাশ্রুনেত্রে বঙ্কু

বলিল—"প্রভু, কৃপা করুন আপনাকে পরম সম্পদ জানিয়া যেন যত্ন করিতে পারি।"

বাদল বহু অনুসন্ধান করিয়াও সাপ দেখিতে পাইলেন না। পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—"এই সাপ কোথা হইতে বা আসিল, কোথায় বা গেল কিছুই বোঝা গেল না।" সকলের বলাবলি শুনিয়া মৃদুকণ্ঠে বন্ধু কহিলেন—"কলি এসেছিল কাল হয়ে।"

ক্ষুদিরামের দর্শন

ফাল্গুন মাস। শীত কাটিয়া গিয়া বাসন্তী হাওয়া বহিতেছে। বাদলের গৃহ-প্রাঙ্গনে মহোৎসব। রামবাগান হইতে এক দল বাধিয়া ডোমভক্তগণ আসিয়াছেন। তাহাদের মধুর কীর্ত্তন নর্ত্তনে বদরপুর পল্লীখানি যেন নাচিতেছে। ঘন ঘন নারীকণ্ঠে উলুধ্বনি ও ভক্তকণ্ঠে হরিধ্বনি উঠিতেছে। বাদল ভবন যেন শ্রীবাসঅঙ্গন।

গান করিতেছেন বন্ধুর আদরের শারিকা রামদাস। মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন ডোক্তভক্ত হরিদাস। সকলের চোখেই জল-ধারা।

বন্ধুর প্রাণস্পর্শী পদ গীত হইতেছে—

ঐ শ্যাম রায়
ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়ায়ে কদম্বতলায় রে।
কটিতে কিঙ্কিণী সাজে, চরণে নূপুর বাজে রে,
রাশি রাশি রাকা শশী নখে শোভা পায় রে।

কীর্ত্তনের মাধুর্য্যে শ্যামরায়ের রূপরাশি মূর্ত্তিমতী হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। শ্রোতৃমণ্ডলী মাঝে মাঝে অহো অহো বলিয়া

উঠিতেছে শ্রোতৃবৃন্দের এক কোণে বসিয়াছিলেন বাকচরের ভক্ত ক্ষুদিরাম সাহা। কীর্ত্তনের পদের প্রত্যেকটি অক্ষর তাহার হৃদয়ে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে তিনি ভাব বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কেহ তাহার দিকে দৃষ্টি করিল না। কাহারও দৃষ্টি দিবার অবকাশও ছিল না।

কি জানি কেমনে যন্ত্রচালিতের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষুদিরাম প্রভু বন্ধুসুন্দরের থাকিবার ঘরের বারান্দায় গিয়া উঠিয়াছেন। ঘরের দরজা খুলিয়া রাখিয়া প্রভুবন্ধু'ও প্রিয় জনের কণ্ঠে নিজগান আস্বাদন করিতেছেন। দরজা খোলা পাইয়া ক্ষুদিরাম প্রভুর গৃহ মধ্যে প্রবেশোন্মুখ হইলেন।

হঠাৎ জ্যোতির ছটায় নয়ন ঝলসিয়া উঠিল। নয়ন খুলিয়া ক্ষুদিরাম দেখিলেন, গৃহে প্রভু নাই, এক অপরূপ মাধুরীমণ্ডিত শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের যুগল মূর্ত্তি! কীর্ত্তনের পদে যাহা শুনিতেছিলেন ঠিক তাহাই দেখিলেন। দর্শন করিয়াই ক্ষুদিরামের মনে হইল নিজের পদ আস্বাদন করিতে করিতে বন্ধুসুন্দরই শ্যামসুন্দর হইয়া গিয়াছেন।

ক্ষুদিরাম ধূলায় লুটাইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ রহিলেন কে জানে! কতক্ষণে আপনি সংজ্ঞা লাভ করতঃ উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় প্রভুর গৃহ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে ক্ষুদিরামের যেন মনে হইল—তখনও যুগলরূপ ছিল তাহা যেন ধীরে ধীরে বন্ধুর অঙ্গে বিলীন হইয়া গেল। কীর্ত্তন তখনও চলিতেছে।

ক্ষুদিরাম বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কত কি ভাবিতে লাগিলেন—। বন্ধুসুন্দর মধুর কণ্ঠে কহিলেন—"যারে ক্ষু'দে যা

কি ভাবছিস্। মহোৎসবের চুলো কর গে, পাতা কাট গে।" প্রভুর আদেশ শুনিয়া ক্ষুদিরাম কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধ ঘুমন্তের মত কিছু কিছু কার্য্য করিলেন।

সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর নিকটস্থ রাস্তার খাদে স্নানে চলিয়াছেন। ক্ষুদিরাম প্রভুর পাদুকা ও পরিধেয় বস্ত্র লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বন্ধুহরি খাদের জলে নামিয়া স্নান করিতেছেন। গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতেছেন—"বরণ চিকণ কালা, গলে দোলে বনমালা রে," ভ্রমর গুঞ্জনের মত সে মধুর ধ্বনি ক্ষুদিরামকে নব মাধুর্য্যে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল।

প্রভু স্নান করিয়া শ্রীহস্ত পাতিয়া বস্ত্র চাহিলেন। পদ্মহস্তে বস্ত্র দিতে দিতে ক্ষুদিরাম বলিলেন "প্রভু, আজ সকাল বেলা আপনার মধ্যে যুগল মূর্ত্তি দর্শন করেছি।" মৃদু হাসিয়া প্রভু কহিলেন "সে সময় আর কে ছিল রে? ক্ষুদিরাম উত্তর করিলেন, "আর কেহ বোধ হয় ছিল না, প্রভু।"

সর্ব্বাঙ্গে শুভ্র বস্ত্র জড়াইতে জড়াইতে মুখচন্দ্র হইতে লাবণ্য-চন্দ্রিকা ছড়াইয়া বন্ধুহরি কহিলেন—"তোমার মন সরল হয় না আমাকে বিশ্বাস কর না, পাছে আমাকে আর না ভুল, তাই তোমাকে ঐ রূপে দর্শন দিলাম।"

———

"একটি চিহ্নধারী পুরুষ মাত্র"

চৈত্র মাস। খুব গরম পড়িয়াছে। রাত্র দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। মানুষ জাগিয়া নাই। মাঝে মাঝে নিশাচর প্রাণীর ডাক শোনা যায়। শ্রীঅঙ্গ হইতে ফুলের সুবাস ছড়াইয়া প্রাণারাম বন্ধুসুন্দর ফরিদপুর হইতে রাজবাড়ী যাইবার রাস্তায় বেড়াইতেছেন। সঙ্গে ছায়ার মত গোপাল মিত্র।

খঞ্জন গতিতে চলিতে চলিতে হঠাৎ কি ভাবিয়া রাস্তার এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। কোমল ঘাসের উপর অঙ্গখানি এলাইয়া দিলেন। উর্দ্ধে আকাশ পানে চাহিলেন। ঢল ঢল আঁখি দুটি হইতে যেন অমৃতের উৎস উছলিয়া উঠিতে লাগিল। হিঙ্গুল-রাঙ্গা একখানি হস্ততল আকাশের দিকে দেখাইয়া কাহাকে যেন কি ইঙ্গিত করিলেন।

পার্শ্বে মিত্র মহাশয়। তাঁহার নাসিকা অঙ্গগন্ধে অন্ধ। নয়ন রূপদর্শনে বিভোর। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—আকাশ বাতাস ধরণীর সঙ্গে বন্ধুসুন্দর মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছেন। সেই মধুরিমা রাশি পান করিতে করিতে মিত্র মহাশয় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু আপনি কে ?"

কোন্ সুদূরে যেন লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া আনমনে বন্ধুসুন্দর বলিলেন, "আমি কেহ নহি, একটি চিহ্নধারী পুরুষ মাত্র।"

আকাশে ফাঁকা ফাঁকা মেঘের খেলা চলিতেছিল। হঠাৎ মেঘের আড়াল হইতে চাঁদ বাহির হইয়া এক রাশি চন্দ্রিকা বন্ধুর মুখচন্দ্রের দিকে যেন নিক্ষেপ করিল। পরম উদ্ভাসিত বদনে

বন্ধুসুন্দর আবার বলিতে লাগিলেন—"দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্রের যেসব লক্ষণ ছিল সে সব আমাতে আছে। ব্রজেন্দ্রনন্দনের যে সব লক্ষণ ছিল তাহাও আমাতে আছে। অমুকের যে সব লক্ষণ ছিল তাহাও আমাতে আছে।"

গোপাল মিত্র চকোরের মত মুখসুধা ও বচনসুধা দুই-ই পান করিতেছিলেন। মিত্র মহাশয় স্পষ্ট দেখিলেন, "অমুক" কথাটি বলিবার সময় বন্ধুসুন্দরের সর্ব্বাঙ্গে যেন রাধাভাব মধুরিমা চুয়াইয়া পড়িতেছিল। শ্রীবদনের লাবণ্য-প্রবাহে দশদিক যেন রাধাভাবময় হইয়া উঠিয়াছিল। গোপাঙ্গনার ভাবে নিজে ভাবিত হইয়া গোপাল প্রত্যক্ষ দেখিলেন সাক্ষাৎ ভানুনন্দিনী যেন গোবর্দ্ধনতটে কান্ত-বিরহে কাতর হইয়া ঢলিয়া পড়িয়াছেন।

আবার কতক্ষণ নীরবতা রাজত্ব করিল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধুকণ্ঠে মধুময় বন্ধুসুন্দর মিত্রমহাশয়ের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, "তোরা কি চিনতে পারিস! আমার রাজটীকা আছে, ঊনিশটি লক্ষণ আছে।"

ভক্ত ভগবানের এই মিলন দৃশ্য, রসালাপ-সন্দেশ বুকে আঁকিয়া রাখিয়া নিশিথিনী অরুণের ডাকে প্রভাতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

———

"তোর আর ভয় নাই"

কৃষ্ণসেবাই জীবের পরম ধর্ম্ম। কৃষ্ণদাস আমি, এই অভিমানে যে নিবিড় আনন্দের আস্বাদন, ব্রহ্মানন্দও তাহার তুলনায় তুচ্ছ। আচার্য্যেরা সেবককে উত্তম মধ্যম অধম তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন। প্রভুর অন্তর জানিয়া না বলিতেই যিনি সেবা করেন তিনি উত্তম। বলিবার পরে যিনি করেন তিনি মধ্যম। বলিলেও যিনি করেন না তিনি অধম।

গোপীকৃষ্ণ দাস প্রভুবন্ধুর উত্তম সেবক মধ্যে গণ্য ছিলেন। গোপীকৃষ্ণের পূর্ব্ব নাম মোহিনীমোহন ভাদুড়ী। পরম স্নেহে প্রভু ডাকিতেন গোপীকৃষ্ণ। গোপীকৃষ্ণ মহাবীর হনুমানের মত প্রভুর আজ্ঞা পালনে ব্রতী ছিলেন। প্রভুও তাহাকে কঠোর কঠোর আদেশ করিয়া সেবামাধুর্য্য আস্বাদন করিতেন ও অপরকে ভক্তের আদর্শ দেখাইতেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস। প্রত্যহই সন্ধ্যায় কাল-বৈশাখীর ঘনঘটা ও ঝঞ্ঝাবাত হয়। প্রভু বন্ধুসুন্দর আছেন বাকচর অঙ্গনে। অমাবস্যার ঘোরা রজনী। ঝমঝম বৃষ্টি পড়িতেছে। ঘনঘন করকাপাত হইতেছে। বাতাসের শনশন শব্দ কানে তালা লাগাইতেছে। মনে হইতেছে যেন ভীমবেগে মহাপ্রলয় আসিতেছে।

অঙ্গনে বন্ধুসুন্দরের গৃহে একটি ক্ষুদ্র দীপ বাতাসে কাঁপিতেছে। হাতে লেখনী লইয়া একটি বড় কাগজে কম্পমান দীপালোকে বন্ধুসুন্দর লিখিলেন,—

"দুঃখীরাম ! প্রলয় কাল। রক্ষা হরিনাম। হরিদাসের দল লইয়া আগামী সকালে ফরিদপুরের পথে ঘাটে সর্ব্বত্র নগর-কীর্ত্তন করাইবে।
—বন্ধু

লেখা শেষ করিয়া প্রভু "গোপীকৃষ্ণ গোপীকৃষ্ণ" বলিয়া দুইটি ডাক দিলেন। পার্শ্বের গৃহে গোপীকৃষ্ণ কোন প্রকারে কাপড় জড়াইয়া বেড়া হেলান দিয়া অন্ধকারে বসিয়া আছেন। ভীষণ ঝড়ের শব্দের মধ্যেও ভক্তবর বন্ধুসুন্দরের ডাক শুনিলেন। যারা উত্তম সেবক তাহাদের কর্ণ প্রভুর ডাক শোনার জন্যই খাড়া হইয়া থাকে। কোন শব্দই সেই আহ্বানকে প্রতিহত করিতে পারে না।

গোপীকৃষ্ণ বন্ধুসুন্দরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু আদেশ করিলেন—"গোপীকৃষ্ণ, এই চিঠিটা জরুরী, ইহা লইয়া এখনি ফরিদপুর বাজারে যাবে। দুঃখীকে দিয়া রাত্র থাকতেই ফিরে আসবে।"

ভীষণ দুর্য্যোগের রাত্রে এহেন কঠোর আজ্ঞা। দুঃখীরামের দোকান বাকচর অঙ্গন হইতে ছয় মাইল দূরে। যাতায়াতে বার মাইল পথ। ভক্ত একবার মাত্র জীব-স্বভাবে ভাবিলেন, "এই অন্ধকারে, একাই যাইতে হইবে!" যেন অন্তরের কথা শুনিয়াই প্রভুবন্ধু বলিলেন "হ্যাঁ একাই যাইতে হইবে।"

জয় জগদ্বন্ধু। হরেকৃষ্ণ হরিবোল। গোপীকৃষ্ণ পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। ঝড়বৃষ্টি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ভক্ত পথ চলিতে লাগিলেন। শিরে আজ্ঞা, মুখে নাম, বুকে ধ্যানের মূর্ত্তি। দেহে অদম্য শক্তি বিরুদ্ধ বাত্যার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিতেছেন। ধন্য ভক্ত।

ভক্তবৎসলের হৃদয় গলিল। করুণা শক্তির উদয় হইল। সুদীর্ঘ পথ সঙ্কুচিত করিয়া দিলেন। অতি অল্প সময়ে গোপীকৃষ্ণ দুঃখীরামের হস্তে পত্র দিয়া বাকচর অভিমুখে ফিরিলেন। পথে বদরপুরে বাদল গৃহে একটু বিশ্রাম করিয়া অনেকখানি জল পান করিয়া শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত করিলেন।

প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই গোপীকৃষ্ণ বাকচর পৌঁছিয়া একটু শয়ন করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাহার শরীরে ভয়ানকভাবে কলেরার লক্ষণ দেখা দিল। কয়েকবার ভেদবমন হইল। সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। প্রবল পিপাসায় জিহ্বা ও কণ্ঠ বিশুষ্ক হইয়া গেল। চক্ষু স্থির হইয়া আসিল। হস্তপদের অঙ্গুলি সকল যেন ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া যাইতে লাগিল।

সংবাদ পাইয়া প্রভুবন্ধু বলিলেন—"কাবেরীতে স্নান করিয়া আয়।" আদেশ পাইয়া ভক্ত অতিকষ্টে ভেদবমন করিতে করিতে কাবেরী নদীতে স্নান করিয়া আসিলেন। অমনি বন্ধুসুন্দর কহিলেন—"শবরীকলা, তেঁতুলগোলা, চিনি ও সৈন্ধব লবণ এক বাটী খাইয়া ফেল।" প্রভুর আদেশে ভক্ত নির্ব্বিচারে তাহাই করিলেন এবং কাত হইয়া শয্যায় পড়িয়া কাতর শব্দ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় মূর্ত্তিমন্ত দয়ার ঠাকুর প্রভু বন্ধুসুন্দর গোপীকৃষ্ণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্রীপাদপদ্মখানি তাহার বক্ষে স্থাপন করিয়া কহিলেন—"তোর আর ভয় নাই।"

অল্পক্ষণ পরেই ভক্তবর উঠিয়া বসিলেন। শরীর হইতে সমস্ত রোগের লক্ষণ মুহূর্ত্তে দূর হইয়া গেল। ভক্ত ভগবানের খেলা

দেখিয়া বাকচরবাসীরা কেহ অবাক হইল, কেহ মুখর হইল, কেহ সিক্ত নয়নে উর্দ্ধবাহু হইয়া নাচিল, কেহ হা প্রভু বলিয়া ধূলায় লুটাইল।

খোল করতালে প্রতিযোগিতা

"পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি"

—শ্রীকৃষ্ণদাস।

কয়েকদিন পর, একদিন প্রভাতকালে প্রভুবন্ধু বলিলেন—"শারিকা, কীর্ত্তন কর।" কোদাই সাহাকে বলিলেন, "কোদাই, বনমালী, নবকুমার, মহিম, জেঠা সবাইকে ডাকিয়া আন।" সবাই আসিলেন। রামদাস আজ্ঞা শিরে লইয়া করতাল হাতে লইলেন।

"প্রভু বলিলেন, 'রামী, আমি তেহাই (মান) না দেওয়া পর্য্যন্ত গান ছাড়বি না।" বাকচরবাসী সুগায়ক ভক্তগণ পিছনে দোহারী করিতে বসিলেন। মন্দিরের মধ্যে বসিয়া বন্ধুসুন্দর 'সীতানাথের' গায়ে মেঘগর্জ্জন তুলিলেন। দুয়ারে রামদাস করুণকণ্ঠে কীর্ত্তন ধরিলেন,—

খোল করতালে ভাই কর সংকীর্ত্তন।
গৌর নিত্যানন্দ বলে নাচ অনুক্ষণ॥
(জয় জয় গাও রে)

শ্রীরাধা গোবিন্দ জয় বল সর্ব্বজন।
(জয় জয় বল রে)
রাধাকৃষ্ণ নামরসে হও নিমগণ ॥
(নামে মত্ত হও রে)
অষ্টপাশ কারাবাস হবে রে মোচন।
(পরিণাম রবে গো)
বন্ধু বলে অবহেলে এড়াবি শমন ॥
(আর ভয় নাই রে)

ভক্তবর রামদাস প্রেমস্বরে গদ্‌গদ কণ্ঠে অশ্রুনীরে ভাসিয়া গানের প্রত্যেকটি পদ গাহিতেছেন। ভক্তগণ তন্ময় হইয়া সমভাবে বিহ্বল হইয়া দোহারী করিতেছেন। সংকীর্ত্তন-নাটুয়া স্বয়ং ভাবোন্মত্ত হইয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন।

বন্ধুর শ্রীহস্তে একখানি মৃদঙ্গ পাঁচখানি মৃদঙ্গের আওয়াজ আসিতেছে। এক একটি পদ এত দীর্ঘ সময় জমাট ও মাতান দিয়া বাজাইতেছেন যে, শুনিলে মনে হয় যেন মান দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। অথবা মান দিতে জানেন না। কিন্তু অনেকক্ষণ পর ঠিকস্থানে মান দিয়া দিতেছেন। পুনঃ আর একপদ ধরিয়া গানের জমাট চলিতে থাকে। মান দিবার নামটি নাই। ভক্তবীর রামদাসেরও ক্লান্তি নাই!

গান আর বাজনা শুনিলে এইরূপ অনুমান হয় যে, প্রভু যেন ভক্তকে পরীক্ষা করিবার জন্য মনে মনে ভাবিতেছেন—শারিকা ক্লান্ত হইয়া নাম না ছাড়িলে মান দিব না। শারিকাও মনে মনে ভাবিতেছে প্রভু ক্লান্ত হইয়া মৃদঙ্গে মান না দিলে আমিও

কীর্ত্তন ছাড়িব না। হারুয়া ঠাকুর চিরদিনই ভক্তের নিকট হার মানেন। আজও তেমনই হইল। রামদাসেরই জয় হইল। প্রভু মৃদঙ্গ বন্ধ করিলে কীর্ত্তন শেষ হইল।

কীর্ত্তনান্তে দেখা গেল প্রভুর উভয় শ্রীহস্তের চম্পক-কোরক-সদৃশ অঙ্গুলিগুলি ফাটিয়া ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে। দবদর ধারায় রক্ত পড়িয়া খোলের ডাইনা ও বাওয়া দুই-ই ভিজিয়া গিয়াছে। প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া রামদাস শিরে করাঘাত করিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, আমি যদি কীর্ত্তন ছাড়িয়া দিতাম তাহা হইলে এমন ভাবে প্রভুর শ্রীহস্ত ফাটিতে পারিত না। আমিই ত জিদ করিয়া বেদনার কারণ হইলাম। ভক্তের দুঃখ দেখিয়া প্রভু রামদাসের মস্তকে একটি অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া সান্ত্বনা দিলেন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পঞ্চবটী স্থাপন

একদিন বাকচর অঙ্গনে তুমুল কীর্ত্তনানন্দ হইয়াছে। ভক্তগণ প্রণাম করিয়া ধূলায় লুটাইতেছেন। কেহ কেহ পরস্পরের সহিত আলিঙ্গন বদ্ধ হইতেছেন। এমন সময় শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিয়া প্রভু বন্ধুসুন্দর বাহির হইলেন। সকলে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। তারা-ঘেরা চাঁদের মত বন্ধুসুন্দর সকলের দিকে কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন।—

"আগামী কল্য পাঁচটি গাছের চারা আনিয়া দিতে হইবে। অঙ্গনে পঞ্চবটী স্থাপন করিব। হরিতকী, আমলকী, নিম, বেল ও তমাল এই পাঁচটি চারা চাই—সকলের উপর আদেশ থাকিল।" প্রভুর আদেশে সকলের পরম আনন্দের উদয় হইল। কিন্তু তমালের চারা কোথায় পাওয়া যাবে তাহা লইয়া সকলেই ভাবিত হইলেন। ভক্তগণকে নিরুপায় দেখিয়া প্রভু বলিয়া দিলেন— "পরাণপুরের পথের পাশে তমালের চারা আছে, জন্মেজয় জানে।"

অনুসন্ধানে সকলই মিলিল। শ্রীমন্দিরের উত্তর পার্শ্বে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া প্রভু বলিলেন—"আগে কোদালে কোপাও, জল ঢালো, বেড়া দাও, পরে বৃক্ষ রোপণ হবে।" আদেশ পালিত হইল।

প্রভু বলিলেন, "তোরা সকলে অমুকের জয় দে, আমি গাছ লাগাইব।" ভক্তগণ উচ্চৈস্বরে "জয় রাধে শ্যাম রাধে" জয় দিতে লাগিলেন। প্রভু নিজ শ্রীহস্তে অতি যত্নে চারাগুলিকে রোপণ করিলেন। নবদ্বীপ দাসকে নিকটে পাইয়া প্রভু তাহাকে বলিলেন নবা, তুই প্রত্যহ অমুকের জয় দিতে দিতে পঞ্চবটীতে জল দিবি, শুকাইয়া মরিলে তুই দায়ী হবি।"

প্রভুবন্ধুর অমৃতময় হস্তের পরশে, ভক্তের দেওয়া জলে, জয় রাধে নামের বাতাসে পঞ্চবটী অল্পদিনের মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। প্রভু নিত্য পঞ্চবটী দর্শন করিয়া ছোট বালকের মত কতটুকু বাড়িল, কয়টা পাতা মেলিল তাহার হিসাব করিতেন। সেই পঞ্চবটী অদ্যাপি বাকচর অঙ্গনে শ্রীমন্দিরের পার্শ্বে বিরাজমান আছেন।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর পঞ্চবটীতলে অনেক সময় বসিয়া থাকিতেন। ধ্যান নেত্রে দর্শন করিয়া ভক্ত সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন।

পঞ্চবটী মূলে বসি পরাণ রমণ।
জগদ্বন্ধু জগন্নাথ সহাস্য বদন॥

অঙ্গনে পাঠশালা

নবদ্বীপ দাসের উপর অঙ্গনটি সংরক্ষণের ভার দিয়া ও নিত্য পঞ্চবটীতে জল দিবার আদেশ দিয়া প্রভুসুন্দর ভক্ত সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণকান্দা চলিলেন। নবদ্বীপ আদেশ শিরে লইয়া কর্ত্তব্য পালনে রহিলেন। প্রভুর বিরহ সহ্য করিয়াও ভক্তদের আদেশ পালন করিতে হয়। দাসের প্রধান কার্য্যই আজ্ঞাপালন।

বাকচরের কতিপয় বালক আসিয়া নবদ্বীপের কাছে পড়িতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ দুই তিনজন আসিল। ক্রমে পাঠশালা বসিয়া গেল। কুঞ্জ, মতি, শশধর, দেবেন, বেণী, রসিক প্রভৃতি বালকদল নিত্য সকালে পুথি বগলে আঙ্গিনায় আসিতে লাগিল। নবদ্বীপ যত্ন সহকারে পাঠশালা চালাইতে লাগিলেন।

পাঠ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন হইত। বালকগণকে লইয়া নবদ্বীপ পঞ্চবটী ও অন্যান্য পুষ্প বৃক্ষে ও তুলসী বৃক্ষে জল দিতেন, অঙ্গন ঝাড়ু দিতেন, গোবর আনিয়া আঙ্গিনার গৃহ ও প্রাঙ্গন লিপিতেন। এইরূপে বিদ্যা পরাবিদ্যা

তুই চর্চ্চা হইত, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শারীরিক পরিশ্রম হইত, সেবা বুদ্ধিতে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য হইত। ফলে পাঠশালা একটি আদর্শ স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

নবদ্বীপ দাস সেবাইতরূপে থাকিতেন। প্রভু একদিন একখানি কাগজে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"নবদ্বীপ, বাকচর আঙ্গিনা তোমাকে দিলাম।"

অনন্তের লীলা

বন্ধুসুন্দর ভক্তবৃন্দ সঙ্গে ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে আছেন। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনানন্দ হইয়া গিয়াছে। বন্ধুসুন্দর মন্দিরে শয়ন করিয়া আছেন। রাত্র বেশ একটু গভীর হইয়াছে। হঠাৎ প্রভু ঘনঘন হাততালি দিতে লাগিলেন। হাততালির শব্দে ভক্তগণ বুঝিলেন প্রভু ডাকিতেছেন। সকলেই জাগরিত হইলেন। অনেকে নিকটে আসিলেন।

প্রভু আপন মস্তক দেখাইয়া দিলেন। ভক্তগণ যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহাদের ভয়ের সীমা রহিল না। সকলে দেখিলেন, ভ্রমর কুঞ্চিত কৃষ্ণ-কেশদামের মধ্যে একটি বিষধর সর্প নানা ভঙ্গিতে জড়াইয়া উপরে ফণা তুলিয়া রহিয়াছে। ছবিতে যেরূপ শিবের মাথায় সাপ দেখা যায় ঠিক সেইরূপ। সকলে ভয়ে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

নানাভাবে সকলে সর্প তাড়াইতে চেষ্টিত হইলেন কিন্তু সর্পেরও যেন যাইবার উপায় ছিল না। কেশপাশে সে এমন ভাবেই জড়াইয়া গিয়াছে যে, অনেক চেষ্টাতেও সেও যেন নিজেকে ছাড়াইতে পারিল না। ভক্তগণ অন্যরূপ চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। প্রভু সস্মিত বদনে বলিলেন, "দেখিস্, আমার মাথার উপরে যেন জীব হত্যা না হয়।"

প্রাণারাম প্রভুর অনিষ্ট আশঙ্কায় বহু চেষ্টার পর একজন অতি সাহসে ভর করিয়া হাতে কাপড় জড়াইয়া সন্তর্পণে উহাকে বাহির করিয়া ভূমিতলে রাখিলেন। রাখিবামাত্র ভাগ্যবান সর্প দেহত্যাগ করিল। বুঝি বা কোন্ শাপভ্রষ্টের মুক্তি হইল! অথবা অনন্তদেবই কোন্ নূতন খেলা খেলিতে আসিয়াছিলেন!

শ্রীশ্রীপ্রভু তখনই তুমুল ভাবে কীর্ত্তন করিয়া সর্পবরকে সমাধিস্থ করিবার আদেশ করিলেন। ভক্তগণ মহানন্দে উচ্চৈস্বরে তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অতি যত্নে সর্পরাজকে ভূগর্ভে সমাহিত করিলেন। অনন্ত অনন্তানন্তময়ের লীলা খেলা লইয়া ভক্তগণ নানাপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

"উনি সেই পদ্মপলাশলোচন হরি"

ব্রাহ্মণকান্দা গ্রামে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তেজঃপূর্ণ অঙ্গকান্তি। জটাজুট ধারী, দেখিলেই শ্রদ্ধায় মস্তক নীচু হইয়া পড়ে। সন্ন্যাসী যখন যেখানে বসে সেইখানেই লোকের ভীড় জমে।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে সন্ন্যাসী মিষ্টি কথা বলে। যাকে যা বলে অনেক মিলিয়া যায়। কাহারও কর রেখা দেখে, কাহারও কপালের রেখা দেখে, কাহারও কপালে বিভূতির ফোটা লাগাইয়া দেয়। রোগী ও অর্থলিপ্সু লোকই অধিক আসে। তত্ত্ব জিজ্ঞাসু লোকও আসে। সন্ন্যাসী শাস্ত্রবেত্তাও। কঠিন প্রশ্নের সরল জবাব দিতে পারে।

একজন জিজ্ঞাসা করিল সাধুজী, জীবের ভবরোগের ঔষধ জানেন ? সন্ন্যাসী বলিলেন, জানি—"কি বলুন ত ?" সন্ন্যাসী কহিলেন, "হরিনামই ঐ রোগের একমাত্র দাওয়াই।"

সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে অনেকবার আসিলেন। নানা ছলে প্রভুবন্ধুকে দর্শন করিলেন। প্রভু কোন কথা বলিলেন না। দেবী দিগম্বরী সাধুজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে সেবা করাইলেন। আহার কালে দেবীর কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া প্রভুর কথা শুনিলেন।

কোনও ভক্ত সাধুজী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অমর্য্যাদাসূচক কথা বলিলে প্রভু বলিয়াছিলেন,—"উনি সাধারণ নন্।" উনিশ দিন ব্রাহ্মণকান্দা গ্রামের আশেপাশে থাকিয়া একদিন তিনি কোথায়

যে চলিয়া গেলেন কেহ জানিল না। যাইবার কালে বাদল বিশ্বাস মহাশয়কে বলিয়া গেলেন—"ওরে, তোদের প্রভুকে সামান্য মানুষ মনে করিস না, উনি সেই পদ্মপলাশলোচন হরি।"

"কোন্ রূপ ভাবিব?"

অনেকদিন ব্রাহ্মণকাঁদা থাকিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু পাবনা যাইবার ইচ্ছা করিলেন। বাকচর হইতে নবদ্বীপকে সংবাদ দিয়া আনিলেন। নৌকাযোগে পাচুড়িয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন। নৌকায় গোপাল মিত্র মহাশয় পাচুড়িয়া পর্য্যন্ত আসিয়া প্রভুকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

নৌকার মধ্যে মিত্র মহাশয় প্রভুবন্ধুকে বলিলেন—আর কত দিনে আসবেন? আমরা কি করবো?

প্রভু বলিলেন—"জপ করিও, স্মরণ করিও, রূপ চিন্তা করিও।"

মিত্র মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কোন্ রূপ চিন্তা করিব? এই রূপ?

মধুর হাসিয়া বন্ধু কহিলেন—"হাঁ।"

কার্ত্তিক ভৌমিকের প্রতি কৃপা।

নবদ্বীপদাসকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীপ্রভু পাবনায় পৌঁছিলেন। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক ভৌমিকের বাড়ী উঠিলেন। ভৌমিক মহাশয় ও তৎপত্নীর প্রতি প্রভু বন্ধুহরির বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। দম্পতীর প্রেম ভক্তির ডোরে বন্ধুসুন্দর বাঁধা ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ভক্তবর কার্ত্তিকের আকৃতি ও প্রকৃতি অতীব চিত্তাকর্ষী ছিল। তাহার চক্ষু দুইটি সর্ব্বদা প্রেমে ঢল ঢল থাকিত। যে দেখিত সেই-ই ভাবিত এই সংসার অরণ্যে এইরূপ ভাবের পাগল বিরল। ভৌমিক-দম্পতির অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য সকলের কাছেই সুস্পষ্ট ছিল।

প্রভুবন্ধু অনেক সময় তাহাদের সঙ্গে অনেক রঙ্গের খেলা খেলিতেন। বাৎসল্যভাবে বিভোর হইয়া কার্ত্তিক ও তৎপত্নী অনেক সময় বন্ধুসুন্দরের সম্মুখে ফল জল মিষ্টান্নাদি দিতেন। দিয়া "এস এস" বলিয়া সাদরে বন্ধুধনকে আহ্বান করিতেন। সেই মধুর সম্ভাষণ যে শুনিত সেই মুগ্ধ হইত।

বন্ধুসুন্দরও নিতান্ত শিশুর মত আসিয়া তাহাদের কোলের কাছে বসিতেন। যে প্রভু কাহারও বাতাস পর্য্যন্ত গায়ে লাগাইতেন না, তিনি যে ভাবে কার্ত্তিক দম্পতির কাছে আপন-হারা হইতেন তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইতেন। অনেক সময়ই প্রভু বন্ধুসুন্দর তাহাদের প্রদত্ত ভোগোপহার গ্রহণ

করিতেন এবং পরম আনন্দে হাবা ছেলের মত তাহাদের কাছে নাচিয়া হাসিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেন।

এসব দেখিয়া ভৌমিক-দম্পতি যে ব্রজের জন ইহা অনুভব করিতে কাহারও বেশী বিলম্ব হইত না।

শিবের শাসন

আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিমু তোমারে।

—শ্রীনিতাই

শ্রীশ্রীপ্রভু নবদ্বীপকে সঙ্গে লইয়া বুড়োশিব হারাণবাবার দর্শনে গেলেন। ক্ষ্যাপা ইটপাটকেল দিয়া একটা গোফার মত তৈয়ারী করিয়াছিলেন। প্রভু নবদ্বীপকে বাহিরে বসাইয়া রাখিয়া ঐ গোফার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্ষ্যাপা "আয়, জগা আয়" বলিয়া বিড় বিড় করিয়া কথা আরম্ভ করিলেন।

প্রথমে আস্তে আস্তে কথা চলিল। তারপর বেশ একটু জোরে জোরে। হঠাৎ কি যেন কথায় বুড়োশিব রাগিয়া গিয়া প্রভুর গায়ে দুই তিনটা করাঘাত করিয়া—নিজে কাঁপিতে লাগিলেন। প্রভু নবদ্বীপকে ডাকিয়া বলিলেন, "শিবকে বাতাস কর্।" নবদ্বীপ আসিয়া নিজ বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

"আমার কথা কিছুতেই শুনবি না, কিছুতেই শুনবি না?" পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়া শিব রাগে কম্পিত হইতে থাকিলেন।

কিছুক্ষণ পরে শান্ত হইলে প্রভু বলিলেন, "শিব, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাবে ?" শিব বলিলেন, "তুই কিছু দিবি না তো খাব কি ? এবার না খাইয়াই মরব।"

প্রভু তখন নবদ্বীপের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ভাল রস-গোল্লা ও সন্দেশ দুইসের নিয়ে আয়।" নবদ্বীপ দ্রুতগতিতে চলিয়া গিয়া ভাল দোকান হইতে ঐসব খাবার কিনিয়া আনিলেন। ঐসব দেখিয়াই বুড়োশিব চটিয়া উঠিয়া বলিলেন "শালা, উয়া আনবার গেছিস্ ক্যন্ ? আমার কি উয়ার ক্ষিদা নাকি ?"

এই কথা বলিয়া একখানা লাঠি লইয়া শিব নবদ্বীপের পিঠে দুই তিনটা জোর আঘাত করিলেন। বলিলেন, "যা জগাকে খাওয়াগে" প্রভু বলিলেন, "শিব রে আমি এখন ওসব খাব না।"

শিবের আঘাতে নবদ্বীপের পিঠে বেশ বেদনা লাগিয়াছিল। প্রভু নবদ্বীপকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন "তোর ভাগ্য, তুই আজ কৃতার্থ হলি। তোর ভববন্ধন ঘুচে গেল।"

শিব প্রভুকে বলিলেন, "ক্যন্, হগল্ জাগায় খাইবার পার, আর আমার এহানে খাইবার কইলেই খাইবার পার না।" এই বলিয়া নবদ্বীপকে বলিলেন, "যা, ওসব ধুনীকে দিয়া আয়"। ধুনী নাম্নী একটি সেবিকা বুড়োশিবের সেবা করিত। নবদ্বীপ শিবের আজ্ঞা পালন করিল।

———

জয়নিতাইর গীতা পাঠ

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা

শ্রীশ্রীপ্রভুর পাবনা পৌঁছিবার পূর্ব্ব হইতেই জয়নিতাই দেবেন্দ্রনাথ সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। বুড়োশিব জয়-নিতাইকে উৎসাহ দিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠে ব্রতী করেন। পাবনা সহরস্থ অনেক ভক্তবৈষ্ণবের গৃহে পাঠ হইতেছিল। অনেক স্থলে বুড়োশিব নিজে শ্রোতা হইতেন।

জয়নিতাইর পাঠ শুনিয়া বুড়োশিব আনন্দে ঢলিতেন—কখনও তাহাকে "বাবা" সম্বোধন করিয়া মস্তকে গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। কখনও উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন। জয়নিতাই নিজেও পাঠে খুব আনন্দ পাইতেন। বুড়োশিবেব ভাব তাহাকে আনন্দে উদ্বেলিত করিয়া তুলিত। জয়নিতাই পূর্ব্বেও শ্রীহট্ট, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে সজ্জন-সভায় পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু পাবনায় যেরূপ আনন্দ পাইতে লাগিলেন, সেরূপ আর কুত্রাপি অনুভব হয় নাই। জয়নিতাই ভাবিতেন, নিত্যসিদ্ধ বুড়োশিবের কৃপাই ইহার একমাত্র হেতু। পাঠে, চৈতন্য ভাগবতের পংক্তির ছোট ছোট কথাগুলির মধ্য দিয়া এমন সুগভীর তত্ত্বসিদ্ধান্তের স্ফুরণ হইত, যাহাতে কেবল শ্রোতৃবৃন্দ নহে, পাঠক নিজেও চমৎকৃত হইতেন।

জয়নিতাইর নিকট অনেক ভক্তিগ্রন্থ ছিল। সবগুলি একটি দপ্তরে বাধা থাকিত। একদিন পাঠারম্ভে যখন শ্রীচৈতন্যভাগবত

পাঠ করিবেন মনে করিয়া গ্রন্থের দপ্তর খুলিতেছিলেন, তখন বুড়োশিব বিড় বিড় করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। শিবের সকল কথা বোঝা যাইত না, অনেক কথার মধ্যে এই বোঝা গেল, শিব বলিতেছেন,—

"আজ বাবা ঐ বড় কেতাব পাঠ করা হবে না। নবদ্বীপে রাইমাতার আশ্রমের নির্জ্জন কুটীর প্রান্তে যে ছোট কেতাব পাঠ করতিস্ তাই পাঠ হবে। ঐ কেতাবের যে অংশ পাঠে অধিক আনন্দ পেতিস্ সেই অংশটুকু পাঠ হবে।"

বুড়োশিবের কথায় জয়নিতাই বিস্মিত হইলেন। সত্যসত্যই একসময় তিনি নবদ্বীপে রাইমাতার আশ্রমে এক নির্জ্জন কুটীর প্রান্তে বসিয়া গীতার রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ পাঠ করিয়া পরম আনন্দ পাইতেন। কিন্তু তিনি তখন তথায় কোনদিনও বুড়োশিবকে দেখেন নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই পাঠের সংবাদ আপনি কিরূপে জানিলেন?"

শিবের দুর্ব্বোধ্য উত্তরের সহজ-বোধ্য অনুবাদ এই—"বাবা, তোমরা জানতে পার না ও বুঝতে পার না যে, আমি সকল অবস্থায় সকল স্থানে সকল সময় তোমাদের নিকট থাকি। যখন যা কর সব জানি। তোমার ঐ গীতাপাঠে আমি আনন্দ পাইতাম আজ উহাই পাঠ কর।"

জয়নিতাই বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ দিন সভায় কলিকাতা হইতে আগত কতিপয় নব্য শিক্ষিত যুবক ছিল। চৈতন্য-ভাগবতে হঠাৎ তাহাদের প্রবেশ হইবে না সেইজন্য গীতার নবম

অধ্যায় পাঠে বুড়োশিব আদেশ করিতেছেন। শ্রোতৃবৃন্দের যোগ্যতা বিবেচনাতেই ঐরূপ আজ্ঞা।

আজ্ঞা শিরে লইয়াই জয়নিতাই গীতার নবম অধ্যায় পাঠ করিলেন। সেদিনকার পাঠের আনন্দ অবর্ণনীয়। গীতার পবিত্র মন্দাকিনী প্রবাহে সকলে বিমল শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। জয়নিতাই মালসাট মারিয়া আনন্দে কহিতে লাগিলেন—"জয় জয় নিতাই গৌরহরি। জয় জয় শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি।

বুড়োশিব, অপর একদিন জয়নিতাই প্রমুখ ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছিলেন, "ওরে তোরা জানিস, যে জগা তোদের সকলের রাজা। তোরা সব জগার প্রজা। তোরা প্রত্যেকে ব্রজের এক একজন রাজা, তোদের সকলের উপর রাজা জগা।"

"আপনার অবারিত দ্বার"

পাবনা আসিবার পূর্ব্বে কলিকাতা বিডন স্কোয়ারে প্রেমানন্দ ভারতীর সহিত জয়নিতাইর একদিন দেখা হইয়াছিল। ভারতী মহাশয় যে অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রভুবন্ধুর দর্শন ভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, একথা জয়নিতাইকে বলিয়াছিলেন। অন্তরে সেজন্য বেদনা থাকিলেও ভারতী মহাশয় তাহা চাপিয়া রাখিয়া কহিয়াছিলেন—"তার যেমন ইচ্ছা তেমনি ত হইবে!"

ভারতী মহাশয়ের অন্তরের বেদনা জয়নিতাইর প্রাণেও লাগিয়া রহিয়াছে। পাবনাতে শ্রীশ্রীপ্রভুর চরণ দর্শন করিয়া হু'চার কথা আলাপের পরই জয়নিতাই দীনভাবে জিজ্ঞাসার সুরে কহিলেন—"প্রভু, আপনি ভারতী মহাশয়কে দর্শন দেন না কেন ?"

শ্রীশ্রীপ্রভু ঈষদ্ গম্ভীর সুরে উত্তর করিলেন, "দেখুন, ভারতী মহাশয় আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আমারও তাহার সহিত দেখা করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা। কিন্তু মধ্যে দেবতা বাদী। দেবতারা নিষেধ করিতেছেন। তাই, দেখা হইতেছে না। আমি গবাক্ষ দ্বার দিয়া সংকীর্ত্তনে তার নৃত্য দেখিয়া আনন্দ পাই। কী মধুর নৃত্য, ঠিক যেন দাদার মত।"

কথা বলিতে বলিতে বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখখানি অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। জয়নিতাই প্রেমপুলকিত নেত্রে শ্রীবদন পানে তাকাইয়া রহিলেন। নয়নে নয়ন লাগিলে বন্ধুসুন্দর কহিলেন—"তা ভারতী মহাশয় ও অন্যান্য ভক্ত সম্বন্ধে যাহাই হউক, যতদিন গৌড়দেশে আছি, আপনার অবারিত দ্বার।"

শ্রীমুখের মধুর বাক্য শুনিয়া জয়নিতাই পরম আনন্দে "জয় নিতাই জয় নিতাই" বলিয়া ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

———

"কাঠের দুয়ার কি দুয়ার ?"

শ্রীশ্রীপ্রভু বৈদ্যনাথ চাকী উকীল বাবুর বাড়ীর অনতিদূরে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহে একাকী আছেন। স্থানটি নির্জ্জন। দুই একটি পাখীর গান ছাড়া, আর কিছু শোনা যায় না। প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির নায়ক নীরবে আছেন।

জয়নিতাই বন্ধুসুন্দরের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ রহিবেন এইরূপ আশা করিয়া আসিয়াছেন। কুটীর দ্বারে উপনীত হইয়া দুয়ারে হাত দিয়া বুঝিলেন উহা ভিতর হইতে রুদ্ধ। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে "জয় নিতাই, জয় নিতাই' বলিয়া পুনঃ পুনঃ সাড়া দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ভিতর হইতে শ্রীশ্রীপ্রভু মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন, "অদ্য দুয়ার খোলা হইবে না। আমি ঘরের ভিতরে থাকি, আপনি বাহিরে থাকিয়া কথাবার্ত্তা বলুন।" ইহার উত্তরে জয়-নিতাই বলিলেন, "আপনি সেদিন বলিয়াছেন, যতদিন গৌড়দেশে থাকিবেন, ততদিন এ অধমের অবারিত দ্বার। আজ আবার দুয়ার বন্ধ করিয়াছেন ইহার কারণ কি ?"

আরও মধুর হইতে সুমধুর স্বরে শ্রীশ্রীপ্রভু এই কথার উত্তরে বলিলেন—"কাঠের দুয়ার কি দুয়ার !"

বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখের ঐ কথাটি শ্রবণ করিয়া জয়নিতাই পরমানন্দে বিভোর হইয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে যথাসম্ভব ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া গদ গদ কণ্ঠে কহিলেন, "প্রভু, শ্রীমুখের কথাটি

শুনিয়া বড়ই সুখ পাইলাম। আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে—আপনি বলিয়াছেন, যতদিন গৌড়দেশে থাকিবেন এ অধমের অবারিত দ্বার। আপনি ত কোনদিনই গৌড়দেশ ছাড়া নন!"

বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর গৃহাভ্যন্তর হইতে উত্তর করিলেন—"আমি কি কখনও গৌড়দেশ ছাড়া হ'তে পারি?"

জয়নিতাইর আর জিজ্ঞাস্য রহিল না। ভাবে টলিতে টলিতে গৃহে ফিরিলেন। "জয় নিতাই জয় জগদ্বন্ধু"—জয়ধ্বনি তাহার কণ্ঠহার হইয়া রহিল।

"আপনাতেই তো সকল প্রয়োজন!"

"কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।"

—শ্রীকৃষ্ণদাস

অপর একদিন জয়নিতাই শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখে নানারূপ তত্ত্বকথা আস্বাদন করতঃ গমনোন্মুখ হইয়া বলিলেন, "এখন তবে আসি।" প্রভুবন্ধু মধুমাখা স্বরে কহিলেন, "আর কোন প্রয়োজন নাই কি?" জয়নিতাই বলিলেন, "এখন আর কোন প্রয়োজন নাই।"

বন্ধুসুন্দর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কোনও প্রয়োজন নাই?" জয়নিতাই আবারও বলিলেন "এখন আর প্রয়োজন নাই।" প্রভু বন্ধুহরি গম্ভীরতর কণ্ঠে কহিলেন, "আমাতে কোনও প্রয়োজন নাই?" শ্রীমুখের ভাবগাম্ভীর্য্য দর্শন করিয়া জয়নিতাই

উদ্বিগ্ন-ভাবে বলিলেন, "প্রভু, ও কি কথা কহিতেছেন! আপনাতেই তো সকল প্রয়োজন!"

বন্ধুহরি আর কিছু না বলিয়া হাসিমুখে জয়নিতাইর দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই নিরুপম চাহনীতে জয়-নিতাইর অন্তর বাহির সুশীতল হইয়া গেল। তখন বন্ধুসুন্দর এমনই একটি মহামাধুর্য্যময় রূপের ছটা বিস্তার করিলেন যে, জয়নিতাই উঠিয়া তুইহাতে প্রাণের দেবতাকে জড়াইয়া ধরিতে চেষ্টান্বিত হইলেন।

"বিশেষ কারণে আমাকে এখনই বাহিরে যাইতে হইবে" এই কথার ছল পাতিয়া বন্ধুসুন্দর তখন অতি সন্তর্পণে সে স্থান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। জয়নিতাই ধরিতে গিয়াও ধরিতে পারিলেন না। যে শোভা দেখিলেন তাহা তাঁর হৃদয় আকাশে চিরকাল দেদীপ্যমান রহিল। বিল্বমঙ্গলের ভাষায় বীরত্ব প্রকাশ করিতে করিতে জয়নিতাই গৃহের বাহির হইলেন—

"হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরষং গণয়ামি তে।"

"সেই 'ব'এর কথা"

"জীবে দায়ী হও, কৈ কৈ প্রভু দয়াল।"

—শ্রীবন্ধু

অপর একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু জয়নিতাইকে কহিলেন, "দেখুন, ব্রহ্মচর্য্য করা উচিত। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উষা স্নান করা উচিত। আহার নিদ্রা সকল বিষয়ে সংযত হওয়া উচিত।"

মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া জয়নিতাই বলিলেন, "প্রভু, এ সকল বিষয় আপনার শ্রীমুখে শুনিতে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা হয়। কিন্তু শক্তিতে কুলায় না। আমি ইচ্ছা করিলেও সংযত হইতে পারি না। বরং সংযত হইতে ইচ্ছা করিলে আরও বেশী অসংযমী হইয়া পড়ি। ইহাতে বড়ই দুঃখ ও মনস্তাপ হয়।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সাশ্রুনেত্রে জয়নিতাই আবার বলিতে লাগিলেন—"প্রভু, আমার এক নিবেদন, অনন্যোপায় হইয়া এই নিবেদন জানাইতেছি। আপনি যদি নিজগুণে দয়া করিয়া আমার "ব-কলম" নিজে গ্রহণ করেন তাহা হইলেই আমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া পরম সুখী হইতে পারি।"

প্রভু বন্ধুহরি জয়নিতাইর সকল কথা স্থিরভাবে শুনিলেন। শুনিয়া বলিলেন, "বর্ত্তমান সময় আপনি চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ ভাল হইতে পারিবেন না, ইহার বিশেষ কারণ আছে। আপনি চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হইবেন না। এই জীবনের মধ্যেই এমন এক শুভ দিন আসিবে যে, আপনি সেই একদিনেই সম্পূর্ণ ভাল হইবেন।"

প্রাণের দেবতার শ্রীমুখের এইরূপ অপূর্ব্ব আশ্বাসপূর্ণ বাণী শুনিয়া জয়নিতাই পরমানন্দে সেই শুভ দিনটির প্রতীক্ষায় রহিলেন। তবে ব-কলমের কথা কিছুই উল্লেখ করিলেন না দেখিয়া একটু চিন্তিত রহিলেন।

অন্য একদিন শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীচরণ-সান্নিধ্য হইতে বিদায় গ্রহণ কালে জয়নিতাই বলিলেন, আমার সেই কথাটি মনে আছে তো? শ্রীশ্রীপ্রভু হাসিয়া বলিলেন—"কোন্ কথা, সেই 'ব'-এর কথা ?" প্রভু ব-কলমের কথা মনে রাখিয়াছেন ও রহস্যপূর্ণভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ইহাতে জয়নিতাইর হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল।

প্রভু বন্ধুসুন্দর কেবল যে জয়নিতাইর ব-কলমের কথা ভুলেন নাই, এমন নহে। আমাদের সকলের ব-কলমের কথাই তাঁর মনে আছে। তাই তো, একদিন ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া পরম কারুণ্যপূর্ণ স্বরে কহিয়াছিলেন,—

"তোদের দ্বারা যদি মহাপাপের কার্য্য সকলও ঘটিয়া যায় তাহা হইলেও আমি রক্ষা করব। কিন্তু তোরা সাবধান হ'স্। যেন কোন অবস্থায় আমাকে না ভুলিস। আমাকে ভুলিয়া গিয়া আমা ছাড়া না হ'স্। তোরা ক্ষুদ্র জীব তোরা আর কতটুকু পাপ কর্‌তে পারিস্। পূর্ব্বে অসুররাই পাপের কার্য্য করতো। তোদের শেষ রক্ষা হবে।"

"দেখুন, গোমাতা আমায় কত ভালবাসে!"

বাঁশরী বাজায়ে চলে কিশোরী মোহন।
ধবলী শ্যামলী পদ করিছে লেহন॥

—শ্রীবন্ধু

একদিন বৈদ্যনাথ চাকী মহাশয়ের গোশালার নিকট শ্রীশ্রীবন্ধু-সুন্দর মৃদুমধুর পাদচারণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। জয়নিতাই প্রভুর পার্শ্বে ছায়ার মত চলিতেছিলেন। সেই অপূর্ব্ব "গমন-নটন" উপভোগ করিতেছিলেন।

ঐ সময়ে গোশালায় একটি সবৎসা গাভী ছিল। গাভীটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রভুবন্ধু কহিলেন, "দেখুন গোমাতা আমায় কত ভালবাসে।" এই বলিয়াই বন্ধুসুন্দর গাভীটির নিকটবর্ত্তী হইয়া বসিয়া পড়িলেন। শ্রীঅঙ্গের বসন এলাইয়া পড়িল। বালকের মত হাত দুটি তুলিয়া আনন্দে ডগমগ হইলেন।

গাভীটি নিজ বৎসের অঙ্গ লেহন পরিত্যাগ করিয়া প্রভুবন্ধুর শ্রীমস্তক লেহন করিতে লাগিল। বাৎসল্যে ভরপুর হইয়া ঘনঘন হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিতে লাগিল। গাভীর স্তন হইতে বিন্দু বিন্দু দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল। গাভীটির চোখের জলে মুখের লালায় বন্ধুহরির শ্রীমস্তক ভিজিয়া গেল।

এই মধুর দৃশ্য দর্শনে জয়নিতাইর ও অন্যান্য সকলের নয়ন ভরিয়া জলধারা গড়াইল। নবদ্বীপে কীর্ত্তন আসরে জয়নিতাই কোন মহাজনের পদ শুনিয়াছিলেন, "আনন্দ বিহ্বল গাই" শ্যাম-

সুন্দরের স্পর্শে গাভী আনন্দে বিহ্বল। কর্ণে শোনা কথা আজ নয়নে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। এই কাহিনী যখন ভক্তজনসমীপে কীর্ত্তন করিতেন তখন জয়নিতাইরও অশ্রুধারা গলিত।

রাজসিক ও সাত্ত্বিক অভিমান

ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিদান।

—শ্রীস্বরূপ

একদিন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর ভক্তবর হরিরায়ের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। দ্বার রুদ্ধ ছিল। জয়নিতাই সেখানে আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে প্রভুবন্ধু নিষেধ করিলেন। ইহাতে জয়নিতাইর অভিমান হইল। ক্রমে অভিমান এত বাড়িয়া গেল যে, আর প্রভুর কাছে আসিব না এইরূপ ঠিক করিয়া দূরে সরিয়া থাকিলেন।

একরাত্রি একদিন জয়নিতাইর নিদারুণ অশান্তিতে কাটিল। ঐ সময়ের মধ্যে তাহার মুখে একটি বারও হরিনাম বা হরিকথা উচ্চারিত হইল না। দিবাবসানে জয়নিতাই অনুতাপে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে বন্ধুসুন্দরের শ্রীচরণ সমীপে উপনীত হইলেন ও শ্রীপাদপদ্মে লুটাইয়া কৃত-অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর অতি করুণ ভাবে কহিলেন, "উদ্বিগ্ন হইবেন না। মনে অশান্তি রাখিবেন না। ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন। গতকল্য আপনার যে অভিমান হইয়াছিল উহা সম্পুর্ণ রাজসিক।

উহাতে মস্তিষ্ক অতিশয় জ্বালাময় ও যন্ত্রণাময় হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীব্রজগোপীদের যে মান অভিমান ছিল তাহা ছিল সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক। তাহাতে হৃদয় ও মস্তিষ্ক শীতল ও শান্তিময় হয়। উহা স্মরণ করিলেও চিত্তে পরমানন্দের উদয় হয়।"

লজ্জিত ও অনুতপ্ত জয়নিতাই শ্রীমুখের পরম তত্ত্বসন্দেশ পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

পুত্রবানের মুখ

জ্ঞাভীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্।

—শ্রীকৃষ্ণ

জয়নিতাইর ছোট ছেলেটির নাম ছিল পটল। বয়স দুই বৎসর মাত্র। এমনি লালিত্য মাখান ছিল তার রূপ ও কথা বার্ত্তা যে, কেহই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। হরিসংকীর্ত্তনে সে বাহু দুটি তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিত। কখনও ধুলায় গড়াগড়ি দিত। সকলেই বলিত কোন মহাপুরুষ আসিয়াছে।

অকস্মাৎ বালকটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পত্রে সংবাদ পাইয়া জয়নিতাইর মত ভক্তবীরের মনও শোকে চঞ্চল হইয়া উঠে। প্রথম খবর পাইবার সঙ্গে সঙ্গে জয়নিতাই একরূপ মুহ্যমান হইয়া পড়েন। তারপর সুধীজনের মত বিচার করেন, সংসারের যা কিছু সবই অনিত্য—আমার পুত্র পটলও অনিত্য। একমাত্র নিতাই গৌরাঙ্গ নিত্যসত্য। আর সবই অলীক।

বিচার বুদ্ধিতে শোকের সাময়িক উপশম হয়। দূর হয় না। ভালবাসা তাহার হারাণ পাত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত খা খা করে।

সেদিন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের বদনচন্দ্র দর্শন করিয়া শোকাতুর জয় নিতাইর পটলের ভাবনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বাৎসল্যে গলিয়া জয়নিতাই শ্রীশ্রীপ্রভুকে বলিলেন, "আজ আপনাকে পুত্র সম্বোধন করিতে প্রবল ইচ্ছা হইতেছে।"

জয়নিতাইর প্রাণস্পর্শী স্নেহমাখা কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীবন্ধু বলিলেন, "বড় উত্তম কথা। এই সম্বন্ধে আমি বড় সুখী হইলাম।"

এই ঘটনার দুই একদিন পর বন্ধুসুন্দর রাজর্ষি বনমালীর রাজধানী বনওয়ারী নগরে যাত্রা করিতেছেন। যাত্রাকালে জয় নিতাইকে বলিলেন, "আমি এখন বনওয়ারী নগরে যাত্রা করিতেছি। আপনার মুখ দেখিয়া যাত্রা করি কারণ যাত্রাকালে পুত্রবানের মুখ দেখিয়া যাত্রা করিতে হয়।"

শ্রীমুখের মধুর কথা শুনিয়া জয়নিতাই গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, যদি এই নরাধমের মুখ দেখিয়া যাত্রা করিলে আপনার যাত্রা শুভ হয়, তবে তাই করুন।" বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখ হইতে "পুত্রবান" সম্বোধনে জয়নিতাইর হৃদয়ে যে অপ্রাকৃত আনন্দের উদয় হইল, তাহাতে প্রাকৃত পুত্রশোক ডুবিয়া গেল।

কিছু সময় থামিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু পুনরায় মধুর স্বরে কহিলেন, "দেখুন, ভারতী মশায় আমাকে ভাই বলিয়াছেন, আপনি আমাকে পুত্র বলিয়াছেন। আমার একান্ত ইচ্ছা ও আশা যে, এই ভাবে গৌড়মণ্ডলের সকল ভক্তের সহিত আমার একটু সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাহা হইলে আর চিত্রগুপ্তের ভয় থাকিবে না।"

আত্মগোপন

পলাইতে তুমি প্রভু হও বড় বীর

—শ্রীকৃষ্ণদাস

অপর একদিন জয়নিতাইর লালসা জাগিল শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখ হইতে তাহার নিজ পরিচয় শুনিবেন। তাই নানা কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—

"প্রভু, অনেকেই বলেন যে এখন অবতার প্রকাশের সময় হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই, শ্রীশ্রীশচীনন্দন নিজ জননীকে বলিয়াছেন—

"আরও দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥"

পরম প্রিয় ভক্তগণকেও বলিয়াছেন—

"হেন মত আরও আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন-আনন্দ-রূপ হইবে আমার॥
তাহাতেও তোমা সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবে মহাসুখে আমা সঙ্গে॥

এই সব জানিয়া শুনিয়া এ অধমের মনে সুদৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, সপরিকরে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ আবার ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি নিজগুণে দয়া করিয়া বলুন।"

জয়নিতাইর প্রশ্নে শ্রীশ্রীপ্রভু উত্তর করিলেন।—

"শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কি যখন তখন যেখানে সেখানে আসেন!

আর যদি সত্যই আসিয়া থাকেন, পৃথিবীর কোন্ কোণে বিরাজ করিতেছেন হয় ত অনেকেই জানে না। হয়ত লীলা সম্পূর্ণ করিয়া চলিয়া যাইবেন, কেহই জানিতে পারিবে না।"

এইমাত্র বলিয়া প্রভু বন্ধুহরি নীরব হইলেন। জয়নিতাই সতৃষ্ণ নয়নে শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া শ্রীমুখনিঃসৃত কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিলেন। কথাগুলি বলিবার সময় শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমুখমণ্ডলে একটি অনির্ব্বচনীয় জ্যোতির ঝলক খেলিল। সেই অসমোর্দ্ধ স্নিগ্ধ জ্যোতির প্রবাহে পার্শ্বস্থ জয়নিতাই যেন একেবারে প্লাবিত হইয়া গেলেন।

জয়নিতাই বন্ধুহরির শ্রীমুখে যাহা শুনিতে সাধ করিয়াছিলেন তাহা শুনিতে পাইলেন না বটে কিন্তু তিনি আপনমনে বলিলেন— "প্রভু, আপনি কথার ভঙ্গিতে যেটুকু গোপন রাখিতে চেষ্টা করিলেন আপনার শ্রীমুখের সৌন্দর্য্যের ঝলক তাহা আমাকে বলিয়া দিল।"

বালক যেমন পত্রের আড়ালে থাকিয়া বলে "আমি এখানে নাই", শ্রীশ্রীবন্ধুর আত্মগোপনের প্রচেষ্টাও সেইদিন জয়নিতাইর নিকট সেইরূপ মনে হইয়াছিল।

———

"তোর তো অনুরাগ কম নয়!"

স্খলিত চরণে, চলে প্রাণপণে,
যে দিকে বাঁশরী বাজে।

—শ্রীবন্ধু

প্রভুর আদেশে নবদ্বীপ দাস পাবনা সহরে প্রত্যহ প্রভাতী টহল কীৰ্ত্তন করিতেন। টহল দিয়া ফিরিয়া আসিয়াই বহু সেবার কার্য্যাদি করিতে হইত। রাত্রে মাত্র তিন ঘণ্টা নিদ্রার নিয়ম ছিল। নবদ্বীপের এই কঠোরতা সহ্য করিতে কষ্ট হইত। তবু শ্রীমুখ চাহিয়া সকল কার্য্য করিতেন।

একদিন টহল কীৰ্ত্তন শেষ করিয়া নবদ্বীপ আবার গিয়া শয্যায় শয়ন করিয়াছেন ও শরীরের ক্লান্তি বশতঃ গভীরভাবে নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। প্রভাতে ভজনের সময় নবদ্বীপকে ঐরূপ ঘুমঘোরে নিমগ্ন দেখিয়া প্রভু অতীব দুঃখিত হইলেন এবং তাহাকে কঠোর ভাবে শাসন করিলেন।

প্রভু বলিলেন, "মানবদেহ ভজনের দেহ, ভোগের জন্য নয়। যদি ভোগ চাও বাড়ী ঘরে যাও, আমার সঙ্গে থাকা কেন?" এই সকল কথায় নবদ্বীপের অত্যন্ত অভিমান হইল। তিনি শেষ রাত্রে প্রভুকে না জানাইয়া পলায়ন করিলেন ও বরাবর নাওডুবি গ্রামে নিজ বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন।

নবদ্বীপ দাস চলিয়া আসার তিন দিন পরই শ্রীশ্রীপ্রভু ফরিদপুর আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ভক্তবর যোগেন চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে লইয়া প্রভু ফরিদপুর অভিমুখে রওনা হইলেন। ষ্টীমারে কুষ্টিয়া আসিয়া ট্রেণে উঠিলেন।

নবদ্বীপ বাড়ীতে পৌঁছিয়া ভীষণ অসোয়াস্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন—"এ আমার কি হইল! একদিন এই বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া পাবনা প্রভুর কাছে গিয়াছিলাম, আজ পাবনা প্রভুর কাছ হইতে পলাইয়া সেই বাড়ী আসিলাম। এখন প্রভুর কাছেও থাকিতে পারি না, বাড়ীতেও মন টিকে না। হায় আমার গতি কি হবে? প্রভু আমাকে গঠন করিবার জন্য কত চেষ্টা করেন, আমার দুর্দ্দৈব বশতঃ কিছুতেই প্রভুর মনের মত হইতে পারি না!"

অতিকষ্টে আহার-নিদ্রা-শূন্য ভাবে দুই দিন কাটিল। তৃতীয় দিনে নবদ্বীপের মনে হইল আজ হয়ত প্রভু এই গাড়ীতে আসিতে পারেন। নাওডুবির বাড়ী রেল লাইনের ধারে। সূর্য্য-নগর ষ্টেসনের নিকট নাওডুবি গ্রাম। সূর্য্যনগরের পরবর্ত্তী ষ্টেসনই রাজবাড়ী।

নবদ্বীপ রেল লাইনের ধারে আসিয়া ট্রেণের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেণ দেখা দিল। নবদ্বীপ সোৎসুক নয়নে ট্রেণের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কি আশ্চর্য্য, যেমন ভাবনা তেমনি দর্শন।

ঐ গাড়ীতেই প্রভু আসিতেছেন। প্রভু গাড়ীর জানালা দিয়া শ্রীমুখারবিন্দ বাহির করিয়া বুঝি বা নবদ্বীপের বাড়ীর দিকেই তাকাইয়া আছেন। আর্ত্তভক্ত ও ব্যথিত-ভগবানে দেখা হইল। নবদ্বীপকে দেখিয়াই প্রভুবন্ধু কমণ্ডলু হাতে করিয়া জানালা দিয়া ঝুলাইয়া ঝুলাইয়া তাহাকে আসিবার জন্য সঙ্কেত করিলেন।

প্রভুর শ্রীবদন দর্শন করিয়া ও শ্রীহস্তের কমণ্ডলুর দোলন-

ভঙ্গী দেখিয়া নবদ্বীপ উর্দ্ধশ্বাসে গাড়ীর সঙ্গে ছুটিতে লাগিলেন। ট্রেণখানি সূর্য্যনগর ষ্টেসনে দাঁড়াইল না। ডাকবাহী গাড়ী, সূর্য্য নগরের মত ছোট ষ্টেসনে দাঁড়ায় না। রাজবাড়ী গিয়া তবে থামিবে।

নবদ্বীপ দৌড়িতেছেন চলন্ত ট্রেণের সঙ্গে। গাড়ীর সঙ্গে যে মানুষ দৌড়িয়া পারে না ইহা ভাবিবার অবকাশ নাই। তার কটিতে যে একটুকরা সামান্য বস্ত্র, সঙ্গে যে জামা চাদর বা দ্বিতীয় বস্ত্র নাই, তাহা খেয়াল নাই। রেল লাইনের খোয়াতে যে পা ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত ঝরিতেছে তাহা অনুভব নাই। তিন দিনের বিরহ নবদ্বীপের আর্ত্তি শতগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে।

গাড়ী নবদ্বীপকে ছাড়াইয়া অনেক দূর চলিয়া গেল। নবদ্বীপ ভাবিলেন, "গাড়ী ত আমার অনেক আগেই রাজবাড়ী ষ্টেসনে পৌঁছিবে। আমি কিরূপে প্রভুকে ধরিতে পারিব! আবার ভাবিলেন, আমি যে দৌড়াইতেছি, তাহাও প্রভু দেখিয়াছেন, হয়ত করুণাময় এ হতভাগার জন্য অপেক্ষা করিবেন।"

অভিসারিকার মত স্খলিত চরণে ছুটিতে ছুটিতে অনেকক্ষণে নবদ্বীপ রাজবাড়ী ষ্টেসনে পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়া দেখেন প্রভু ষ্টেসনের বাহিরে একটি বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া তাহারই আসা-পথ পানে তাকাইয়া আছেন। তীরের মত ছুটিয়া নবদ্বীপ রাঙা চরণ তলে পড়িয়া গেলেন। সর্ব্ব শরীরে ঘর্ম্মধারা, পদতল ক্ষত-বিক্ষত, শ্বাস রুদ্ধ। প্রভু যোগেন চক্রবর্ত্তীকে কহিলেন—"দেখ্‌তো বেঁচে আছে কিনা!"

কিছুক্ষণ পরে প্রভু স্বয়ং নবদ্বীপের গায়ে শ্রীহস্ত অর্পণ করিলেন। স্নিগ্ধ শীতল শ্রীকর স্পর্শে নবদ্বীপ নবজীবন লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "তোর তো অনুরাগ কম নয়, গাড়ীর সঙ্গে দৌড়ে এলি!"

পরবর্ত্তী ট্রেণ ধরিয়া প্রভু পাচুড়িয়া আসিয়া নৌকাযোগে কতকদূর আসিলেন। সংবাদ পাইয়া বাকচরের গোপাল মিত্র বনমালী সা, মহিমদাস প্রমুখ দশবার জনভক্ত প্রভুকে লইবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন।

নিকটে একটি প্রকাণ্ড হাট। হাটের জনসংঘের মধ্য দিয়া প্রভু কিরূপে অতিক্রম করিবেন ভক্তগণ ভাবিতে লাগিলেন। রঙ্গলাল প্রভু কহিলেন—তোরা একখানা বাঁশের কওর (বেড়ার ঝাপ) লইয়া আয়। ভক্তগণ কোন বাড়ী হইতে উহা যোগাড় করিয়া আনিলে প্রভু তাহার উপর কাপড় ঢাকা দিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। প্রভুর ইঙ্গিত মত ভক্তেরা উহা কাঁধে করিয়া "বলহরি হরিবোল" বলিতে বলিতে হাটের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন। মৃতদেহ মনে করিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিল। কেবলমাত্র যাঁহারা প্রভুর গতিবিধির ভঙ্গি জানিতেন তাঁহারা দূর হইতে "প্রভু প্রভু" বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন।

বাকচর অঙ্গনে আবার আনন্দের হাট বসিল। নবদ্বীপ দাস উদ্বেলিত অনুরাগে শ্রীশ্রীচরণ সেবায় রহিলেন।

———

"জাগ জাগ নগরবাসী"

কীর্ত্তন-আনন্দ-রূপ হইবে আমার।

—শ্রীবৃন্দাবন

একদিন অপরাহ্নে শ্রীশ্রীপ্রভু নবদ্বীপকে বলিলেন, "নবা, কাগজ কলম লইয়া বোস।" নবদ্বীপ কাগজ কলম লইয়া শ্রীমন্দিরের বারান্দায় বসিলেন। মন্দিরের মধ্য হইতে প্রভু বলিতে লাগিলেন,—নবদ্বীপ লিখিতে লাগিলেন,—

জাগ জাগ নগরবাসী নিশি অবসান রে।
গুরু গৌরাঙ্গ বলে, উঠরে কুতুহলে,
শীতল হবে মন প্রাণ রে।
রাধা মাধব জয়, বল রে হুরাশয়,
হবে চির শান্তির বিধান রে।
রাধা গোবিন্দ নাম, গাও রে অবিরাম,
পরিণামে পাবে পরিত্রাণ রে।
জয় রাধামঙ্গল, বল রে অবিরল,
ধিক বন্ধু কুলিশ পাষাণ রে॥

গান লেখা হইলে নবদ্বীপকে গাইতে আদেশ করিলেন। নবদ্বীপ সুর কি জানিতে চাহিলে প্রভু প্রাচীন একটি প্রভাতী গানের সুর উল্লেখ করিলেন। নবদ্বীপ ঠিক করিতে পারিলেন না। শ্রীমুখে শিস্ দিয়া, হাতে তাল দিয়া প্রভু সুরখানি ঠিক করিয়া দিলেন। চারি পাঁচবার প্রভুর সঙ্গে সুরে তালে উচ্চারণ করিতে করিতে নবদ্বীপের সুর ও পদ আয়ত্ত হইয়া গেল।

"কাল প্রভাতে এই গান গাহিয়া নগর ভ্রমণ করিয়া টহল দিবি। বাজার ঘাট, খলিলপুর, ঘনশ্যামপুর, পরাণপুর সব ঘুরবি। রাত ৩টায় আরম্ভ।" আদেশ শিরে লইয়া পুনঃ পুনঃ গান আওড়াইয়া নবদ্বীপ রাত্র কাটাইলেন। পরদিন শেষরাত্রে করতাল লইয়া প্রভাতী কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। "জাগ জাগ নগরবাসী" গানে সত্যসত্যই সমস্ত নগরবাসী জাগিয়া উঠিল। তুমুলভাবে সমস্ত গ্রাম গ্রামান্তর কীর্ত্তন করিয়া শ্রীঅঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্দির পরিক্রমণ করিয়া কীর্ত্তন শেষ করিতে করিতে প্রভু শ্রীমন্দির হইতে শ্রীহস্তখানি বাহির করিয়া পাঁচটি অঙ্গুলি দেখাইলেন। নবদ্বীপ বুঝিলেন, আরও পাঁচবার ফিরে ফিরে গান গাইবার আদেশ আসিল।

গ্রামবাসী সকল কীর্ত্তন-প্রিয় ভক্তগণই কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন। বড়দল ছোটদল কেহ বাকী নাই। নরনারী, বালক বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সবাই অঙ্গনে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। গানের এমন সুর এমন মাতান, এমন উন্মাদনা আর কোনও দিন কেহ শুনে নাই। কীর্ত্তনের তুমুল রোল, নারী কণ্ঠের উলুধ্বনি মিলিয়া গগনতল কাঁপাইতে লাগিল।

আনন্দের উন্মাদনায় প্রভু স্বয়ং কতকগুলি তুলসীর মালা পাগড়ীর মত শ্রীমস্তকে জড়াইয়া, তিলক পড়িয়া, শ্রীমন্দিরের বাহিরের দরজায় বীরাসনে বসিলেন। হেমদণ্ড বাহু তুলিয়া তুলিতে লাগিলেন। সেই কীর্ত্তনানন্দে ভোরা রসেগড়া মনোচোরা মূর্ত্তি দর্শন করিতে শত শত নরনারী আসিয়া আঙ্গিনা ভরিয়া ফেলিল। এমন অভিনব গান কেহ কখনও শোনে নাই। এমন

দুর্লভ দর্শনও আর কেহ কোনদিন পায় নাই। সাক্ষাৎ কীর্ত্তন-আনন্দ-রূপ।

বেলা বারটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চলিল। পাঁচবার শ্রীহস্ত দেখাইয়া প্রভু গানটিকে পঁচিশবার গাওয়াইলেন। প্রভুর দর্শনে ভক্তগণের কীর্ত্তনানন্দ বাড়ে। কীর্ত্তনানন্দ বর্দ্ধিত হইলে প্রভুর কীর্ত্তন-আনন্দ-রূপতা বাড়ে। আঙ্গিনা ভরিয়া আনন্দের তরঙ্গ যেন ঢেউ খেলিতে লাগিল। সকলের মনে হইতে লাগিল, "জাগ জাগ নগরবাসী" গানে যেন সকল জগদ্বাসী নরনারীই জাগিয়া উঠিয়াছে। কেবল জাগতিক নৈশ ঘুম হইতে জাগা নয়, তমোগুণের মোহ ঘুম হইতে জাগা। সারা বিশ্ব যেন "জয় রাধামঙ্গল" গাহিবার জন্য প্রেম জাগরণে জাগিয়া উঠিয়াছে। মহাউদ্ধারণের মহালীলা যেন প্রভাতী গানটির মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

বহুক্ষণ কীর্ত্তন চলিবার পর একজন ভক্ত অনুরাগ ভরে দণ্ডবৎ প্রভুর চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেই প্রভু উঠিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তৎপর শ্রীমন্দিরের ভিতর হইতে ফল মিষ্টি নাড়ু-সন্দেশ বাতাসা বহু দ্রব্যাদি লুট ছড়াইলেন। কীর্ত্তন শেষ হইল। সকলে হুড়াহুড়ি করিয়া প্রভুর হাতের লুট কুড়াইয়া ধন্য হইলেন।

নবদ্বীপ দাস কাবেরী হইতে স্নান করিয়া আসিলেন। প্রভু এক জোড়া নূতন ক্ষিরোদের কাপড় ও একটি জপমালা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "আজকের কীর্ত্তনের পারিতোষিক দিলাম।" ভক্ত ভগবানের আদরের দান মাথায় তুলিয়া আনন্দ পাথারে নিমজ্জিত হইলেন।

স্বানুভাবানন্দে লীলাস্বাদন

তারুণ্য কারুণ্য লাবণ্যমূর্ত্তি রহে স্বরূপ রসে ভোর।

—শ্রীমহেন্দ্রজী

শ্রীশ্রীপ্রভু অনেক সময় ব্রজলীলা গৌরলীলা স্মরণাবেশে থাকিতেন। স্বানুভাবে নিজ লীলা নিজে আস্বাদন করিতেন। কখনও গুণ্ গুণ্ করিয়া বৈষ্ণব মহাজনদের পদ আওড়াইতেন। যখন যেকালের যে লীলা স্মরণ তত্তৎ ভাবানুকূল পদ আস্বাদন করিতেন। অন্তরের গভীর আস্বাদনের দুই একটি অক্ষর বাহিরে বাহির হইয়া পড়িত—নবদ্বীপ দাস আড়ালে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিয়া আনন্দে পুলকিত গাত্র হইতেন।

মধুর লীলা, মধুর পদ, মধুময়ের মধুর কণ্ঠে মধুর আস্বাদন। কোন দিন প্রভাতে বিরহিণীর ভাবে বলিতেন,—

প্রভাতে কাকাবলী আহার বাটিয়া খায়।
আমার বঁধুর তরে আগু বাড়াইয়া দেয়॥

কোন কোন দিন গোঠের দেরী হইলে সখ্যরসাবেশে প্রাণ-মাতান ঢেউ তুলিয়া বলিতেন,—

কি করিব ওরে শ্রীদাম করবো আমি কি।
ধড়া পড়ে চূড়া বেঁধে বসে রয়েছি॥
মায়ে না বলিয়া আমি যদি যাই গোঠে।
মরিবে আমার মা পড়িব সংকটে॥

কোনও সময় অপরাহ্নে বিরহিণী নদীয়া নাগরীর ভাবে ভাবিত হইয়া গৌর বিরহে কাতর হইয়া পড়িতেন। কণ্ঠে মহাজনদের দুই একটি মধুর অক্ষর বাহির হইয়া পড়িত—

গোরা গুণে প্রাণ কাঁদে কি বুদ্ধি করিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
দুর্লভ হরিনাম কে দিবে যাচিয়া॥
অকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কাঁদিয়া।
গোরা বিনু শূন্য ভেল সকল নদীয়া॥

আবার কখনও সন্ধ্যা সমাগমে আক্ষেপানুরাগিণী শ্রীরাধা-ভাবাবিষ্ট হইয়া আক্ষেপ করিতেন—বিরহ-বেদনায় মুখশশী মসীবর্ণ ধারণ করিত। বেদনা ভরা মৃদুস্বরে কহিতেন,—

নবঘন শ্যাম ও প্রাণ বঁধুয়া
আমি তোমায় না দেখিলে মরি।
তোমার যে মুখশশী, অমিয় মধুর হাসি,
তিল আধ না দেখিলে মরি॥

সন্ধ্যা অতীত হয়, গোপাল গোষ্ঠ হইতে ফিরে না। দূর হইতে শিঙা বেণুর রব শুনিয়া, গো-ক্ষুর ধূলি দেখিয়া জননী যশোদা আকুল নেত্রে তাকাইয়া আছেন। এই রসে রসিত হইয়া গোপালকে দেখিয়া, বক্ষে চাপিয়া, কোমল-করে অধর চাঁদ তুলিয়া ধরিয়া বলিতেছেন,—

নন্দ দুলাল বাছা যশোদা দুলাল রে।
এত বেলা মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল রে॥

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের স্বানুভাবে এই সকল লীলার স্মৃতি ও আস্বাদন নিরুপম। একমাত্র রসজ্ঞের হৃদয় সংবেদ্য।

———

প্রভুর ঘর নড়ে না

গোলোকে গোকুল ধামং বিভু কৃষ্ণ সম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥

—শ্রীকৃষ্ণদাস

প্রভুর স্নান আহারের এক এক সময় এক এক নিয়ম করিতেন। কখনও নিত্য অবগাহন করিতেন, কখনও বা তোলা জলে, আবরণে স্নান করিতেন। কখনও ভক্তদের রান্না গ্রহণ করিতেন, কখনও বা স্বপাক ছাড়া লইতেন না। স্বতন্ত্র ঈশ্বর, যখন যেমন ইচ্ছা হইত, ইচ্ছাময় তাহাই করিতেন।

হঠাৎ নিয়ম হইল পঁচিশ কলসী তোলা জলে নিত্য স্নান করিবেন। নবদ্বীপদাস এই জল তুলিতেন। একটা জল পাত্র ভরিয়া রাখিতেন। শ্রীমন্দিরের পিছনে পাটখড়ি দিয়া ঘেরাও করিয়া দেওয়া হইল, তাহার মধ্যে স্নান করিতেন। স্বপাক গ্রহণের নিয়ম চলিল। নবদ্বীপ উনুন ধরাইয়া জলে চাউল তরকারী একবারে ছাড়িয়া দিয়া জ্বাল দিতে থাকিতেন। ফুটিলে নিজে নামাইয়া কলার পাতায় ঢালিয়া গ্রহণ করিতেন।

কখনও আহার কালে নবদ্বীপ কাছে দাঁড়াইলে হাসিমাখা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিতেন, "বরেগী, সরে থাক, প্রভুকে যেন ছুঁয়ে ফেলিস না।" এই সব কথার মধ্যে যে কত প্রীতি মাখান থাকিত, তাহা যাহাকে বলিতেন একমাত্র তিনিই অনুভব করিতেন।

প্রভুর আহারান্তে নবদ্বীপ বাসনগুলি মাজিয়া রূপার মত ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিতেন। একদিন কাবেরীর ঘাটে নবদ্বীপ

বাসন মাজিতেছে। হঠাৎ বাসনগুলি জলের মধ্যে চলিয়া গেল। নদীর জল তীরে উঠিয়া পড়িল। চারিদিকে উলুধ্বনি পড়িল। ভূমিকম্প হইতেছে বুঝিয়া নবদ্বীপ টলিতে টলিতে আঙ্গিনায় ফিরিলেন। একটি স্থপারী গাছ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিভাবে সমস্ত পৃথিবী কাঁপিতেছে তাহা দেখিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য! দেখিলেন, প্রভুর ঘর একটুও নড়িতেছে না।

ভূমিকম্প থামিলে প্রভু শ্রীমন্দিরের দরজা খুলিয়া বসিলেন। নবদ্বীপের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লি, পৃথিবী কাঁপিল। প্রভুর ঘর নড়িল না।" নবদ্বীপ ইহা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিয়াছে, তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভুর ঘর নড়ে না কেন?"

ভক্তের প্রশ্নে প্রভু গুরু-গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"যোগমায়া ধরিয়া আছেন কিনা, তাই।"

"সাপে বাঘে যদি খায়
মরণ না হবে তায়"

ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং।
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্‌॥

—শ্রীব্রহ্মা

শ্রীশ্রীপ্রভু বাকচর আসিয়াছেন শুনিয়া ফরিদপুরের প্রভুর "পদাতিক সৈন্য" বালক ভক্তগণের দর্শনোৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠিল। রমেশচন্দ্র, স্থরেশচন্দ্র, দেবেনগুপ্ত, নকুলেশ্বর, অক্ষয়,

লোকনাথ, বিধু প্রভৃতি একত্রিত হইয়া ফরিদপুর হইতে বাকচর অভিমুখে রওনা হইলেন।

তাঁহারা বন্ধুকথা আলাপন করিতে করিতে পথ চলিতেছেন। ধূলদীর পুল পার হইয়া বালকগণ মাঠের পথ ধরিলেন। হঠাৎ একটি বিষধর সর্প একজনের পায়ে দংশন করিল। বালক বিষের জ্বালায় ও মৃত্যুভয়ে বসিয়া পড়িল। সকলে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল।

রমেশচন্দ্র কিছু মাটি হাতে লইয়া বালকের ক্ষতস্থানে টিপিয়া ধরিয়া রক্তপড়া বন্ধ করিলেন। তারপর "জয় জগদ্বন্ধু" বলিয়া তিনটি ফুঁ দিয়া বলিলেন, "চল কিছুই হইবে না। আমরা যখন প্রভুর কাছে যাইতেছি, তখন আমাদের কোন বিপদই হইতে পারে না।"

আবার পূর্ব্ববৎ বন্ধুকথা বলিতে বলিতে তাঁহারা বাকচর অঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে প্রিয় বালকগণকে দর্শন করিয়াই প্রভু বলিয়া উঠিলেন,—

"সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
যদি থাকে বিভুপদে মতি।"

বালকগণ প্রভুর অন্তর্য্যামিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং প্রভুই যে সর্প দংশন হইতে রক্ষা করিয়াছেন তাহা অনুভব করিলেন। বালকগণ প্রভুর কথাটির অক্ষর বদলাইয়া বলিতে লাগিলেন,—

সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
যদি থাকে প্রভু পদে মতি।

প্রভু বালকদের কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। বালকদল সমস্ত দিন প্রভুর আশে পাশে কাটাইলেন। কত মধুর কথা শুনিলেন, শুনাইলেন। প্রভু নবদ্বীপ দাসকে দিয়া সরবৎ করাইয়া বালকদের খাওয়াইলেন। বাকচরের জননীরা চিড়া মুড়ি আনিয়া দিলেন। বালকগণ অঙ্গন রজে গড়াগড়ি দিয়া জয় জগদ্বন্ধু বলিতে বলিতে সানন্দে ফরিদপুর ফিরিয়া আসিলেন। এক দিবসের অভিযানে বালকগণ সমস্ত বৎসরের জন্য শক্তি সংগ্রহ করিলেন।

"মৃদঙ্গ বাজায় কে?"

নেপথ্যে মৃদঙ্গ বাজে নাম সংকীর্ত্তন।

—শ্রীবন্ধু

ভক্ত ক্ষুদিরামকে প্রভুবন্ধু আদেশ করিলেন, "জাগ জাগ নগরবাসী" গান গাহিয়া প্রত্যহ সকালে টহল দিতে। ক্ষুদিরাম প্রভুর আদেশে প্রত্যহ টহল করিতেন। ক্ষুদিরাম ভাল গায়ক ছিলেন না, কিন্তু পরম ভক্তিভরে গান করিতেন। গানের সঙ্গে তাঁর প্রাণ মিশিয়া যাইত।

একদিন কীর্ত্তনান্তে প্রভুর শ্রীমন্দিরের সম্মুখে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া ক্ষুদিরাম কহিলেন, "প্রভু, আপনার আদেশে নিত্যই টহল কীর্ত্তন করি। কিন্তু কীর্ত্তনের সময় কে যেন পিছনে পিছনে মধুর ধ্বনি তুলিয়া মৃদঙ্গ বাজায়। কে বাজায় দেখিবার জন্য

মাঝে মাঝে ফিরিয়া চাই, কাহাকেও দেখিতে পাই না। অতি মধুর ধ্বনি, ঠিক আপনার বাজনার মত।"

প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "ঐ রকম ভাব, ওতে তোমাদের মঙ্গল। রাত দিন কেবল নাম করবি, সব দুঃখ দূর হবে। ভয় করিস না, হরিনামের সহিত হরি থাকেন। তোর পেট পোরা গু, করতাল দিতে পারিস না। তালে তালে নেচে নেচে কৃষ্ণনাম করিস। দুবেলা টহল দিস।"

ক্ষুদিরামের জিজ্ঞাসার উত্তর প্রভু সহজভাবে দিলেন না। কিন্তু বাক্যভঙ্গিতে ভক্ত বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রভুই হরি—তিনিই হরিনামের সঙ্গে থাকিয়া মধুর মৃদঙ্গ বাজান। ক্ষুদিরাম মনের আনন্দে প্রভুর সুখের জন্য দুইবেলা নাচিয়া নাচিয়া গ্রামময় টহল কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন।

ভক্তের আর্ত্তি

ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে।

—শ্রীবৃন্দাবন দাস

বাকচর অঙ্গনে প্রভু শ্রীমন্দিরে শয়ন করিয়া আছেন। হঠাৎ নবদ্বীপকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ তো, আমার কানের ভিতর কিছু গেল নাকি? কেমন যেন ব্যথা করিতেছে।" নবদ্বীপ অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া বলিলেন—"প্রভু, বোঝা যায় না তবে বোধ হয় আঠালী গিয়াছে। সেদিন খড়ের মধ্যে শুইয়াছিলেন, তখন হয়ত ঢুকিয়াছে।"

প্রভু বলিলেন—"যাই হউক, সিমের পাতার রস গরম করিয়া ঢালিয়া দে।" আদেশ মত নবদ্বীপ পাতার রস করিয়া গরম করিলেন। বারংবার হাতের আঙ্গুল ঠেকাইয়া দেখিলেন, গরম সহ্য হইবে কি না। যখন ঠিক হইয়াছে মনে হইল তখন অতি ধীরে প্রভুর কানে ঢালিয়া দিলেন।

কানে রস দেওয়া মাত্র তাপের জ্বালায় প্রভু বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া ছুটিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ কিছু দূর পর্য্যন্ত পিছনে পিছনে ছুটিলেন। শেষে মনে করিলেন, শ্রীমন্দির খোলা রহিয়াছে, গ্রন্থ বস্ত্র দ্রব্যাদি ছড়ান রহিয়াছে—ও সব ঠিক করিয়া মন্দির বন্ধ করিয়া আসি। অল্পসময়ের মধ্যে ঐ সব কার্য্য করিয়া আবার প্রভুকে খুঁজিতে বাহির হইলেন।

বাকচর, পরাণপুর, খলিলপুর গ্রামের সকল বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও নবদ্বীপ প্রভুর সন্ধান পাইলেন না। জঙ্গল, পানের বরজ, মাঠ, কাবেরী নদীর তীর সকলস্থান পাতিপাতি করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও প্রভুর কোন সাড়া পাইলেন না। শোকে দুঃখে নবদ্বীপ ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন।

নবদ্বীপ মনে ভাবিলেন, হায় হায় আমি কি করিলাম! কেনই বা সিমের রস দিলাম। না জানি প্রভুর কত কষ্ট হইয়াছে। না জানি কোথায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন। আমার কঠোর হাতে যা সহ্য হইবে প্রভুর কোমল কর্ণ মধ্যে তাহা সহ্য হইবে কেন—হায় হতভাগ্য আমি এইটুকু বুঝিতে পারিলাম না! প্রভুকে যদি না পাই তবে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। এ সেবা অপরাধের দেহ রাখিয়া কি ফল?

বাকচরবাসী ভক্তগণও বিষণ্ণ। সকলেই অনুসন্ধান করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন। প্রভু নিশ্চয়ই কোথাও আছেন কিন্তু নবদ্বীপের আর্ত্তি দেখিয়া সকলে চিন্তাযুক্ত হইলেন। সারাদিন গেল নবদ্বীপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কেবল ধূলায় পড়িয়া হা হুতাশ করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিচু সাহা ও বনমালী সাহা আসিয়া বলিলেন—নবদ্বীপদা, আপনি এত কাঁদছেন কেন—চলুন না আমরা বদরপুর যাই—প্রভু তো সেখানেও যাইতে পারেন।" সত্যই, এই কথাটি এতক্ষণ কাহারও মনে হয় নাই। নবদ্বীপকে সঙ্গে লইয়া নিচু ও বনমালী সাহা বদরপুরের দিকে রওনা হইলেন।

রাজবাড়ীর রাস্তায় উঠিয়া কোমরপুরের কাছাকাছি যাইয়া বনমালী সাহা বলিলেন, "ঐ দেখুন, বহুদূরে প্রভু আসিতেছেন।' ভক্তগণ ছুটিয়া চলিলেন। হাহাকার করিয়া নবদ্বীপ প্রভুর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। নিচু সাহা বলিলেন, "প্রভু, আপনাকে না পাইয়া নবদ্বীপদা সারাদিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কেবল ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন।"

প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "দেখ নিচু, বরেগী আমার কানে সিম পাতার গরম রস দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল আর কি।" পদতলে নবদ্বীপ ফোপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভু সহাস্য-বদনে নবদ্বীপকে হাতে ধরিয়া তুলিলেন।

সকলে বাকচরে ফিরিয়া আসিলেন। কতিপয় দিবস পরে শ্রীশ্রীপ্রভু নবদ্বীপকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় পাবনা অভিমুখে রওনা হইলেন।

শ্রীরামগোবিন্দ বাবু

রামগোবিন্দ প্রেমানন্দ-দায়ক বন্ধু।

—স্মরণমঙ্গল

ফরিদপুর রাজবাড়ীর বিশিষ্ট কায়স্থ পরিবারে শ্রীমান্ রাম-গোবিন্দের জন্ম। তাঁহার পিতা মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই জমিদার কুমারকে রামগোবিন্দবাবু বলিয়া ডাকিত। বাস্তবে কিন্তু রামগোবিন্দের জীবনে বাবুয়ানার নাম গন্ধও ছিল না।

প্রচুর পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া পূর্ণ যৌবন বয়সেও রামগোবিন্দ বাবু যেরূপ ধীর স্বভাব, পরিমিতব্যয়ী ও অনাড়ম্বর বেশভূষাবিশিষ্ট ছিলেন, সেরূপ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সংযম ও বিনয়ের সঙ্গে ধনসম্পত্তির মিলন শ্রীরামগোবিন্দে প্রবাদ বাক্যের মত সত্য হইয়াছিল।

বিষয় কার্য্য উপলক্ষে রামগোবিন্দ বাবু মাঝে মাঝে রাজবাড়ী হইতে পাবনা যাতায়াত করিতেন। আজ কোনও কাজের তাগিদ ছিল না। তবু এক অদৃশ্য-শক্তির প্রেরণায় তিনি পাবনা রওনা হইয়াছেন। কুষ্টিয়া হইতে ষ্টীমারে চাপিয়া এক কোণে আপনমনে বসিয়া আছেন।

বাল্যাবধি অনন্তের অনুসন্ধানে রামগোবিন্দের মন উদাস হইয়া যাইত। আজ. উর্দ্ধে মেঘমুক্ত নীলাকাশ, নিম্নে কীর্ত্তিনাশিনীর জলরাশি। মাঝে বসিয়া তাঁর মন অসীমের ভাবগহনে ডুবিয়া

"রামগোবিন্দ প্রেমানন্দ-দায়ক বন্ধু"

শ্রীরামগোবিন্দ দাস

আসিল। ঠিক তখন পার্শ্ববর্ত্তী দুইজন অপরিচিতের কথোপকথন তাঁহার কর্ণে অজানার সন্ধান আনিয়া দিল।

"পাবনা সহরের প্রান্তে পড়িয়া থাকে ক্ষেপা। সাক্ষাৎ শিবের মত ভস্মভরা দেহ। তাঁর কার্য্যকলাপ অদ্ভুত। অপূর্ব্ব তাঁর হাবভাব ভঙ্গি। কোন সম্প্রদায়ের সাধু নয় অথচ সকলের গভীর ভক্তির পাত্র। প্রথম দর্শনে আসিবে ঘৃণা, নিবিড় পরিচয় হইলে জানা যাইবে ছাই চাপা আগুন এক মহা তপস্বী।"

কথাগুলি অন্তরে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধিৎসা জাগাইল ও ভাবুকতায় আবর্ত্ত সৃষ্টি করিল। রামগোবিন্দের চরিত্রে দুইটি মহৎ গুণ। সত্যানুসন্ধিৎসা ও ভাবুকতা। এই গুণের ফলে তিনি জীবনে বহু সজ্জনের কৃপাসঙ্গ লাভ করিয়াছেন এবং অবশেষে ভাবের ঠাকুর বন্ধুধনকে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

পাবনা সহরে পেঁাছিয়াই শ্রীরামগোবিন্দ বুড়োশিবের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পথে দু'চারজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলেন ক্ষেপাকে না চেনে এমন লোক নাই কিন্তু সে যে কোথায় আছে তাহা ঠিক করিয়া বলিবার মত লোক মেলা ভার।

অনেক ঘুরিয়া রামগোবিন্দ এক বৃদ্ধ বটবৃক্ষের তলদেশে পেঁাছিলেন। দেখিলেন একটি অগ্নিকুণ্ড ঘিরিয়া বসিয়া কতগুলি লোক গঞ্জিকা সেবন করিতেছে। হাসি ঠাট্টার হুল্লোড় উঠিয়াছে। অদূরে একখানি ছিন্নকন্থা গায়ে জড়াইয়া আপনমনে এক পাগল বসিয়া আছে। জহুরী রামগোবিন্দ চিনিলেন—ইনি বুড়োশিব হইবেন।

যে লোকগুলি ধূমপানে মত্ত তাহাদের সঙ্গে ক্ষেপার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহারা তার অগ্নিকুণ্ড হইতে অগ্নি লইতেছে এই মাত্র। ক্ষেপা আপনমনে হাসে, বিড়বিড় করিয়া কথা কয়, চক্ষু বুজিয়া অজানা রাজ্যে চলিয়া যায়। বুদ্ধিমান রামগোবিন্দ ক্ষ্যাপার ভাব দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন। ভাবিলেন এত বহিরঙ্গ লোকের মধ্যে আলাপ করিলে ওঁর স্বরূপ ধরা যাইবে না। নির্জ্জনে একাকী চাই। দূর হইতে অবনত হইয়া রামগোবিন্দ স্বগত ভাবে ক্ষেপাকে বলিলেন—"শুনিয়াছি আপনি একস্থানে বেশীক্ষণ থাকেন না। দয়া করিয়া এই জীবাধমের জন্য অদ্যকার রাত্রি এখানে অপেক্ষা করিবেন।" রামগোবিন্দের বিশ্বাস এই প্রার্থনা সাধুরা জানিতে পারেন।

গাঢ় অন্ধকারে

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।

—শ্রীগীতা

মণির আলো অন্ধকারেই দেখা যায়। কাননের কুসুম অন্ধকারেই ফুটে। আকাশে নক্ষত্ররূপে অগণিত ব্রহ্মাণ্ড। সূর্য্যালোক তাহা ঢাকিয়া রাখে, অন্ধকারই প্রকাশ করে। রাম-গোবিন্দ অন্ধকারের অপেক্ষায় রহিলেন।

মন্দিরে মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিল। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার গাঢ়তর হইল। একে তো বিরহিণী রজনী, তাহাতে বটবৃক্ষের

তলদেশ। ঘনসন্নিবিষ্ট পত্ররাজি আতপত্রের মত নক্ষত্রের ক্ষীণালোককেও বাধা দিতেছিল। এমন সময় সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া দুইটি সৌম্যমূর্ত্তি।

ঘনঘটা দর্শনে ময়ূরের যে অবস্থা, নিবিড় তমোরাশি দর্শনে ক্ষেপার সেই অবস্থা। উন্মাদ ক্ষেপা হাত তুলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছে। আর মুখে "জগারে জগা জগারে জগা" বলিতেছে। তাঁহার কণ্ঠ-ধ্বনি আর নৃত্যময় চরণের তাল-ধ্বনি যেন ত্রিজগতের অমঙ্গল নাশ করিতেছে।

রামগোবিন্দ ঐ "জগারে জগা" বুলির কোন অর্থ বুঝিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু চক্ষে যাহা দেখিতেছিলেন তাহাতে প্রতি মুহূর্ত্তে বিস্ময়সাগরে ডুবিতেছিলেন। রামগোবিন্দ দেখিলেন একদল বালিকা ক্ষেপাকে ঘিরিয়া নাচিতেছে। তাহাদের কটিতে ঘাগরা, পায়ে নূপুর, হাতে থালা। থালার উপর ঘৃতের বাতি। নটিনীদের ফণীর মত বেণীগুলি দুলিতেছিল।

হঠাৎ তাহারা অন্তর্হ্ণিতা হইল। অন্ধকারের মধ্যে রামগোবিন্দ ক্ষেপার উজ্জ্বলমূর্ত্তি দেখিলেন, অমনি চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। "তুই কে রে" বলিয়া ক্ষেপা রামগোবিন্দের হাত ধরিয়া তুলিল। "আমি একটি জীবাধম, আমায় দয়া করুন" যুক্তকরে রামগোবিন্দ উত্তর করিলেন।

ক্ষেপা হাতড়াইয়া একটা দেশলাই লইল। মোমবাতি ধরাইয়া রামগোবিন্দের মুখ চাহিয়া চিরপরিচিতের মত কহিল— "তুই এখন কেন এলি? এখন যে আমার আরতির সময়।" ক্ষেপার স্পর্শে রামগোবিন্দ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তব্ধ।

"তুই ভগবান্ দেখবি ? আয় তোকে ভগবান্ দেখাই" বলিয়া ক্ষেপা রামগোবিন্দের হাত ধরিয়া চলিল। একটি ইষ্টকের স্তূপ ডিঙ্গাইয়া অপর দিকে গেল। সজোরে দুইটী বড় বড় পাথরখণ্ড উল্টাইয়া দিল। বাহির হইল একটি সুড়ঙ্গের মুখ। ক্ষেপা আগে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিল। "আয়" বলিয়া রামগোবিন্দকে ডাকিল।

"দাঁড়া, আরতিটা করে নেই" ক্ষেপার আদেশে রামগোবিন্দ সুড়ঙ্গের মধ্যে চিত্রের মত দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষেপা মোমবাতি ঘুরাইতে লাগিল।

হঠাৎ রামগোবিন্দ দেখিলেন, যেখানে ক্ষেপার আরতি ঘুরিতেছে সেখানে একজন স্বর্ণকান্তি পুরুষ-শ্রেষ্ঠ উপবিষ্ট। কর্ণ-স্পর্শি ঢল ঢল চক্ষুদুটি হইতে করুণার ধারা প্রবাহিত। মুখ-ভানুর রাঙ্গা ঝলক রামগোবিন্দের হৃদয় স্পর্শ করিল।

রামগোবিন্দ ভূমিষ্ঠ হইলেন। মনে পড়িল আর একদিনের কথা। রাজবাড়ী ষ্টেসনে একখানা প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর মধ্যে দেখিয়াছিলেন এই মূর্ত্তিখানি। মুহূর্ত্তের জন্যই দেখিয়াছিলেন—কিন্তু অঙ্কিত আছে চিত্তপটে।

যাঁর জন্য নাওডুবির ভুবন ঘোষ ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া বনজঙ্গলে থাকে—এই সেই প্রভু জগদ্বন্ধু—রামগোবিন্দের মনে পড়িল। ভুবন রামগোবিন্দের দূর সম্পর্কীয় ভাই। শ্রীমুখ দর্শনে ভুবনের কথা স্মরণে আসিল রামগোবিন্দের। "হারে বাবুজী, কি ভাবছিস্ রে" সুগম্ভীর স্বরে ক্ষেপা কহিল।

"ভগবান দেখলি তো ! ইনি আমার ভগবান। এই ব্রজের সম্পদ, নদীয়ার মণি, এই আমার জগা। সব ছেড়ে দে, এই

চরণে শরণ নে, ধন্য হ।” বলিতে বলিতে আলো হাতে ক্ষেপা সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিল। রামগোবিন্দ অনুসরণ করিল।

ক্ষেপা বসিল একখণ্ড পাথরের উপর। রামগোবিন্দ পাদ-মূলে। অন্ধকার ঘুচিল। জীবনদেবতা জাগিল। দিগ্‌বধূর কপোলে অরুণের রক্তিমা ফুটিল। বিহগ কূজনে আগমনী গীতি উঠিল। রামগোবিন্দের কণ্ঠে “জয় জগদ্বন্ধু ধ্বনি” অম্বর ভেদিয়া ছুটিল।

আর্ত্তিভরা শরণাগতি অন্তর রাজ্যে মধুধারা ঢালিল।

ভক্তের জন্য প্রভুর আর্ত্তি

ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়।

—শ্রীবৃন্দাবন দাস

প্রভুবন্ধু পাবনা কালাচাঁদপাড়া একটি নির্জ্জন গৃহে আছেন। সঙ্গে দাস নবদ্বীপ। আজ কাহার যেন একখানি চিঠি আসিয়াছে। তাহা পাওয়া অবধি প্রভুর বদন বিষাদযুক্ত। যেন কোন বিপদে পড়িয়াছেন। নরলীলায় অদ্ভুত বৈচিত্র্য!

রমেশচন্দ্রের পিতা মাতা জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার কার্য্যের ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা তাঁহাকে তান্ত্রিক দীক্ষা লওয়াইয়া ও বিবাহ দিয়া সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। প্রভুর সঙ্গে যাহাতে রমেশের দেখা-সাক্ষাৎ না হয় এমন কি চিঠি-পত্রের আদান-প্রদানও না হয়

তাহারা সেইরূপ চেষ্টা করিতেছে। এই সংবাদে ভক্তবৎসল ব্যথিত হইয়াছেন।

রমেশচন্দ্র তখন ফরিদপুর ঈশান স্কুলের শিক্ষক। রমেশ যে ছাত্রদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য তপশ্চর্য্যা প্রচার করে, তাহা স্কুলের শিক্ষকগণ ও ছাত্রগণের অভিভাবকগণ কেহই সুনজরে দেখেন না। রমেশের প্রভাব যত বাড়ে, বিরোধী দলের বিরুদ্ধতাও তত বাড়ে। শেষ পর্য্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, রমেশচন্দ্রের ফরিদপুর থাকা অসম্ভব হইয়াছে। ইহা জানিয়া ভক্তবশ ভগবান চির ভাস্কর হইয়াও মলিন হইয়াছেন। প্রভু মুখে কিছু বলেন না। তাই নবদ্বীপ কিছু বুঝিতেছেন না। কিন্তু প্রভু যে কোন প্রিয় ভক্তের চিন্তায় কাতর ইহা বুঝিতে নবদ্বীপের বিলম্ব হয় নাই। "চল বরেগী" বলিয়া প্রভু একদিন নবদ্বীপকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। কোথায় যাবেন নবদ্বীপ জানেন না। ইঙ্গিতমত চলিতে লাগিলেন।

গোয়ালন্দ পেঁ ৗছিয়া টেপাখোলার জন্য একখানি নৌকা ভাড়া করিলেন। নবদ্বীপ বুঝিলেন, প্রভু ফরিদপুর যাবেন। কিন্তু এ পথে কেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

দিন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। প্রভুর আহার হয় নাই। নবদ্বীপ একটি নূতন হাঁড়ি কিনিয়া তাহাতে দোকান হইতে রসগোল্লা কিনিয়া আনিলেন। প্রভুর যতটা গ্রহণ করা সম্ভব তাহা অপেক্ষা অধিক আনিলেন। অন্তরের ইচ্ছা, প্রভু গ্রহণ করিলে যাহা অবশেষ থাকিবে তাহা নিজে পাইবেন। কারণ তিনি নিজেও অত্যন্ত ক্ষুধাতুর ছিলেন।

নৌকায় উঠিয়া প্রভু নবদ্বীপের হাত হইতে রসগোল্লার হাঁড়িটি লইলেন। নিজে সামান্য কিছু গ্রহণ করিয়া বাকী রসগোল্লাসহ হাঁড়িটি জলে ভাসাইয়া দিলেন। ঐ সময় নবদ্বীপ দাসের আহারাদি সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম ছিল। মিষ্টি, ঝাল এমন কি লবণ পর্য্যন্ত খাওয়া নিষেধ ছিল। অপরাহ্নে নৌকা টেপাখোলা পৌঁছিলে প্রভু নবদ্বীপকে চিড়া কিনিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা পালিত হইল।

অভিনব রূপের বিলাস

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥

—শ্রীকৃষ্ণদাস

টেপাখোলায় পদ্মা তখন খরস্রোতা। পদ্মার তীর খুব নির্জ্জন। এখন পদ্মা মরিয়া গিয়াছে। আশেপাশে জনমানবের বসতি রহিয়াছে। নদীর দক্ষিণতীরে অর্থাৎ ফরিদপুরের দিকে নৌকা লাগিয়াছিল। অপরতীরে একটি বিস্তৃত চড়া-ভূমি ছিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রভু বলিলেন, "নবদ্বীপ, আমাকে ওপারে রাখিয়া আয়। একঘণ্টা পরে গিয়া আবার লইয়া আসিবি।" নবদ্বীপ প্রভুর আদেশ মত কাজ করিতে মাঝিদের বলিলেন। মাঝিরা প্রভুকে ওপারে চড়ায় রাখিয়া আবার নৌকা এপারে লইয়া আসিল। প্রভু একা রহিলেন বলিয়া নবদ্বীপ এপার হইতে পুনঃ পুনঃ প্রভুর দিকে দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন।

প্রভু আপন চারিহস্ত বিরাট দেহ উন্মুক্ত করিয়া চড়ায় বেড়াইতে লাগিলেন। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তাভ-কিরণ-মালার সঙ্গে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের বর্ণ মিশিয়া গিয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকটিত হইল। সৌন্দর্য্যের ছটা দশদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ক্রমে নদীর দক্ষিণতীরে এক দুই করিয়া বহুলোক জমিয়া গেল। যে দেখিল সে আর নড়িতে পারিল না। মুগ্ধ স্তম্ভিত হইয়া অপলক নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। দর্শকগণের মধ্যে নবদ্বীপ নিজেও আছেন। তাঁহার মনে হইতেছিল গগনে আর নদী-সৈকতে দুইটি সূর্য্য পরস্পরের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। ভয়ে যেন পরাভূত হইয়া গগনের ভানু ডুবিয়া গেল।

সূর্য্য ডুবিয়া গিয়া সন্ধা একটু গাঢ় হইলে শোভা আরও বাড়িয়া গেল। দিবাকর যেন নিশাকর হইয়া গেল। অন্ধকার ভেদ করিয়া সে নিশানাথের স্নিগ্ধ কিরণমালা সকলের নয়নে পরাতৃপ্তি আনিয়া দিল। অগণিত নরনারী দর্শক। তাহারা নদীর অপর তীর হইতে দেখিতেছে। সকলের মুখে একটি কথা—সোনার গৌর! সোনার গৌর!!

নবদ্বীপ দাস তাঁহার কড়চাতে লিখিয়াছেন—"বন্ধুসুন্দরের উন্মুক্ত দেহলাবণ্য আরও কয়েকদিন দেখিবার ভাগ্য হইয়াছে কিন্তু সেদিন যেমনটি দেখিয়াছিলাম তেমনটি আর জীবনে দেখি নাই, কেহও কোনকালে দেখে নাই। "অহো! কি রূপ দেখিনু!"

রূপ-সুধা আস্বাদন করিতে করিতে দাস নবদ্বীপের হঠাৎ মনে হইল বোধ হয় একঘণ্টা অতীত হইয়া গিয়াছে। আদেশানুযায়ী

মাঝিদের লইয়া ওপারে যাইয়া বন্ধুসুন্দরকে লইয়া আসিলেন। নৌকায় প্রবেশ করিয়াই প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ গাত্র ঢাকা দিয়া সেই জ্যোতিরাশি যেন কোথায় লুকাইয়া ফেলিলেন। নবদ্বীপ এমন মোহন-মাধুরী দর্শনে বঞ্চিত হইয়া ও অপরকে বঞ্চিত করিয়া দুঃখবোধ করিতে লাগিলেন।

ভক্তের খোঁজে ব্যর্থপ্রয়াস

দক্ষিণ তীরে পৌঁছিয়া প্রভু কহিলেন "নবা, লক্ষ্মীপুর হইতে তারক গুহকে ডাকিয়া আন। শীঘ্র আসবি।" নবদ্বীপ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। গুহ মহাশয় প্রভুর কথা শোনামাত্র ছুটিয়া আসিলেন। গুহ মহাশয়ের সহিত প্রভুর কি কথা হইল তাহা তাঁহারাই জানেন।

কিছুক্ষণ পরে গুহ মহাশয় প্রভুকে লইয়া ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাসায় পৌঁছিলেন। প্রভুকে বাসা দেখাইয়া দিয়া গুহ মহাশয় বিদায় হইলেন। নবদ্বীপ দাস ছায়ার মত কাছে রহিলেন।

"রমেশচন্দ্রকে দুটি কথা শুনিবার জন্য ডাকিয়া দিতে হইবে।" এই কথা প্রভু যোগেন্দ্রবাবুকে বলিলেন। যোগেন্দ্রবাবু তাহার নিজ প্রয়োজনে ডাকিতেছেন এইরূপ ভাবে যেন লোক পাঠান। আজ্ঞানুযায়ী বিদ্যাভূষণ মহাশয় রমেশচন্দ্রের বাসায় একজন চাপরাসী পাঠাইলেন। বন্ধুসুন্দর নবদ্বীপ সহ একটি প্রকোষ্ঠে নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্যোতিষচন্দ্র অতীব হুশিয়ারী লোক! যোগেন্দ্রবাবু প্রভু জগদ্বন্ধুর প্রিয়, অতএব এই ডাকের মধ্যে প্রভুর কোন গন্ধ থাকিতে পারে এইরূপ মনে করিয়া চাপরাসীর সঙ্গে রমেশকে না পাঠাইয়া তিনি নিজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যোগেন্দ্রবাবু আর কী করেন! অনেকদিন দেখিনা তাই রমেশকে দেখিবার ও কীর্ত্তন শুনিবার ইচ্ছা হইল এইকথা বলিয়া কোনমতে জ্যোতিষবাবুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনিও, 'রমেশ অসুস্থ' এই দুই শব্দে চরম উত্তর দিয়া বিদায় লইলেন। ভক্তের অভিসারে আসিয়া ভগবান ভগ্ন হৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন। বুঝি ব্যর্থতা না হইলে প্রেম সার্থক হয় না, তাই এ অদ্ভুত লীলা। লীলাখেলা দেখিয়া দাস নবদ্বীপ উজ্জ্বলনীলমণির বিখ্যাত শ্লোক মৃদুস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন।— নায়ক ভেদ—১২

সঙ্কেতীকৃত কোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো
দ্বারান্মোচন লোলশঙ্খবলয়ক্কাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্‌ভজরতীবাক্যেন দূনাত্মনো
রাধাপ্রাঙ্গণ কোলিবিটপি ক্রোড়ে গতা শর্ব্বরী॥

শ্রীরাধার শয়ন গৃহের কোণে একটি বদরী বৃক্ষ আছে। প্রিয়ার সহিত মিলন বাসনায় শ্যামসুন্দর রাত্রিকালে ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে কোকিলের মত শব্দ করিয়া শ্রীরাধাকে সঙ্কেত করিতেছেন। সঙ্কেত বুঝিয়া শ্রীরাধাও উঠিয়া গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে করস্থিত শঙ্খবলয়ের ধ্বনি উত্থিত হইল। উহা

কর্ণগোচর হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বাড়িয়া উঠিল, কিন্তু গৃহান্তরে সুপ্তা জটিলার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল ঐ শব্দে। কেএ কেএ বলিয়া বৃদ্ধা চিৎকার করিয়া উঠিল। ঐ শব্দে উভয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে জটিলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মনে করিয়া কৃষ্ণ আবার ঐরূপ সঙ্কেত করিলেন। শ্রীরাধা সঙ্গেত বুঝিয়া দ্বার খুলিতে গেলেন, আবার শব্দ হইল। আবার বৃদ্ধা কেএ কেএ বলিয়া উঠিল। এই ভাবে নাগরের সমস্ত রজনী বদরী বৃক্ষমূলে কাটিয়া গেল। মিলন আর হইল না।

কবিরাজের কলাবাগানে

নবদ্বীপসহ টেপাখোলা ফিরিয়া বন্ধুসুন্দর নৌকা বিদায় দিলেন। পদব্রজে ব্রাহ্মণকাঁদা অভিমুখে রওনা হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে গেলেন না। ভক্তবর নিত্যানন্দ দাস কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গোয়ালচামট ও ব্রাহ্মণকান্দা এই দুই গ্রামের সংযোগস্থলে কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী। কবিরাজ মহাশয়ের পূর্ব্ব নাম নিবারণ। নিত্যানন্দ নাম প্রভু প্রদত্ত। নিতাই কবিরাজ নামেই কবিরাজ মহাশয় প্রসিদ্ধ।

কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীর দক্ষিণপূর্ব্ব কোণের দিকে বেশ একটা বড় রকমের বাগানবাড়ী আছে। বর্ত্তমানে ঐ স্থান

জঙ্গলাকীর্ণ। তৎকালে প্রকাণ্ড কলাবাগান ছিল। বাগানের মাঝখানে একখানি খড়ের ঘর ছিল। কবিরাজের বাড়ী আসিয়া প্রভুবন্ধু ঐ ঘরখানি থাকিবার জন্য বাছিয়া লইলেন।

ঘরখানি খুব ছোট ছিল। শয়ন করিতে হইলে চারিহস্ত পুরুষের বামন অবতার হওয়া ছাড়া আর কোন গতি ছিল না। তবে প্রভু প্রায়ই ঘরে থাকিতেন না। সারারাত্রই জাগিয়া বেড়াইতেন। এই সময় হইতে নৈশ ভ্রমণ খুব বাড়িয়া গেল।

অধিকাংশ রাত্রই যশোর রোডে, রাজবাড়ীর রাস্তায়, মেলার মাঠে, গোবিন্দপুরের শ্মশানে, তুলাগায়ের মাঠে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। কখনও নবদ্বীপদাস, কখনও গোয়ালচামটের কেদারশীল, কখনও সহরের বালকভক্তগণ নৈশ ভ্রমণের সঙ্গী হইতেন। কখনও বা কাহাকেও সঙ্গী না লইয়া একাকী আপনমনে বেড়াইতেন।

অভিনব কৃপার ধারা

যাঁহারে জানাও সেই জানে গো
সাধন দুর্লভ তুমি। —শ্রীমহেন্দ্র

কবিরাজের কলাবাগানের গৃহে প্রভু একা আছেন। বিশেষ কোন প্রয়োজনে নবদ্বীপকে বাকচর পাঠাইয়াছেন। সকাল-বেলার গাড়ীতে কলিকাতা হইতে চম্পটী মহাশয় আসিয়াছেন। সঙ্গে পরম দর্শনধারী একটি যুবক। যুবকটি কলিকাতা শোভা-

বাজারের রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র। নাম কুমার মণীন্দ্র দেব বাহাদুর।

কুমার বিলাসী বাবু। গাড়ী ছাড়া পদব্রজে পথ চলেন না। আজ ষ্টেসন হইতে কলাবাগান সুদীর্ঘ পথ পদব্রজেই আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর দর্শনের প্রবল ইচ্ছা লইয়া আসিয়াছেন। এই ইচ্ছাটি জাগাইয়াছেন চম্পটী ঠাকুর। কেমন করিয়া জাগাইয়াছেন তাহা বলা যাইতেছে।—

যাদুমণি বাইজী

বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভবক্লেশ॥

—শ্রীকৃষ্ণদাস

কলিকাতা সোনাগাছির বারবণিতাগণ চম্পটীঠাকুরকে খুব ভক্তি করিত। বারবণিতা পল্লীতে হরিনাম প্রচার করিবার অদ্ভুত শক্তি ছিল চম্পটীঠাকুরের। শুনিয়াছি কোন সময় প্রভু নিজে বলিয়াছিলেন—একমাত্র চম্পটীরই ঐ কার্য্যে অধিকার আছে।

চম্পটী মহাশয়ের প্রভাবে অনেক বারবণিতার জীবনের গতি ফিরিয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে যাদুমণি বাইজীর নাম উল্লেখযোগ্য। অপবিত্র পথ পরিত্যাগ করিয়া তিনি হরিভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। যাদুমণি সুকণ্ঠি গায়িকা ছিলেন। কোন সময় চম্পটী মহাশয় তাহাদ্বারা শ্রীশ্রীপ্রভু রচিত একটি পদ গ্রামফোনে রেকর্ড করাইয়াছিলেন।

একদিন যাদুমণি চম্পটীঠাকুরকে বলিলেন—"হরিবোল! অনেকের মদ খাওয়া ত ছাড়াইলেন, আমার বাবুটিকে ভাল করিয়া দেন না কেন ?" চম্পটী বলিলেন, "তোমার বাবুকে আমার সঙ্গে দেখা করাইয়া দিও, আমি তাকে এমন ঠাকুরের কাছে লইয়া যাইব, যিনি তাকে সকল দোষশূন্য করিয়া দিবেন।"

একদিন যাদুমণি চম্পটীঠাকুরের সঙ্গে তাহার বাবুর আলাপ করাইয়া দিলেন। যাদুমণি তাহার বাবুকে বলিলেন, "হরিবোল যাহা বলেন তাহাই করিবেন, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে।"

"কি করিতে হইবে বলুন, চম্পটী মহাশয় ?"

"আমার সঙ্গে ফরিদপুর যাইতে হইবে।"

সেখানে গেলে কি হইবে ?"

"প্রভুর দর্শন হইবে।"

"প্রভু কে ?"

"পতিতপাবন মহাউদ্ধারণ জগদ্বন্ধু হরি।"

"আমি তাঁহার দর্শন পাইব ?"

"নিশ্চয় পাইবেন।"

"তবে চলুন।"

চম্পটী মহাশয়ের বাক্যের মধ্যে একটা শক্তি ছিল। বাবু যন্ত্রচালিতের মত তাঁহার সঙ্গী হইলেন। রাত্র দশটায় কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া রাজবাড়ী গাড়ী বদলাইয়া সকালবেলা ফরিদপুর পৌঁছিয়াছেন। এই বৎসরই পাচুড়িয়া হইতে ফরিদপুর রেল লাইন খোলা হয়।

এই বাবুই উক্ত কুমার মনীন্দ্র দেব বাহাদুর। কুমারের চরিত্রের কথা আর কি বলিব, ট্রেণে রাত্রের খোরাকের জন্যও একটি বোতল সঙ্গে আনিয়াছেন—ইহা বলাই যথেষ্ট।

"মাথাটা মুড়িয়ে দে"

প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ যাহ সনাতন।

—শ্রীকৃষ্ণদাস

কলাবাগানে প্রভু যে ক্ষুদ্র গৃহে ছিলেন উহা খড়ের চৌচালা ঘর। চারিদিকে বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া। দরজাতে একটি ঝাপ। ঝাপের আড়ালেই প্রভুবন্ধু বসিয়া আছেন। কয়েক বার হাতে তালি দিলেন। চম্পটী মহাশয় বুঝিলেন, প্রভু ডাকিতেছেন। নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন।

"কে, অতুল এসেছিস? আর কে এসেছে?" চম্পটী মহাশয় বলিলেন, "একজন বড় লোকের ছেলে। শোভা বাজারের রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাতি কুমার মণীন্দ্র দেব বাহাদুর। উনি আপনার দর্শন প্রার্থী। খুব কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন।"

একটু পরে শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "অতুল, অভয়কে ডেকে ওর মাথাটা মুড়িয়ে দে।" চম্পটী মহাশয় মৃদুস্বরে কহিলেন, "দর্শন কখন হবে?" প্রভু উত্তর করিলেন না। প্রভুর কথার উপর কথা বলিবার শক্তি কাহারও ছিল না। তবু চম্পটীঠাকুর সময় সময় বলিতেন। কিন্তু আদেশের মধ্যে যে সুর ছিল

তাহাতে চম্পটী বুঝিলেন ঐ বাক্য অন্যথা করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই।

চম্পটী তখন প্রভুর আদেশ কুমার বাহাদুরকে জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। কুমার বলিলেন, "চম্পটী মহাশয় বলুন, প্রভু কি বলিলেন, দর্শন কখন হইবে?" চম্পটী নীরব। কুমার ব্যস্ততার সহিত বলিলেন "বলুন না, কি বলিলেন।" "প্রভু আপনার মস্তক মুণ্ডন করিতে বলিয়াছেন।" চম্পটীর মুখে এই কথা শুনিয়া কুমার কহিলেন, "বেশত, প্রভু যখন মস্তক মুণ্ডন করিতে বলিয়াছেন, তখন অবশ্যই করিব আপনি নাপিত ডাকুন।"

চম্পটী মহাশয় ভাবিয়াছিলেন মাথা মুড়াইবার কথা শুনিয়া বিলাসীবাবু হয়ত চটিয়া যাইবেন, কিন্তু ঐরূপ আগ্রহ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরামাণিকের উদ্দেশ্যে তিনি যশোহর রোডের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠিক তখনই অভয় শীল খোড়াইতে খোড়াইতে ক্ষৌর কার্য্যের যন্ত্রপাতি লইয়া সেই দিকে আসিতেছেন।

অভয় প্রভুর ভক্ত হইলেও চম্পটীর সঙ্গে পূর্ব্ব হইতে কোনরূপ জানাশোনা ছিল না। প্রভুর আদেশ মত বিনা চেষ্টায় অভয়কে পাইয়া চম্পটী মহাশয় বিস্মিত হইয়া ডাকিয়া আনিলেন। অভয় প্রাঙ্গণে আসিতেই কুমার বাহাদুর বলিলেন, "চম্পটী মহাশয় পরামাণিক এনেছেন!" "হাঁ, এই যে ইনি পরম ভক্ত লোক" বলিয়া চম্পটী অভয়কে দেখাইয়া দিলেন।

কুমার গায়ের জামা খুলিয়া অভয়ের সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন। বড়লোকের ছেলে, গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুন্দর স্বাস্থ্য,

মাথার চুল ঘন চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ, তাহাতে সৌখীন সীঁথির ও সুগন্ধির বাহার। সত্যই ক্ষৌরী হবেন, না বাবু কোন রহস্য করিতেছেন ভাবিয়া অভয় অবাক হইয়া রহিল।

কুমার অভয়কে অভয় দিয়া কহিলেন, "নিঃসঙ্কোচে আমার মাথা মুড়াইয়া দেও।" চম্পটী নিজেই জল আনিয়া দিলেন। যন্ত্রাদি ধার দিয়া কাজ আরম্ভ করিতে অভয়ের যেটুকু বিলম্ব হইতেছিল কুমার বাহাদুরের তাহাও যেন সহ্য হইতে ছিল না। তাহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, মস্তক মুণ্ডন হইলেই দর্শন পাইব। দর্শন লালসার তীব্রতা সামান্য বিলম্বকেও অসহনীয় করিয়া তুলিতেছিল।

"কলিকাতা চলিয়া যাও"

অভয় কুমারের মস্তক মুণ্ডন করিতেছেন। অৰ্দ্ধেক মস্তক কামান হইয়াছে। প্রভুর গৃহ হইতে আবার করতালির শব্দ আসিল। ইঙ্গিতজ্ঞ চম্পটীঠাকুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহাভ্যন্তর হইতে গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ আসিল—"এই এক্ষণি এই অবস্থায় ওকে নিয়া কলিকাতা চলিয়া যাও। এক জায়গায় বসিও না। কলিকাতা না যাওয়া পর্য্যন্ত আলাপ করিও না।"

প্রভুর কঠোর আদেশ শুনিয়া চম্পটী হতভম্ভ হইয়া গেলেন। কী সর্ব্বনাশ! অমন সুন্দর চুল ফেলিয়া মস্তক মুণ্ডন করিল প্রভুর দর্শন পাবে বলে, আর দর্শনের কথাটী নাই: এই অবস্থায়

কলিকাতা ফিরিয়া যাইবার কথা বলিলেন কী করিয়া, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চম্পটী বিমর্ষভাবে আসিয়া কুমার বাহাদুরের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ততক্ষণ মস্তক মুণ্ডন শেষ হইয়াছে। প্রভু যাহা বলিলেন তাহা যে না করিয়া গত্যন্তর নাই চম্পটী তাহা ভালই জানিতেন। চম্পটী মহাশয়ের নীরবতা দেখিয়া কুমার বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু কি বলিলেন ? এখন দর্শন হইবে ? স্নান করিয়া আসিব ?" চম্পটী মহাশয় কোন কথারই উত্তর দিতেছেন না। কুমার পুনরায় কহিলেন, "প্রভু যাহা বলিয়াছেন, আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন, আমি তাহাই করিব।"

তখন চম্পটী মহাশয় মুখ খুলিলেন, "প্রভু বলিলেন, এই অবস্থায় আমাকে আপনাকে কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে। পথে গাড়ীতে আমাদের এক জায়গায় বসা নিষেধ। আপনার সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আদেশ।"

কুমার বাহাদুর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, একটু খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "চলুন তাহাই হইবে।"

এত কৃপা কেন করিলেন!

আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজবল।
পতিত পাবন নাম তবে সে সফল॥

—শ্রীসনাতনোক্তি

দ্বিপ্রহরের গাড়ী ধরিয়া চট্টগ্রাম মেইল ট্রেণে কুমার বাহাদুর সহ চম্পটীঠাকুর কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর প্রকোষ্ঠে বসিয়া কুমার নীরবে আপন মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। আত্মচিন্তা তাহার জীবনে এই প্রথম। একবার চোখের জলে ভাসাইয়া, একবার অনুতাপানলে পোড়াইয়া প্রভু তাহাকে খাঁটি সোনা তৈয়ারী করিলেন।

"অন্তর্য্যামী ঈশ্বরেরর এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥"

কলিকাতা পৌঁছিয়া কুমার বাহাদুর চম্পটীঠাকুরকে বলিলেন, "চম্পটী মহাশয়, বলুল ত আপনার প্রভু আমাকে এত কৃপা কেন করিলেন ?" কুমার কিভাবে কথা বলিতেছেন তাহা ঠিক ঠিক বুঝিতে না পারিয়া চম্পটীঠাকুর বলিলেন, "আপনার কি মনে হয় ?" কুমার তখন আবেগভরে কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন।—

"আমি মহাপাপী, আমার সময় হয় নাই, তাই প্রভু আমাকে দেখা দিলেন না। কিন্তু, চম্পটী মহাশয়, আপনার প্রভু যে কত বড় তাহা আজ আমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কি আর বলিব, চম্পটী মহাশয়, আমি শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাতি, আমার বাড়ীতে কত সাধু-সন্ন্যাসী গড়াগড়ি যায়। আমি দেখা করিতে গিয়াছি জানিতে পারিলে গেট

সাজাইয়া মালা লইয়া অভ্যর্থনা করিবে না এমন সাধু-আশ্রম বাংলা ভারতে কমই দেখিয়াছি। আর, সেই-আমাকে আপনার প্রভু যেরূপ মাথা মুড়াইয়া তাড়াইয়া দিলেন তাহাতে তাঁহার প্রভুত্ব যে কত বড় ও অসাধারণ, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করাইয়া দিয়াছেন।

"চম্পটী মহাশয়, কি আর বলিব, আমার মত মহাপাতকীকে প্রভু দেখা দিবেন কেন ? আপনাকে বলি, আমার বাড়ীতে যে বড় চৌবাচ্চাটা আছে উহার তিন চৌবাচ্চা মদ আমার পেটে আছে ! এত জঘন্য পাপ আমি জীবনে করিয়াছি—যাহা প্রকাশ করিতেও ঘৃণা বোধ হইতেছে। প্রভু মহা পতিতপাবন। তাই এত বড় পাপী জানিয়াই আমাকে এত কৃপা করিয়াছেন !"

"চম্পটী মহাশয়, আপনার প্রভু যে আমার কথা মনে করিয়া কিছু আদেশ করিয়াছেন, ইহাতেই তো আমি তাঁহার অন্তরে স্থান পাইয়া গিয়াছি। আমা হেন ব্যক্তিকে মনে স্থান দিয়া, আমাকে আদেশ জ্ঞাপন করিয়া আপনার প্রভু কী যে অপার করুণার পরিচয় দিয়াছেন তাহা আর কি বলিব !"

কুমার বাহাদুর কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্রুধারায় জন্ম-জন্মান্তরের কালিমারাশি মুছিয়া গেল। নবজীবন লাভ হইল। প্রভুবন্ধুকেই ধ্রুবতারা করিয়া বাকী জীবনধারা পরম পবিত্রতার প্রবাহে বহিয়া চলিল। পতিতপাবনের করুণার অভিনব কৌশল দেখিয়া চম্পটী মহাশয় বগল বাজাইয়া "হরি হরিবোল" বলিয়া নাচিতে লাগিলেন।

"তাত পীতাম্বর"

ভক্ত লাগি প্রভু সহেন কত তাপ,
আদরে কারে বা বলেন খুড়ো বাপ।

—শ্রীগোপাল মিত্র

কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু রামবাগানে অবস্থান করিতেছেন। হরিসভাগৃহে প্রভুর থাকিবার স্থান। অবিরাম কীর্ত্তনানন্দে ক্ষুদ্র-কুটিরের চারিদিক মুখরিত। এক সময় যে ডোমপাড়ার অধিকাংশ লোকই মদ্যপায়ী ও কুক্রিয়াসক্ত ছিল, আজ সেথায় নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তন, সাত্ত্বিক আহার বিহার ও ভজন নিষ্ঠা বিরাজ করিতেছে।

প্রভাত-তপনের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সমস্ত পৃথিবী আলোক ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, শ্রীবন্ধুসুন্দরের অভ্যুদয়ে রামবাগানের তমোরাশি সেইপ্রকার নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভক্তির আলোকে নরনারী পুলকিত হইয়া নাচিতেছে। হরিনামের মাদকতা মানুষের দেহেন্দ্রিয়ের সকল ভোগপ্রবণতা ঘুচাইয়া দিয়াছে।

তিনকড়ি, পীতাম্বর, প্রতাপ, বুজিরাম, হরিদাস প্রমুখ ভক্তগণ মিলিয়া প্রেমস্বরে কীর্ত্তন করেন। নামের ধ্বনি প্রতি-ধ্বনিতে ডোমপল্লীর পথ ঘাট যেন নাচে। হীরু, নারায়ণ, ভীম প্রভৃতি বালকগণের মধুর কণ্ঠ শ্রবণে বন্ধুসুন্দর আনন্দে ঢুলিতে থাকেন। বন্ধুর গৃহে কত দ্রব্য সামগ্রী আসে, সকলই হরির লুট দিয়া বালকদিগকে বিলাইয়া দেন।

একদিন তুমুল কীর্ত্তনানন্দের পর ভক্তগণ বলিলেন, "প্রভু, বড় ক্ষুধা পেয়েছে।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "তোরা কি খেতে চাস্?" অগ্রণী হইয়া হীরুমণ্ডল কহিল, "প্রভু, গরম গরম রসগোল্লা খেতে চাই।" বন্ধুসুন্দর তখন হাসিতে হাসিতে গৃহাভ্যন্তর হইতে দুই হাড়ি গরম গরম রসগোল্লা বাহির করিয়া দিলেন।

বালকভক্তগণ পরম আনন্দে কাড়াকাড়ি করিয়া রসগোল্লা প্রসাদ লইতেছে। তখন মহীন্দ্র মণ্ডল বলিলেন, "প্রভু, আমি চাই একখানা টাট্‌কা দশটাকার নোট।" প্রভু তৎক্ষণাৎ এক-খানি নূতন চকচকে দশটাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

ভক্তবর পীতাম্বর বাবাজী বলিলেন, "প্রভু, টাকাপয়সা, খাবার দ্রব্য দ্বারা কি করিব? খোল দেন, করতাল দেন, কীর্ত্তনের শক্তি দেন। যাহা দ্বারা আপনার প্রীতিবিধান করিতে পারিব তাহা দেন।" প্রভু তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে হইতে দুইখানি ভাল খোল ও কয়েক জোড়া করতাল বাহির করিয়া দিলেন।

বিস্ময়ে আত্মহারা পীতাম্বর বলিলেন, "প্রভু, পুরীতে যাব নাম নিয়ে।" প্রভু বলিলেন, "সেইজন্য তোমার কি চাই, তাত!" বন্ধুসুন্দর পীতাম্বরকে 'তাত' বলিয়া ডাকিতেন। প্রভুর মধুর সম্বোধনে বিগলিত হৃদয়ে পীতাম্বর কহিলেন, "চাই খোল, খুন্তি, চাঁদমালা, করতাল ও আশীর্ব্বাদ।

শ্রীশ্রীপ্রভু তৎক্ষণাৎ ঐসকল দ্রব্যাদি গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তৎপর বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে স্বীয় রাঙা করতল

খানি বাহির করিয়া দেখাইলেন। পীতাম্বর উহাকে পরম আশীর্ব্বাদের ইঙ্গিত মনে করিয়া পরম আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কয়েক দিবস পর পীতাম্বর আরও কয়েকজন অনুরাগী ভক্ত সঙ্গে লইয়া নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পদব্রজে লইয়া পুরীধামের পথে অগ্রসর হইলেন। যে যে পথ ধরিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর পুরীধামে গমন করিয়াছিলেন তাহারা সেই সেই পথ ধরিয়া চলিবেন, এই সংকল্প। যাত্রাকালে প্রভুবন্ধু বলিলেন, "তাত পীতাম্বর, শ্রীনরেন্দ্রের বারি ও শ্রীগুণ্ডিচার রজঃ আনিও।"

কৃষ্ণদাসের কৃপা লাভ

তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস।

—শ্রীগৌরহরি

শ্রীশ্রীপ্রভু কলিকাতা শেঠের বাগানে একটি দ্বিতল গৃহে অবস্থান করিতেছেন। চম্পটীঠাকুর নিত্য টহল কীর্ত্তন করেন। সহর পরিভ্রমণ করিয়া প্রভুর গৃহের দুয়ারে আসিয়া কীর্ত্তন শেষ করেন। ঐ টহল কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া একটি কৃষ্ণবর্ণ যুবক একদিন কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আসিল। ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে থাকিয়াই গেল, আর ফিরিল না।

যুবকের হাবভাব ভক্তিনম্রতা দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই তাহাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। প্রভু আদর করিয়া সম্বোধন

করিলেন—"কৃষ্ণদাস"। এই নামেই সে ভক্তগণের নিকট পরিচিত হইল। তাহার ঘরবাড়ী বা পিতামাতা কোথায় ইহা কোনদিন কেহ জিজ্ঞাসাও করে নাই, জানেও নাই। নিজ নামে ও গুণে তিনি চিরকাল ভক্তসমাজের রত্নমণি হইয়া রহিয়াছেন।

একদিন শেঠের বাগানে কীর্ত্তন হইতেছে। সকলেরই উন্মাদনা আসিয়াছে। কৃষ্ণদাস কীর্ত্তনের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। দ্বিতল হইতে গবাক্ষপথে প্রভু কৃষ্ণদাসের নৃত্য দর্শনে পরম আনন্দলাভ করিতেছেন। নিকটে থালিভরা ফুল ছিল। সকলই গবাক্ষ দিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে বর্ষণ করিয়া দিলেন। ঐ আশীষ-কুসুম একটি কৃষ্ণদাসের মস্তকে পতিত হইল!

শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীহস্তার্পিত আশীষ-পুষ্পের স্পর্শ পাইয়া কৃষ্ণ-দাসের চিত্তে গোপীভাবের উদয় হইল। শিরে অবগুণ্ঠণ টানিয়া যুবক কৃষ্ণদাস একেবারেই যুবতীবৎ হইয়া গেলেন। তাহার হাবভাব অদ্ভুতভাবে বদলাইয়া গেল। ভাবে বিভোর হইয়া ষোল সতর দিন একই গৃহে নির্জ্জনে অবস্থান করিলেন, নরনারী কাহারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিলেন না। বিরহ-বিধুরা গোপীর ভাবে কখনও হাসি কখনও কান্না করিতে লাগিলেন। আহার নিদ্রায় অভিনিবেশ একেবারেই রহিল না। একদিন স্বয়ং প্রভু কৃষ্ণদাসের নিকট আসিয়া তাহাকে টহল কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। আদেশ পাওয়া মাত্রই পূর্ব্বকথিত আবেশ কাটিয়া গেল, তখন হইতে স্বাভাবিকভাবে ভক্তদের সঙ্গে নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিতে লাগিলেন।

একদিন রাত্রিতে শ্রীশ্রীপ্রভু ফিটিং গাড়ীতে বেড়াইতে বাহির হইলেন। কৃষ্ণদাস গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে লাগিলেন। বন্ধুসুন্দর বহু রাস্তা ঘুরিয়া গভীর রাত্রে শেঠের বাগানে ফিরিলেন। কৃষ্ণদাস সমস্ত রাস্তা গাড়ীর পিছনে পিছনে ছুটিয়াছেন। ভক্তের অনুরাগময় আর্ত্তি দেখিয়া প্রভুর হৃদয় গলিয়া গিয়াছে।

পর দিবস বেড়াইতে যাইবার সময় প্রভু বলিলেন, "আজ যদি কৃষ্ণদাস বাবু যান তাহা হইলে আমি আর গাড়ীতে যাইব না।" প্রভু হাঁটিয়া গেলে কষ্ট হইবে। প্রভুর বেড়ান বন্ধ হইলেও প্রভুর সুখে বাধা হইবে এইরূপ মনে করিয়া কৃষ্ণদাস প্রভুর গাড়ীর সঙ্গে যাওয়া বন্ধ করিলেন।

কোনও সময় শ্রীশ্রীপ্রভু একখণ্ড কাগজে কৃষ্ণদাসকে লিখিয়া দিয়াছিলেন—

১। ধর্ম্ম করতঃ কর্ম্ম খর প্রখর যম রাজা।

২। পৃথিবী মিথ্যা। পৃথিবী তৃণবৎ। পৃথিবী রাধানাম বিহীন।

৩। রাধানাম জপ করিবা। প্রাণকে গড়ের মাঠ করিবা।

৪। তরু ধর্ম্ম। বহুভোজন নিষেধ। ভিক্ষা সিদ্ধি। তুলসী, হরি, গরু পর নহে। রোগ প্রবল, তুলসীতে জল। গোবিন্দের জয়॥

প্রশ্ন সপ্তক

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
—শ্রীগীতা

হুগলী হইতে জনৈক উকীল ভক্ত শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট কতিপয় প্রশ্ন করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। প্রভু প্রশ্নগুলি পাঠ করিয়া, যথাযথ উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পত্রে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ছিল।—

১। অনেক সময় মনে হয় যে ভগবানই জীবের লক্ষ্য, কিন্তু লক্ষ্য স্থির হয় না কেন?

২। দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়সকলকে সম্পূর্ণরূপে শাসনে রাখিবার উপায় কি?

৩। মনুষ্য নিজের চেষ্টায় ইন্দ্রিয় জয় করিতে সক্ষম হয় কি?

৪। হরিনাম করি কিন্তু ইন্দ্রিয়সকলের পরাক্রম কমে না কেন?

৫। প্রকৃত হরিনাম কিরূপে করা যায়?

৬। জন্ম ও মৃত্যু এবং মনুষ্য-দেহ-ধারণ ব্যাধি বলিয়া মনে হয়। ইহাদের হাত হইতে নিস্তারের উপায় কি?

৭। ভগবান দয়াময়, তবে জীবের এত দুঃখ কেন?

শ্রীশ্রীপ্রভু সাতটি প্রশ্নে সাতটি উত্তর লিখিয়া দেন। উত্তর গুলি নিম্নে লিখিত হইতেছে।—

১। কাল, কলি, পাপ, প্রপঞ্চ ও প্রাক্তন প্রভাবে।

২। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ও পরমেশ্বরে নির্ভর।

৩। প্রবর্ত্তকের পর সাধক অবস্থায় সংকর্ষণ শক্তিদান করেন।

৪। বৈষ্ণবটিকারূপ হরিনামের সহিত প্রেম, ভক্তি, আগ্রহ, একাগ্রতা ও নিষ্ঠারূপ অনুপান থাকিলে ইন্দ্রিয়রূপ ব্যাধি পরাভূত হয়।

৫। নাম, প্রেম, ভক্তি, মর্দ্দল ও করতাল হইতে।

৬। স্থূলদেহ, লিঙ্গদেহ ও কারণ দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হইলে জন্ম-মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। পরাভক্তির উদয়ে অমৃতত্ব লাভে সর্ব্বব্যাধি নাশপ্রাপ্ত হয়। মায়াই ঐ ব্যাধির মূলীভূত কারণ।

৭। ভগবান ভক্তাধীন।

প্রশ্নোত্তর বিশ্লেষণ

শ্রীশ্রীপ্রভুর উত্তরগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহাতে তিনি মিত ও সার কথায় কতিপয় গভীর বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। কথাগুলি চিরন্তনী হইলেও প্রকাশ ভঙ্গীতে অভিনব এবং উহা বিশ্ব-রহস্যের কোন কোনও দিকে উজ্জ্বল আলোক-সম্পাত করিয়াছে। কিঞ্চিৎ অনুশীলন করা যাইতেছে।—

"লক্ষ্য স্থির হয় না কেন ?"

দুঃখায় যন্ত্রে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা।

—শ্রীচণ্ডী

মনে হয় যে ভগবানই জীবের লক্ষ্য, কিন্তু লক্ষ্য স্থির হয় না কেন ? শ্রীঅর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে গীতায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদেব নিয়োজিতঃ॥ ৩।৩৬

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক পাপে প্রেরণ করে কে ? "ইচ্ছা নাই তবু কেন পাপ করি" ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্ন। "লক্ষ্য কি জানি তবু কেন লক্ষ্য স্থির হয় না" ইহাই ভক্ত উকীলের প্রশ্ন। উভয় প্রশ্নের মর্ম্ম একই। একটি অন্বয় মুখে, অপরটি ব্যতিরেক মুখে।

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, রজোগুণোদ্ভব কাম ক্রোধ বশতঃই ঐরূপ হয়। উকীলের প্রশ্নে ভগবান বন্ধুসুন্দর উত্তর করিয়াছেন—"কাল, কলি, পাপ, প্রপঞ্চ ও প্রাক্তন প্রভাবে ঐরূপ হয়।" উত্তর একই, কেবল শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীবন্ধুর উত্তর ব্যাপকতর।

রজোগুণোদ্ভব কাম ক্রোধ "প্রাক্তন" বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার রাশির অন্তর্ভুক্ত। "কাল" ভগবানের কলন শক্তি বা পরিণতি সংঘটানুকূল শক্তি। যে শক্তি দ্বারা বস্তুর পরিপাক (maturity) হয় তাহাই কাল শক্তি। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বৈচিত্র্যময় জগতই "প্রপঞ্চ"। কাল এবং প্রপঞ্চ বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের Time-space.

"কলি" বলিতে একটা বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত সময় ও তৎকালীন আবেষ্টনী বুঝায়। "পাপ" বলিতে ভগবৎ বহির্ম্মুখীন বৃত্তি বুঝায়। অতএব লক্ষ্য কি তাহা বুঝিয়াও তাহাতে মন স্থির না হইবার কারণ পাঁচটি নির্দ্দিষ্ট হইল।—কাল, কলি, এবং প্রপঞ্চ, পাপ ও প্রাক্তন।

এতন্মধ্যে প্রথম তিনটি কাল কলি ও প্রপঞ্চ—দেশ কাল ও সামাজিক আবেষ্টনী—বাহির হইতে ভিতরে প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্ত্তী দুইটি অর্থাৎ পাপ ও প্রাক্তন—বহির্ম্মুখীনতা ও জন্মার্জ্জিত সংস্কারপুঞ্জ—এই দুই ভিতর হইতে বাহিরে প্রভাব বিস্তার করে। এই পাঁচটির সমবেত প্রভাব ফলে লক্ষ্যে চিত্ত স্থির হয় না। বন্ধুসুন্দরের উত্তর শাস্ত্র ও বিজ্ঞান সম্মত।

"ইন্দ্রিয় শাসনের উপায় কি?"

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহিশত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং॥
—শ্রীগীতা ৩।৪৩

ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়সকলকে শাসনে রাখিবার উপায় কি?" সকল ইন্দ্রিয়ের মূলে অন্তরেন্দ্রিয় মন। মনের যোগ না হইলে কোন ইন্দ্রিয়ই কাজ করে না। মনকে সংযত করিতে পারিলেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত হয়। মন সংযত করা অতীব দুরূহ কর্ম্ম। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুস্করম্॥ ৬।৩৪

বায়ুকে নিগ্রহ করা যেরূপ দুষ্কর, চঞ্চল মনকে বশে আনাও তদ্রূপ কঠিন কার্য্য। চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায় ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে ॥"

"অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধ" এই সূত্রে ঋষি পতঞ্জলিও ঐ কথাই বলিয়াছেন।

"অভ্যাস ও বৈরাগ্য।" কথা দুইটিই অস্পষ্ট রহিয়াছে। কিসের অভ্যাস তাহা অনেকক্ষণ অনুসন্ধান না করিলে স্পষ্ট হইবে না। প্রভু বন্ধুসুন্দর "ব্রহ্মচর্য্য" অবলম্বন কথাটি উল্লেখ করিয়া ঐ অস্পষ্টতাকে দূর করিয়াছেন।

বৈরাগ্য বা বিষয়-বিরাগ কিরূপে হইবে তাহা উক্ত শ্লোক বা সূত্র স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতেছে না। বস্তুতঃ, বৈরাগ্য একটি অভাববাচী ব্যাপার। কোনও বস্তুতে 'রাগ' না বাড়িলে অপর বস্তুতে বি-রাগ জন্মা নিতান্তই কঠিন। প্রভু বন্ধুসুন্দর "পরমেশ্বরে নির্ভর" কথাটি উল্লেখ করিয়া বৈরাগ্য লাভের রহস্যটি ব্যক্ত করিয়াছেন। নিজেকে পরমেশ্বরের দিকে যতখানি নির্ভরশীল করা যাইবে, বিষয় তৃষ্ণাও ঠিক ততখানিই কমিবে।

পরম পুরুষের করে নিজেকে সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে থাকিলে দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় শাসনে আসে। কেবল শাসনে আসে না, অনুগত হইয়া সাধনের আনুকূল্য করিয়া থাকে। ইহাই বন্ধুসুন্দরের উত্তরের তাৎপর্য্য।

নিজ চেষ্টা ও ঈশ্বর সহায়তা

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ও ঈশ্বরে নির্ভর করিতে বলা হইয়াছে। এইটুকু করিবার শক্তিও কি জীবের আছে? অথবা সকল শক্তি তাঁহারই হাতে ন্যস্ত আছে। ভক্ত এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।—"মনুষ্য নিজের চেষ্টায় ইন্দ্রিয় জয় করিতে সক্ষম হয় কি?"

প্রশ্নটি বহু পুরাতন। মনুষ্য নিজ চেষ্টায় কোনও কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় কি জিজ্ঞাসা করিলেই প্রশ্নটি সেই চির পুরাতন দৈব-পুরুষকারের সমস্যার কথা মনে হয়। এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। প্রভুবন্ধুর সমাধানটি অভিনব। এই সমাধানের পরেও যে প্রশ্ন তোলা যায় না এমন কথা বলিতেছি না। তবে উত্তরের মধ্যে যে নূতনত্ব আছে তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

"প্রবর্ত্তকের পর সাধক অবস্থায় সংকর্ষণ শক্তিদান করেন।"

প্রভুবন্ধুর ভাষাটি গম্ভীর ও প্রবাদ বাক্যের মত সিদ্ধান্তপূর্ণ। উত্তরটির মধ্যে তিনটি পারিভাষিক শব্দ আছে। প্রবর্ত্তক, সাধক ও সংকর্ষণ। প্রথমে এই শব্দ তিনটির ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

কৃতকার্য্যতার আশা ও পূর্ত্তি সুদৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধরিয়া যে ব্যক্তি তপস্যায় ব্রতী হইয়াছে, তাহাকে বলে প্রবর্ত্তক। ধ্যানের কৃতকার্য্যতা যাহার জীবনের মধ্যে মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে তিনি সিদ্ধ। প্রবর্ত্তক ও সিদ্ধের মধ্যবর্ত্তী তপস্যাপরায়ণ জীবনই সাধক জীবন।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত বৈচিত্র্যময় নিখিল-কর্ম্ম-নিবহ নিয়ন্ত্রিত হয় ভগবানের যে ক্রিয়া শক্তি দ্বারা, তাহার নাম সংকর্ষণ শক্তি।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, আমার ইন্দ্রিয়-সংযমকার্য্যে আমার কোন ক্ষমতা আছে কিংবা সব ক্ষমতাই সংকর্ষণের। বন্ধুসুন্দর উত্তর দিয়াছেন—প্রবর্ত্তকের পর সাধক অবস্থায় সংকর্ষণ শক্তিদান করেন। অর্থাৎ আমি সংকল্প লইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তিনি শক্তি পাঠান, তৎপূর্ব্বে নহে।

যতক্ষণ সাধক অবস্থা থাকে ততক্ষণ সাধকের শক্তি তাঁহার শক্তির সঙ্গে মিলিয়া কাজ করে। সাধন-পূর্ণতায় যে সিদ্ধি তাহা তাঁহারই দান। সাধকের আমিত্ব তখন আর বিন্দুমাত্র থাকে না।

গীতায় কর্ম্মের হেতু বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, করণ, বিবিধ চেষ্টা ও দৈব, এই পাঁচ মিলিয়া কর্ম্ম ফলপ্রসূ হয় (১৮।১৪)। এই গীতাবাক্যে চেষ্টা দৈবের সম্পর্ক সুস্পষ্ট নহে। সিদ্ধি আনয়নে উভয়ের আনুপাতিক সম্পর্ক সুনির্দ্দিষ্ট নহে।

প্রভুবন্ধুর উত্তর মূলতঃ এক হইলেও, ঐ সম্বন্ধের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অভিনব।—নিজ প্রচেষ্টায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পর সংকর্ষণের শক্তিদান, সাধকের উন্মুখতায় ঈশ্বরের কৃপা বদান্যতা, সিদ্ধিতে প্রচেষ্টার বিলোপ, করুণা-প্রসাদের পূর্ণ রাজত্ব। উপক্রমে কেবল প্রয়াস। উপসংহারে কেবল প্রসাদ।

প্রভুবন্ধুর উত্তরটি যতই ধ্যান করা যাইবে ততই সুপ্রাচীন রহস্যের বদ্ধ-অর্গল উন্মোচিত হইবে।

"ইন্দ্রিয়ের পরাক্রম কমে না কেন ?"
শুনিয়া গোবিন্দ রব—আপনি পালাবে সব।
—শ্রীনরোত্তম

এই পর্য্যন্ত যুক্তি বিচারের কথা গেল—থিওরী বলা হইল। এখন বাস্তব কাজের কথা। "হরিনাম করি, কিন্তু ইন্দ্রিয়সকলের পরাক্রম কমে না কেন ?" এই প্রশ্ন কেবল জনৈক উকিলের নহে, সাধক মাত্রেরই এই জিজ্ঞাসা। নাম করি, ইন্দ্রিয়ের পরাক্রম কমে না কেন ? ঔষধ খাই, রোগ যায় না কেন ?

উত্তর হইতেছে—বাজারের ঔষধ যেখানে সেখানে যোগাড় করিয়া যে সে ভাবে খাইও না। সুবৈদ্যের নিকট সংগ্রহ করিয়া অনুপান সহযোগে যত্নের সহিত সেবা কর।

সদ্‌গুরুই সুবৈদ্য। প্রেম, ভক্তি, আগ্রহ, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা এই পঞ্চ মিলনে অনুপান। তাই তো প্রভুবন্ধুর উত্তর—"বৈদ্য-বটিকারূপ হরিনামের সহিত প্রেমভক্তি, আগ্রহ, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা-রূপ অনুপান থাকিলে ইন্দ্রিয়রূপ ব্যাধি পরাভূত হয়।"

সুবৈদ্যের বটিকা যেমন শোভনভাবে তৈয়ারী বলিয়া শক্তিশালী, অনুরাগী ভক্তের প্রেমকণ্ঠোচ্চারিত নামও সেইরূপ অপরিমিত শক্তি সমন্বিত। 'প্রেম' বলিতে ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য হৃদয়ের আকূতি, 'ভক্তি' পদে পরম অনুরক্তি, 'আগ্রহ' বলিতে ব্যাকুলতা, 'একাগ্রতা' বলিতে মনের একমুখীনতা বা একতানতা, এবং 'নিষ্ঠা' বলিতে ইষ্টে স্থিরানুগত্য বুঝায়।

এই সকল অনুপান বা আনুসঙ্গিক ভাবসম্পদ থাকিলে নাম অনতিবিলম্বে ফলদান করে। না থাকিলেও কিন্তু নামের সাধন

ব্যর্থ হয় না। প্রস্তরে নিক্ষিপ্ত শস্য বীজ শুকাইয়া যায়, কিন্তু প্রস্তরসম হৃদয়ে পতিত হরিনাম বীজ নাশপ্রাপ্ত হয় না। সময়ের অপেক্ষায় থাকে। মহদনুগ্রহে কোনও কালে হৃদয় কোমল হইলে, ঐ বীজ তখন অঙ্কুরিত হয়।

"প্রকৃত হরিনাম কিরূপে করা যায়?"

অগ্নিতে দাহিকা-শক্তি স্বতঃ, স্বাভাবিক ও সর্ব্বকালীন। তবু কিন্তু সিক্তকাষ্ঠে অগ্নি-সংযাগ করিলে কেবল ধূমের উদ্গার হইতে থাকে। কাষ্ঠ শুষ্ক হইলে ধূম কম হয়। কাষ্ঠের দোষগুণে অগ্নিশিখায় নানাবিধ বর্ণ প্রকাশ পায়। একেবারে জলগন্ধহীন একটি লৌহ-গোলকে অগ্নি-সংযুক্ত হইলে বিন্দুমাত্র ধূম থাকে না এবং অগ্নির নিজস্ব প্রকৃত বর্ণটি প্রকাশিত হয়।

শ্রীহরিনামে সর্ব্বশক্তি নিত্য স্বতঃ ও স্বাভাবিকভাবে বিরাজিত থাকিলেও, আনুষঙ্গিক কারণবশতঃ কখনও ধূমাচ্ছন্ন, কখনও বা উজ্জ্বল তরুণ তপন সদৃশ হইয়া পাপান্ধকার বিনাশ করে। হরিনামের প্রকৃত স্বরূপটি কিভাবে ব্যক্ত হইতে পারে, ইহা পরম প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসা বটে।

শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের দেওয়া পাঁচটি বস্তুর নাম করিয়াছেন। খোল, করতাল, নাম, প্রেম ও ভক্তি। প্রেম-ভক্তির সহিত খোল করতালে হরিনাম কীর্ত্তন করিলে নামের প্রকৃত স্বরূপটি মূর্ত্তিলাভ করে। সংক্ষেপে ইহাই দাতা শিরোমণি

শ্রীগৌরসুন্দরের দান। এই মহাদানের কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অভিন্ন গৌরহরি শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর আবার তাহা স্মরণ করাইয়া, নিজ জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

উক্ত পাঁচটি বস্তুর মধ্যে আর একটি গভীর রহস্যের ব্যঞ্জনা আছে। সেই ব্যঞ্জনার মর্ম্ম প্রভুবন্ধু অন্যত্র ব্যক্ত করিয়াছেন। "মৃদঙ্গ সাক্ষাৎ সীতানাথ। করতাল সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ। শ্রীবাস ভক্তি। গদাধর প্রেম। মহাপ্রভু সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমন্ত নাম।" অর্থাৎ বাহ্যতঃ যাহা খোল, করতাল, নাম, প্রেম, ভক্তি, তত্ত্বতঃ তাহা শ্রীঅদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গৌর, গদাধর ও শ্রীবাস।

প্রকৃত হরিনাম হইলে পঞ্চতত্ত্ব প্রকটিত হন। পঞ্চতত্ত্বের মিলন ঘটিলে প্রকৃত হরিনাম হয়।

জন্ম মৃত্যু হইতে নিস্তার

সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা।

—শ্রীনরোত্তম

সাধন ভজনের কথার পর ভক্ত সিদ্ধি বিষয়ক চরম প্রশ্ন করিয়াছেন। সিদ্ধাবস্থায় নিশ্চয়ই এই অনিত্য অসিদ্ধ দেহ থাকে না। সুতরাং যতকাল জন্ম, দেহ-ধারণ, দেহ-ত্যাগ রহিয়াছে ততকাল সিদ্ধদেহ লাভ হয় নাই, বুঝিতে হইবে। এইজন্যই গতাগতি বন্ধ করিবার দিকে সকল সাধকের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

ভক্তের মনে হইতেছে, এই নশ্বর দেহ ধারণ একটি ব্যাধি। এই ব্যাধির নিরাময় হইলে সুস্থ ও স্বস্থ হইয়া সিদ্ধদেহে শান্তির অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু ব্যাধি নিরাময়ের উপায়টি কি ?

"কে আমি কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥"

এই সনাতন প্রশ্নেরই ইহা আর একটি সংস্করণ। উত্তরে প্রভু-বন্ধু জানাইয়া দিতেছেন যে, দেহ তিনটি। স্থূলদেহ, লিঙ্গদেহ ও কারণদেহ। যাবৎ না এই তিনের বিনাশ হয় তাবৎ ব্যাধি ঘুচে না।

এই তিনটি দেহেরই মূলীভূত কারণ মায়া। মায়াপদে ভগবদ্ বৈমুখ্য বুঝিতে হইবে। আলোকের দিকে বিমুখ হইয়া অর্থাৎ পিছন দিয়া দাঁড়াইলে সম্মুখের অন্ধকারই মায়া স্থানীয়। উন্মুখী হইলেই অর্থাৎ আলোকের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলেই মায়ান্ধকার পশ্চাতে পলায়ন করে। মায়া কাটিলেই দেহ ধারণের ব্যাধি নিরাময় হয়।

ভগবদুন্মুখী হইলেই ভক্তিদেবীর কৃপা কটাক্ষ সম্পাত হয়। প্রকৃত হরিনামের সাধনে ভক্তি পরাভক্তির ভূমিকায় উন্নীত হয়। পরাভক্তির উদয়ে অমৃতত্ত্ব লাভ হয়। অর্থাৎ সিদ্ধদেহ বা অমৃতময় গোপীদেহ প্রাপ্তি ঘটে। তখন ভক্ত নিরাময় হইয়া সুস্থ ও স্বস্থ থাকিয়া কৃষ্ণসেবায় ধন্য হয়।

"ভগবান ভক্তাধীন"

এবং সন্দর্শিতো হ্যঙ্গ হরিণাভৃত্যবশ্যতা। —শ্রীগুরু

জীবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও সাধন ভজন সম্পর্কীয় প্রশ্নের পরে জীব ও ভগবানের সম্বন্ধ বিষয়ক শেষ প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। প্রশ্নকর্ত্তা ভাবিয়াছেন—জীব যতই ত্রুটি অন্যায়, ভুল ভ্রান্তি, পাপ অপরাধ করুক না কেন ভগবান যেহেতু দয়াময়, ক্ষমা তিনি করিবেনই।

দয়াগুণের স্বভাব রশতঃই ভগবান জীবের দোষে দৃষ্টি না দিয়া স্নেহের কোলে তুলিয়া লইবেন। তাহাই যদি লয়েন, তাহা হইলে জীবের আর কোন তুঃখ থাকিতে পারে না। অথচ বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিতে পাই জীবের অশেষ প্রকার তুঃখ রহিয়াছে।

তবে কি ভগবান দয়াময় নহেন? দয়াহীন ভগবানকে ভজিয়া কি ফল? ভগবানের দয়া ও জীবের তুঃখ, একইকালে এই তুইয়ের সত্তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এই হেতুই ভক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন— "ভগবান দয়াময় তবে জীবের এত তুঃখ কেন?"

একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যদ্বারা বন্ধুসুন্দর উক্ত সমস্যাপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। "ভগবান ভক্তাধীন।"—ইহাই প্রভুবন্ধুর উত্তর। উত্তরটিকে একটি সূত্র বলিলেও চলে। সূত্রের ব্যাখ্যান করা যাইতেছে।—

ভগবান দয়াবান ইহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু তিনি জীবমাত্রকেই দয়া করেন না। সংসারে তুই প্রকারের জীব আছে। ভক্তজীব ও অভক্তজীব। ভগবানের সকল দয়াই ভক্তজীব লাভ

করিয়া থাকে। অভক্তজীব কিছুই পায় না। এই জন্যই ভগবানের অসীম দয়া থাকিলেও অভক্তজীবের দুঃখ বিন্দুমাত্র লাঘব হয় না।

এই সমাধানে দুইটি প্রশ্নের উদয় হয়। (ক) দুঃখ যারা পায়, তারা সকলেই কি অভক্ত? ভক্তজীবের কি কোন দুঃখ নাই? (খ) ভগবান অর্জ্জুনকে গীতায় বলিয়াছেন, "সমোহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" আমি সকলের প্রতিই সমান। আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। এই বাক্যের সহিত, ভগবান ভক্তকে দয়া করেন, অভক্তকে করেন না—এই কথার সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? অধিকন্তু বিচারপূর্ব্বক দয়াকে কি দয়া পদবাচ্য করা উচিত?

"ভগবান ভক্তাধীন" এই সূত্রটির মধ্যেই উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর লুক্কাইত আছে। সত্য সত্যই ভক্তের কোন দুঃখ নাই। ভক্তের বাহ্যিক অবস্থা দর্শন করিয়া অপর লোক কখনও কখনও তাহাকে দুঃখী মনে করিতে পারে কিন্তু সুখ-দুঃখ তো বাহিরের বস্তু নহে। মানস ব্যাপার।

ভক্ত নিজে কি কখনও মনে করে যে সে দুঃখী? ভক্ত যদি নিজেকে দুঃখী মনে করে, তবে সে ভক্তই নহে। কারণ ভগবান যে ভক্তাধীন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহার অধীন, তিনি যাহার অধীন তাহার দুঃখের অবকাশ কোথায়?

হৃদয়ে ভক্তি আছে বলিয়াই সে ভক্ত। ভক্তি ভগবানকে অধীন করিতে সক্ষম। সুতরাং ভক্তি, ভগবান অপেক্ষাও শক্তিমান একটি সুদুর্লভ মহাধন। এই ধনে যে ধনী সে নিজেকে দুঃখী

ভাবিবে কিরূপে ? যদি কখনও কেহ ভাবে আমি দুঃখী, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সুদুর্লভ ভক্তিধন সে পায় নাই।

অতএব অভক্তেরাই নিয়ত দুঃখ পায়। ভক্তের বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই, ইহাই সুসিদ্ধান্ত। তবে ভক্তের একটি মাত্র দুঃখ আছে, সেটি হইল ভগবদ্ বিরহ দুঃখ। সে দুঃখ লৌকিক কোন দুঃখ নহে। সে দুঃখের অন্তস্তলে দেবদুর্লভ নিত্যানন্দের প্রস্রবণ খেলা করে।

আমি সকল জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন। আমার দ্বেষ্য প্রিয় নাই। এই কথা যে গীতাতে উক্ত আছে সেই গীতাতেই "যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ"—"যে আমার ভক্ত সে আমার প্রিয়" —এইরূপ উক্তি পাওয়া যায়।

গীতার এই বিরোধিবাক্যেরও সমাধান প্রয়োজন। পরম-পুরুষের দুইটি স্বরূপ—ব্রহ্মস্বরূপ ও ভগবৎ স্বরূপ। প্রথম উক্তিটি ব্রহ্মস্বরূপের। দ্বিতীয় উক্তিটি ভগবদ্ ভূমিকা হইতে। সর্ব্ব-ব্যাপী বায়ু বলিতে পারে আমার পক্ষে সকলি সমান—নিঃশ্বাস-রূপে সবাকেই সমানভাবে বাঁচাই। আবার গ্রীষ্মতপ্ত ব্যক্তির ব্যজনী চালিত বাতাস বলিতে পারে, যে চালায় তাকে স্নিগ্ধ করি।

উক্ত দুইপ্রকার উক্তির মধ্যে যেমন কোন অসামঞ্জস্য বা বিরোধিতা নাই, ঠিক তদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপের সমতা ও ভগবদ্ স্বরূপের ভক্তাধীনতা—ইহাদের মধ্যেও সেইরূপ কোন অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না।

অন্যের অনধীনত্ব অতএব উদাসীনত্বই ব্রহ্মস্বরূপের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে ভক্তাধীনত্বই ভগবত্ত্ব। ভক্ত বা ভক্তজনের ভক্তিই

ভগবানকে ভগবান করিয়াছে। ভক্ত না থাকিলে তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। ভক্ত আসিলেই তিনি দয়াময় ভগবান। ভগবানেরই ভক্ত, ভক্তেরই ভগবান। মাতারই পুত্র, পুত্রেরই মাতা।

পুত্রত্ব বিনা যেমন মাতৃত্ব অসিদ্ধ, তদ্রূপ ভক্তাধীনত্ব ব্যতিরেকে ভগবত্বই অসিদ্ধ। এমতাবস্থায় ভগবান ভক্তকে দয়া করিবেন না তো কাকে দয়া করিবেন!

অভক্ত জীবের হাসিকান্না, সুখদুঃখ ইহার কোন সংবাদই ভগবান রাখেন না। কারণ ঐ সকল ত্রিগুণময়। ত্রিগুণময় কোন বস্তুর সঙ্গেই গুণাতীত ভগবানের কোন সম্বন্ধ হইতে পারে না। সংসারে মাত্র একটি বস্তুই আছে গুণাতীত। সেটি হইল ভক্তি। এই বস্তুটি বিরাজ করিতেছে যার হৃদয়ে, তার হাসি-কান্না সুখদুঃখ প্রত্যেকটি কার্য্যের সহিতই ভগবান বিজড়িত। না হইয়া উপায় নাই। কারণ তিনি ভক্তাধীন।

ভগবানের ভক্তাধীনত্বের মূলে রহিয়াছে ভক্তির অধীনতাই বিরাজমান। ভক্তি বস্তু শ্রীভগবানেরই চিন্ময়ী হ্লাদিনী-শক্তির একটি বৃত্তি। অতএব ভগবানের ভক্তির অধীনতার মূলে আছে তাহারই স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর বশ্যতা। আনন্দঘন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আনন্দশক্তি শ্রীরাধার অধীন। এই অধীনতাই চরমে শ্যামসুন্দরকে গৌরসুন্দর করিয়াছে।

এই অধীনতা তাঁহার পরমাতিপরম গুণ। ভক্তাধীনত্বই তাহার মাধুর্য্যময় লীলার ভূষণ, দূষণ নহে। "সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন।" তিনি কেবল ভক্তিগ্রাহ্য নহেন, ভক্তিবাধ্য।

নবদ্বীপের রাজেনবাবু

আমার আগমনে জগতে সকল সাধু মহাপুরুষের আগমন। আমি সকলের কেন্দ্র। —শ্রীবন্ধু

এই সময় নবদ্বীপে একজন মহাপুরুষের উদয় হইয়াছে। দীর্ঘ দেহ বিশাল বাহু। হা নিতাই হা গৌর বলিতে নয়নে জলপ্রবাহ। বিপুল কীর্ত্তনোন্মাদনায় তিনি নবদ্বীপ মাতাইয়া তুলিয়াছেন। সকলে তাঁহাকে রাজেনবাবু বলিয়া জানেন।

জয়নিতাইর সঙ্গে তাহার প্রথম দেখা হইবার পর হইতেই উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। মাতালে মাতালে সৌহার্দ্দ জন্মিতে বেশী দেরী লাগে না। জয়নিতাইর গাম্ভীর্য্য ও রাজেনবাবুর ভাবোচ্ছ্বাস দুয়ের মিলনে নবদ্বীপধাম নিতাই প্রচারণে টলটলায়মান হইয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দরের রচিত কতিপয় কীর্ত্তনের পদ জয়-নিতাই চম্পটী মহাশয়ের নিকট হইতে লিখিয়া লইয়াছিলেন। সেই সকল পদ জয়নিতাই রাজেনবাবুর দৃষ্টিগোচর করেন। রাজেনবাবু যেন মহার্ঘ্য রত্ন হাতে পাইলেন। এমন মধুর পদ-সমাবেশ জীবনে কেহ কোনদিন দেখে নাই। জয়নিতাই রাজেনবাবুকে প্রভুর আগমনী বার্ত্তা দিলেন। প্রভুর কীর্ত্তনের পদ রাজেনবাবুর কণ্ঠহার হইল।

জয়নিতাই ও রাজেনবাবু উভয়ে উভয়কে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিতেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি মর্য্যাদা-সম্পন্ন ছিলেন। উভয় উভয়কে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। উভয়

উভয়কে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। জয়নিতাই বলিতেন "রাজেন দাদা," রাজেনবাবু বলিতেন "দেবেন দাদা।" কখনও সখ্যভাবে উভয় উভয়কে 'ভায়া' বলিতেন।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস উভয়ে একত্র কাটাইতেন। হা নিতাই বলিতে উভয়ে দিশাহারা হইতেন। প্রভুবন্ধুর কথা জয়নিতাইর মুখে শুনিয়া রাজেনবাবু হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন। প্রভুবন্ধুর রচিত পদ পদাবলী কীর্ত্তনে রাজেনবাবু সংজ্ঞাশূন্য হইয়া আনন্দ-সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেন।

জয়নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতেন। পাঠ করিতে করিতে আনন্দে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন, দেহে সাত্ত্বিক পুলকাবলী শোভা পাইত। চৈতন্যভাগবতের অক্ষর ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়া জয়নিতাই যেসকল নব নব সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেন, তাহা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব। রাজেনবাবু ছিলেন প্রধান শ্রোতা। পাঠ শ্রবণে তাঁহার নয়নে গঙ্গা বহিত। কখনও আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন।

এই দলে কখনও কখনও প্রেমানন্দ ভারতী আসিয়া যোগ দিতেন। কখনও ব্রজবালা বালকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ আসিতেন। নবদ্বীপ হরিসভায় আসর বসিত। দেখিয়া মনে হইত কতকগুলি মাতালের মেলা বসিয়াছে। কখনও উদ্দণ্ড নৃত্য, কখনও, উচ্চৈঃস্বরে কান্না, কখনও হুঙ্কার গর্জ্জন, গলাগলি ঢলাঢলি। গৌর পার্ষদগণ অপ্রকট হইবার পর চারিশত বৎসর মধ্যে এমন ভক্তসম্মিলন আর কেহ দেখে নাই। হরিসভার আঙ্গিনায় রসের বন্যা বহিয়া যাইত।

রাজেনবাবুর একটা কুকুর ছিল, তার নাম ছিল ভক্তিদাসী। কুকুরটি কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিত। মহাপ্রসাদ ছাড়া আহার করিত না। জয়নিতাই ভক্তিদাসীকে হরিবোল হরিবোল বলিয়া আদর করিতেন। সেও হরিবোল উচ্চারণ করিবার মত শব্দ করিত।

কুকুরের মহোৎসব

ঐ কুকুরটির দেহ ত্যাগ হইলে জয়নিতাইর ইচ্ছা হইল একটি মহোৎসব করিয়া কুকুর ভক্তদের সেবা করেন। জয়নিতাইর প্রস্তাবে রাজেনবাবুর মত হইল। নবদ্বীপের পথে যেখানে কুকুর দেখিতে পান, জয়নিতাই নতজানু হইয়া গলবাসে যুক্তকরে তাহাকে বলেন, ভক্তিদাসী মাতা দেহরক্ষা করিয়াছেন। বড়াল ঘাটে তাঁর নির্য্যাণোৎসব হইবে। আপনারা কৃপা করিয়া উপস্থিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

নবদ্বীপবাসী সকৌতুকে উৎসবের দিনটির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাসময় যথাস্থানে কুকুরগণ আসিতে লাগিল। পাতা পাতিয়া দেওয়া হইল। পৃথক পৃথক পাতায় প্রত্যেকে নিঃশব্দে উপবেশন করিল। প্রত্যেক পাতায় প্রসাদ পড়িল সকলে নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কুকুরগণ যেন কার অপেক্ষায় পুনঃ পুনঃ পথ চাহিতে লাগিল।

অবশেষে একটি কুকুর গঙ্গা সাঁতরাইয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপনীত হইল। সে আসিয়া সকল পাতার কাছে গন্ধ লইয়া যেন কি বলিয়া গেল। তারপর সেও বসিল। সকলে প্রসাদ

গ্রহণ করিল। তাহাদের স্বভাবগত কোলাহল মারামারি কিছুই দেখা গেল না। সকল ভক্তবৃন্দ এই দৃশ্য দর্শনে আনন্দে জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। রাজেনবাবু ও জয়নিতাই কুকুর ভক্তগণকে দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন। রাজেনবাবু সকল কুকুরদের পাতা হইতে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া হা নিতাই হা নিতাই বলিতে বলিতে ধূলায় ধূসরিত হইতে লাগিলেন।

প্রসাদ পাইয়া সকল কুকুর নীরবে স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া নবদ্বীপবাসী নরনারী বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। যাহারা কুকুরের মহোৎসবে প্রসাদ লইব না বলিয়া বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারা পথের প্রসাদ কুড়াইয়া লইয়া জীবন ধন্য করিল।

এই ঘটনা উল্লেখকালে জয়নিতাই বলিতেন, রাজেন ভায়ার অদ্ভুত শক্তি-বলেই এমন কার্য্য সম্ভব হইল। রাজেন ভায়া বলিতেন, দেবেন দাদার অতুলনীয় ভক্তিবলেই কুকুর মহোৎসব সমাধান হইল। উভয়েই নিজেকে দীনহীন ও অপরকে মহা-অধিকারী বলিয়া আন্তরিক বিশ্বাস করিতেন। রাজেনবাবু একবার জয়নিতাইর জন্মস্থান দিকনগর দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কীর্ত্তনে পথিপার্শ্বের বৃক্ষলতা নৃত্য করিয়াছিল। জয়নিতাই কীর্ত্তন চালন করিয়াছিলেন।

এই রাজেনবাবুই পরবর্ত্তীকালে শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী বা বড় বাবাজী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি কয়েকবার শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের দর্শন লাভ করেন। সে কথা ক্রমে লিখিত হইতেছে।

জয়নিতাইর ফরিদপুর প্রচারণ

যদি দয়াল নিতাইচাঁদের ইচ্ছা হয়, যে সে একজন দ্বারা অভাবনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

—শ্রীবন্ধুবাণী

চন্দনযাত্রা উপলক্ষে 'রাজেন ভায়া' নীলাচল ধামে চলিয়া গিয়াছেন। জয়নিতাই আসিয়াছেন কলিকাতা রামবাগানে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের দর্শন-মানসে। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর চাষাধোপাপাড়া কোন ভক্তগৃহে অবস্থান করিতেছেন। ফরিদপুরে বিরোধী অভিভাবকেরা রমেশের কার্য্যে ভীষণভাবে বাধা সৃষ্টি করিতেছে জানিয়া ভক্তবৎসল যেন কিছু চিন্তাকুল হইয়াছেন। ভক্তগণ সঙ্গে রমেশের কথা মাঝে মাঝে বলিতেছেন। এমন সময় সংবাদ পাইলেন রামবাগানে জয়নিতাই আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর রামবাগানের একটি ভক্তদ্বারা তখনই জয়-নিতাইকে বলিয়া পাঠাইলেন—"দেবেনকে বল অদ্য রাত্রিতেই তাহাকে ফরিদপুর যাইতে হইবে।" ভক্তটি এই আদেশ বাক্য জয়নিতাইয়ের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। রাত্রের ট্রেণ ছাড়িবার আর বেশী বিলম্ব নাই। জয়নিতাই কিছু সংকটে পড়িলেন। কারণ প্রভুর দর্শন করিয়াই বেলুড়ে শ্বশুরালয় চলিয়া যাইবেন এইরূপ সংকল্প তাঁহার ছিল। সেখানে বিশেষ একটি প্রয়োজনও তাঁহার ছিল।

জয়নিতাই প্রভুর আদেশ সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ না করিয়া, আজকের মত বেলুড়ে যাই এরূপ মনে ভাবিয়া যেইমাত্র

দুই তিন পা অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি প্রভু বন্ধুসুন্দর আর একজন ভক্ত পাঠাইয়া পূর্ব্ব প্রেরিত আদেশ পুনরায় বিজ্ঞাপন করিলেন। ভক্তটি বলিলেন, প্রভু বলিয়াছেন "এই মুহূর্ত্তে জয়-নিতাইকে ফরিদপুর রওনা হইতে হইবে।

জয়নিতাই বুঝিলেন, আজ্ঞাপালন না করিয়া গত্যন্তর নাই। তথাপি একটি দিন দেরী করিবার জন্য ছল খুঁজিয়া কহিলেন—"প্রভুকে বলুন, আমার সঙ্গে প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি নাই এবং পাথেয় নাই।" এই কথা প্রভু জানিবামাত্র অপর একটি ভক্তদ্বারা প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি ও পাথেয় পাঠাইয়া দিলেন। জয়নিতাই প্রভুর উদ্দেশ্যে ভূলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ করতঃ ফরিদপুর রওনা হইলেন।

ফরিদপুর যে তিনি কেন যাইতেছেন তাহা জানিলেন না। একবার ভাবিলেনও না, কাহাকেও জিজ্ঞাসাও করিলেন না। আদেশ পালন করিতেছি এই আনন্দেই চলিলেন। প্রভু সর্ব্বদা জয়নিতাইকে "আপনি আপনি" বলিয়া সম্মানই করেন কখনও কোন আদেশ করেন না—যেমন চম্পটীভায়াকে করেন—এই হেতু জয়নিতাইয়ের মনের কোণে দুঃখ ছিল। আজ সে দুঃখ দূর হইল।

প্রভু যে কিছুতেই আদেশ অমান্য করিতে দিলেন না, ইহা তাঁহার অপার করুণা ভাবিয়া জয়নিতাইয়ের নয়ন সিক্ত হইয়া উঠিল। যিনি বুদ্ধির প্রেরক তাঁহার সঙ্গে চালাকী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম ভাবিয়া, জয়নিতাই একাকী কখনও হাসিলেন, কখনও বা অনুতপ্ত হইলেন। এইভাবে ট্রেণে পথ চলিতে লাগিলেন।

জয়নিতাইয়ের ফরিদপুর যাইবার কথা কোন ভক্তমুখে জানিতে পারিয়া চম্পটী মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট গিয়া বলিলেন, "এই সময় ফরিদপুরে দেবেন্দ্রকে একা পাঠান উচিত হয় নাই। শুনিয়াছি রমেশকে লইয়া নানা গণ্ডগোল চলিতেছে। যদি আদেশ কর, আমিও যাই।" চম্পটীর কথা শুনিয়া বন্ধুসুন্দর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "অতুল, যদি দয়াল নিতাইচাঁদের ইচ্ছা হয় যে সে একজন দ্বারা অভাবনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। তোমাকে আর যাইতে হইবে না।"

জয়নিতাই ফরিদপুর পৌঁছিতেই ষ্টেশনে তুমুল কীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। অন্তরে শ্রীশ্রীপ্রভুর আদেশ পাইয়া ভক্তবর দুঃখীরাম ঘোষ মোহান্ত সম্প্রদায় লইয়া জয়নিতাইকে সম্বর্দ্ধনা করিতে আসিয়াছেন। কীর্ত্তনের উন্মাদনা দেখিয়া জয়-নিতাই প্রথমে যেন স্তব্ধ হইয়া গেলেন। এত মধুর প্রাণ মাতান কীর্ত্তন বুঝি আর কোন দিন শুনেন নাই।

জয়নিতাই মোহান্তদের কথা শুনিয়াছেন মাত্র, দেখেন নাই। কলিকাতায় ডোমভক্তদের কীর্ত্তনের মত কীর্ত্তন আর পৃথিবীতে নাই, জয়নিতাইয়ের এই ধারণা ছিল। ফরিদপুরের বুনা জাতি যে মহাউদ্ধারণচন্দ্রের কৃপায় মোহান্ত পদবীতে আরোহণ করিয়া কিরূপ অপূর্ব্ব কীর্ত্তন-রসিক হইয়াছে, তাহা জানিতেন না, আজ প্রত্যক্ষ করিলেন।

হরিদাস মোহান্ত উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছেন,—

"কেরে কাঙ্গালের বেশে যাচিয়া বেড়ায়।
প্রেমদাতা নিতাই বুঝি এসেছে এ নদীয়ায়॥"

কীর্ত্তনের প্রতি অক্ষরে মধুবর্ষণ হইতেছে। জয়নিতাই নিজ দেহে তাল ঠুকিয়া মালসাট মারিয়া হুঙ্কার করিয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে মাতিয়া চলিলেন। জয়নিতাই কীর্ত্তনে যোগ দিবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। দিগন্ত কাঁপাইয়া ফরিদপুরের রাজপথ দিয়া কীর্ত্তন চলিল। সকলেরই মনে হইল—এই-ই নদীয়া ধাম—জয়নিতাইরূপে নিতাইচাঁদই আসিয়াছেন।

সকল লোক যেন মাতিয়া উঠিল। টেপাখোলা হইতে বদরপুর পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের প্লাবনে ভরপুর হইয়া গেল। এখানে ওখানে সভা বসিতে লাগিল। জয়নিতাই শাস্ত্রীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে লাগিলেন। দয়াল নিতাই গৌরের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। নামের মাহাত্ম্য বলিতে লাগিলেন। কখন শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ লইয়া পাঠ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইহাতে সমস্ত সহরময় একটা নব জাগরণ দেখা দিল।

একদিন তুমুল কীর্ত্তন হইতেছে। হরিদাস মোহান্ত শ্রীশ্রীপ্রভুর পদ গাহিতেছেন,—

> "খোল করতালে ভাই কর সংকীর্ত্তন।
> গৌর নিত্যানন্দ বলে নাচ অনুক্ষণ॥"

জয়নিতাই আনন্দে মাতিয়া হরিদাসের কানে কানে কহিলেন—"বলুন—জয় জগদ্বন্ধু বলে নাচ অনুক্ষণ।" জয়-নিতাইয়ের আদেশে হরিদাস শ্রীপদের পাঠ বদলাইয়া গান ধরিলেন—

> "জয় জগদ্বন্ধু বলে নাচ অনুক্ষণ"

ঐ নূতন পদ ধরিতেই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। মোহান্ত সম্প্রদায়ের সর্ব্বস্বধন "জয় জগদ্বন্ধু" নাম। তাহারা নিতাই গৌর রাধাগোবিন্দ গায় কিন্তু তৎসম্বন্ধে তাহাদের মনে কোন অনুভব নাই। তাহারা জানে এই সকল গান আমাদের প্রভুর অক্ষর। গাহিলে প্রভুর আনন্দ। কোন্ গান শুনিয়া প্রভু কোন্ দিন কতখানি আনন্দ পাইয়াছিলেন, কোন্ পদে প্রভুর উল্লাসাধিক্য দেখা গিয়াছিল, তাহাই স্মরণ করিয়া তাহারা প্রভুর রচিত পদ-পদাবলী গান করে। তাহারা মুখে নিতাই গৌর রাধামাধব উচ্চারণ করে, অন্তরে প্রাণের প্রাণ জগদ্বন্ধু হরিকেই দেখে। প্রত্যেক দিন কীর্ত্তনের শেষে তাহারা "জয় জগদ্বন্ধু বোল, হরিবোল হরিবোল" গায়। উহা গাহিবার সময় আনন্দ উল্লাস শতগুণ বাড়িয়া উঠে।

জয়নিতাইয়ের প্রচারণে ফরিদপুর সহর সহরতলী উন্মত্ত হইয়া উঠিল। রমেশচন্দ্রের অনুগত প্রভুর "পদাতিক সৈন্য" বালকদলও এই উৎসবানন্দে মাতিল। তাহাদের উদ্যম উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। তাহাদের সম্বন্ধে যে একটি বিরুদ্ধভাব সহরে দেখা দিয়াছিল তাহা প্রশমিত হইয়া গেল। জয়নিতাইয়ের হাব-ভাব, চাল-চলন, দৈন্য-বিনয়, বৈষ্ণবতা, কীর্ত্তনে তন্ময়তা, সাত্ত্বিক বিকার প্রভৃতি দর্শনে নরনারী প্রত্যেকে বিমুগ্ধ হইল।

জয়নিতাইয়ের ভাব-তন্ময়তা

জয়নিতাইয়ের ভাব-তন্ময়তা সত্যসত্যই অনন্যসাধারণ ও অন্যের অননুকরণীয়। সর্ব্বদাই মাতালের মত বিভোর থাকিতেন। শৌচে গিয়াছেন তিন চার ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। শৌচাগারে বসিয়াই আছেন—ভাব-বিহ্বল। জয় নিতাই জয় নিতাই বলিয়া কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে তবে সাড়া দিয়া শৌচাগার হইতে বাহির হইলেন।

প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিয়াছেন; পাঁচ ছয় ঘণ্টা কাটিয়া যাইতেছে। কত ধীরে, কত আদরে কত বিহ্বলভাবে যে এক একটি গ্রাস মুখে তুলিয়া দিতেছেন, তাহা যিনি দর্শন করিবার ভাগ্য লাভ করেন নাই, তাহাকে লিখিয়া বুঝান দুষ্কর। প্রসাদ পাইতে পাইতে নিতাইচাঁদের কথা উঠিলে, প্রসাদ পাওয়া পড়িয়া থাকে, কথাই চলে।

জয়নিতাইয়ের মানুষের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গী, পথ চলার ভঙ্গী, একটি কুকুর বিড়াল গাভীর সঙ্গে আলাপ করার ভঙ্গী, ছেলের দলের সঙ্গে নৃত্য করিবার ভঙ্গী, কেহ প্রণাম করিলে দৈন্যে চরণ সরাইয়া লইয়া নিতাই নিতাই বলিয়া তাহাকে আপ্যায়ন করার ভঙ্গী, মাতৃজাতির সঙ্গে অতি সন্তর্পণে ব্যবহারের ভঙ্গী, কীর্ত্তনের মধ্যে উল্লাসে বগল বাজাইবার ভঙ্গী, নিজ বাহুতে তাল ঠুকিবার ভঙ্গী, বীরবিক্রমে কুন্দিয়া চলিবার ভঙ্গী, প্রত্যেকটিই নিরুপম, অভিনব; আর কাহারও মত নয়। ঐরূপ অনুকরণ করিবার সামার্থ্য কাহারও ছিল না।

জয়নিতাইকে দেখিলে মুগ্ধ হইয়া মানুষ ভাবিত এ যেন এই জড় জগতের মানুষ নয়, সর্ব্বজীবে সমান, সর্ব্বজীবে নিতাইয়ের দর্শন—এ এক অতুলনীয় শিক্ষাদাতা। এমন নিতাইভক্ত ইনি আবার জয় জগদ্বন্ধু বলিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন দেখিয়া "জগৎপ্রভু" যে সামান্য নহেন এই অনুভব অনেক অবিশ্বাসীর চিত্তেই উদিত হইল।

জয়নিতাই বুঝিলেন কি কারণে দয়াল প্রভু অভিন্ন নিতাই-গৌর শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর তাহাকে ফরিদপুর পাঠাইয়াছেন। কিভাবে প্রভু হঠাৎ তাহাকে আদেশ পাঠাইয়াছিলেন, কিভাবে তিনি জীবভাবে ছলনা অবলম্বনপূর্ব্বক আদেশ লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়া "খোদার উপর খোদাগিরি" করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা জনেজনের কাছে বলিয়া যেন নিজের জৈববুদ্ধির কথা জানাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। ছোট বালকের মত জয়নিতাইয়ের ভাব ভাষা ও হাসি দেখিয়া সকলে অবাক হইত।

ছোট ছোট বালক বালিকা দেখিলেই জয়নিতাইয়ের রাখালিয়া ভাবের স্ফূর্ত্তি হইত। পথের মধ্যে যেখানে সেখানে বালকের দল জুটাইয়া হাততালি দিয়া কীর্ত্তন সুরু করিতেন। তাহাদের সঙ্গে হরিনাম খেলার ঢং দেখিলে জয়নিতাইকে দুগ্ধ-পোষ্য বালক বলিয়া মনে হইত। জয়নিতাইয়ের এই সকল ভাব-ভঙ্গী ছিল অতি স্বাভাবিক। সারাজীবনে কখনও ইহার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

ভাব-তন্ময় জয়নিতাইদেবের ফরিদপুর প্রচারণ ভক্তগণের মানস-ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা হইয়া রহিল।

জয়নিতাইয়ের প্রচারণে টেপাখোলা গ্রামের নবজাগরণ হইল। বঙ্কুবিহারী নাগ, মথুরানাথ কর্ম্মকার, রেবতী গুহ, অবিনাশ বসু, নিত্যগোপাল সরকার প্রমুখ বন্ধুসুন্দরের চির চিহ্নিত দাসগণ—জয়নিতাইয়ের প্রচারণ ফলে চির আরাধ্য দেবতার প্রতি উন্মুখ হইয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন।

সিদ্ধ জগদীশ বাবার মহাভাব দর্শন

এক এক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন তিন হাত।
অস্থি সন্ধি ছিন্ন ভিন্ন চর্ম্ম আছে তাত॥

—শ্রীকৃষ্ণদাস

কার্ত্তিকের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। এবার শ্রীধামে যাইয়া শ্রীশ্রীপ্রভু পাথরপুরা জনৈক ব্রজবাসীর গৃহে থাকিলেন। সঙ্গে প্রিয়ভক্ত নবদ্বীপ দাস আছেন। প্রভু সর্ব্বদা আবরণে থাকিতেন।

কালীদহের সিদ্ধ বৈষ্ণব জগদীশ বাবা তৎকালে শ্রীবৃন্দাবনের রত্নস্বরূপ ছিলেন। তিনি প্রভুবন্ধুকে চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন। রাজর্ষি বনমালী রায় ও রঘুনন্দন গোস্বামী মহাশয়কে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদীশ বাবার সঙ্গ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। প্রভু নিজেও অনেক সময় রাত্রিকালে কালীদহ গিয়া জগদীশ বাবার সঙ্গ করিতেন। উভয়ের দর্শনে উভয়ে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেন।

একদিন সন্ধ্যার পর জগদীশ বাবা একাকী আপন মনে নিজ ভজন কুটীরের সম্মুখে আবেগভরে তালে তালে করতালি দিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। হঠাৎ বন্ধুসুন্দর আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়াই জগদীশ বাবার কীর্ত্তনের তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভুর নৃত্যে কীর্ত্তনানন্দ বাড়িয়া উঠিল। কীর্ত্তনোল্লাস বৃদ্ধির সঙ্গে প্রভুর নৃত্যের বেগ বাড়িতে লাগিল। নানা ভঙ্গীতে শ্রীঅঙ্গ দোলাইয়া বন্ধুসুন্দর বাহ্যজ্ঞান অবস্থায় নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ক্রমে প্রভুর বর্দ্ধিত বেগ মহাভাবে পরিণত হইল। শ্রীদেহে প্রলয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। অঙ্গ ঘন ঘন রোমাঞ্চিত ও কণ্টক্তি হইয়া উঠিল। ধূলার কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। নয়নের ধারায় শ্রীমুখের লালায় রজঃ কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। লোমকূপ হইতে রক্তোদ্‌গম হইল। ক্রমে অস্থি গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দীর্ঘতর হইতে লাগিল।

শ্রীহস্ত অনেক দীর্ঘ হইল। সন্ধি শিথিল হওয়ায় শ্রীচরণও দীর্ঘ হইয়া গেল। এক অপরূপ বিরাট দেহ ধূলায় লুটাইতে লাগিল। জগদীশ বাবা শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের ঈদৃশ ভাবদশা দেখিয়া "মহাপ্রভু মহাপ্রভু" বলিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। হুঙ্কার করিতে করিতে বাবাজী মহাশয় বন্ধুসুন্দরকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া বর্দ্ধিতোল্লাসে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর প্রভু প্রকৃতিস্থ হইলেন।

উভয়ে নীরব হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। উভয়ের

দিকে চাহিয়া উভয় মধুর হাসিলেন। কোন্ যুগের যেন কোন্ গূঢ় পরিচয় হাসিটুকুর মধ্যে আত্মবিকাশ করিল।

জগদীশ বাবা এই আশ্চর্য্য দর্শনের কথা শ্রীপাদ রঘুনন্দন গোস্বামিজীকে নিজে বলিয়াছিলেন। বাবাজীর মুখে ঐ কথা শুনিয়া গোস্বামিজীর ঐ লীলা দর্শনের প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠিল। শ্রীশ্রীপ্রভু তার অন্তর জানিয়া একদা দিব্য স্বপ্নযোগে ঐ লীলা দর্শন করাইয়াছিলেন। হস্ত পদ অস্থি-সন্ধি শিথিল হইয়া প্রায় বিংশহস্ত পরিমিত দেহ শ্রীমন্দিরের জগমোহনে পড়িয়া আছেন। আনন্দে গোঁ গোঁ করিতেছেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য গোস্বামী মহাশয় স্বপ্নযোগে দর্শন করিয়াছিলেন।

"ভানু-নন্দিনীর কৃপা"

লালাবাবুর মন্দিরের নিকটে ব্রহ্মকুণ্ডের পার্শ্বে একটি ছোট মন্দিরে নিতাই গৌর সীতানাথ বিরাজ করেন। সেই মন্দিরের দুয়ারে "জয় নিতাই জয় নিতাই" বলিয়া আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া ছোট ছোট একদল ছেলেমেয়ে সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন এক ভাবের পাগল। চারিদিকে লোক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে সেই দৃশ্য দর্শন করিতে।

নবদ্বীপ দাস শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের দিকে চলিতেছেন, হঠাৎ পথের দৃশ্য মন আকর্ষণ করিল। লোক ঠেলিয়া একটু অগ্রসর হইয়া নবদ্বীপ দেখিলেন জয়নিতাই বালকদল লইয়া নাচিতেছেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই জয়নিতাইয়ের দৃষ্টি পড়িল নবদ্বীপ

দাসের প্রতি। অমনি থামিলেন। নবদ্বীপ প্রণত হইলেন। জয়নিতাই প্রভুর বার্ত্তা সুধাইলেন। নবদ্বীপ বলিলেন, "প্রভু পাথরপুরা ব্রজবাসীর বাড়ীতে দোতালার এক কোঠায় আছেন।" জয়নিতাই নবদ্বীপের সঙ্গে চলিলেন। গোবিন্দজী দর্শন করিয়া প্রভু দর্শনে যাইবেন। যে বস্তু দর্শনে সকলের লাগে পাঁচ মিনিট, জয়নিতাইয়ের লাগে এক ঘণ্টা। গোবিন্দজীর নূতন পুরাতন মন্দির দর্শন শেষ করিতে জয়নিতাইয়ের দেড়ঘণ্টা লাগিল। হনুমানজী দর্শনে প্রায় অৰ্দ্ধ ঘণ্টা।

এইরূপে পথে পথে দর্শনে বহু সময় লাগাইয়া সন্ধ্যার শেষে প্রভুবন্ধুর দর্শনে আসিলেন। শ্রীমুখপদ্ম দর্শনে জয়নিতাইয়ের প্রাণ জুড়াইল। ফরিদপুর কীর্ত্তনানন্দের কথা কহিতে কহিতে উল্লাস প্রকাশ করতঃ বলিলেন—"সবই আপনার ইচ্ছা", প্রভু বাধা দিয়া পুনঃ পুনঃ "গোবিন্দ গোবিন্দ" শব্দ উচ্চারণ করিলেন।

জয়নিতাই নবদ্বীপের রাজেন ভায়ার কথা তুলিলেন। তিনি সর্ব্বদা নিতাইচাঁদের ভাবে মাতোয়ারা থাকেন। অতি অপূর্ব্ব তাহার ভাবদশা। জয়নিতাই প্রভুবন্ধুকে বলিলেন, "রাজেন ভায়া ব্রজে আসিতেছেন। আপনারই দর্শনে আপনারই কৃপাকর্ষণে।" শ্রীশ্রীপ্রভু পুনঃ পুনঃ "ও বলতে নাই, ও বলতে নাই, সব ভানু-নন্দিনীর কৃপা, সব ভানু-নন্দিনীর কৃপা" বলিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু নবদ্বীপ দাসকে জয়নিতাইয়ের থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া দিতে বলিলেন। নবদ্বীপ জয়নিতাইয়ের জন্য কেশী-ঘাটের ঠোর ঠিক করিয়া দিলেন।

ব্রজে বড় বাবাজীর প্রভু দর্শন

রসনায় লেহে যেন দরশনে পান।

শ্রীবৃন্দাবন দাস

নীলাচলে থাকা কালে নবদ্বীপের রাজেনবাবু বড় বাবাজী নামে খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তনানন্দে শতশত নরনারী মাতোয়ারা হইয়াছেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে, গুণ্ডিচায়, গম্ভীরায়, জগন্নাথবল্লভে, সিদ্ধ বকুলে সর্ব্বত্রই তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তন নর্ত্তনে গৌরসুন্দরের লীলা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রভু বন্ধুসুন্দরের রচিত গানে তাঁহার পরম উল্লাস পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

বড় বাবাজী মহাশয় (নবদ্বীপের রাজেন বাবু) নীলাচল, ভুবনেশ্বর, কটক, সাক্ষীগোপাল প্রভৃতি স্থানে কীর্ত্তনানন্দের প্লাবন আনিয়া কলিকাতা ফিরিয়াছেন। কলিকাতা পৌঁছিয়াই গঙ্গাস্নান করিবার জন্য জগন্নাথ ঘাটে উপনীত হইয়াছেন। সঙ্গী ভক্তবৃন্দ ঘাটে অপেক্ষা করিতেছেন।

বাবাজী মহাশয় একাকী গঙ্গায় অবগাহন করিয়া অনেকক্ষণ সাঁতার কাটিয়া খেলিলেন। স্তবস্তোত্র আবৃত্তি করিলেন। স্নান করিয়া তীরে উঠিয়া অন্যান্য সঙ্গী ভক্তগণকে স্নান করিতে বলিলেন। সকলে নামিলেন। স্নানান্তে সকলে তীরে উঠিয়া দেখেন বাবাজী মহাশয় কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধানেও কোন সন্ধান মিলিল না।

হরিরায় নামক জনৈক ভক্তলোক ঘাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি ভক্তবৃন্দকে বলিলেন, বাবাজী মহাশয় বলিয়া

বড় বাবাজী
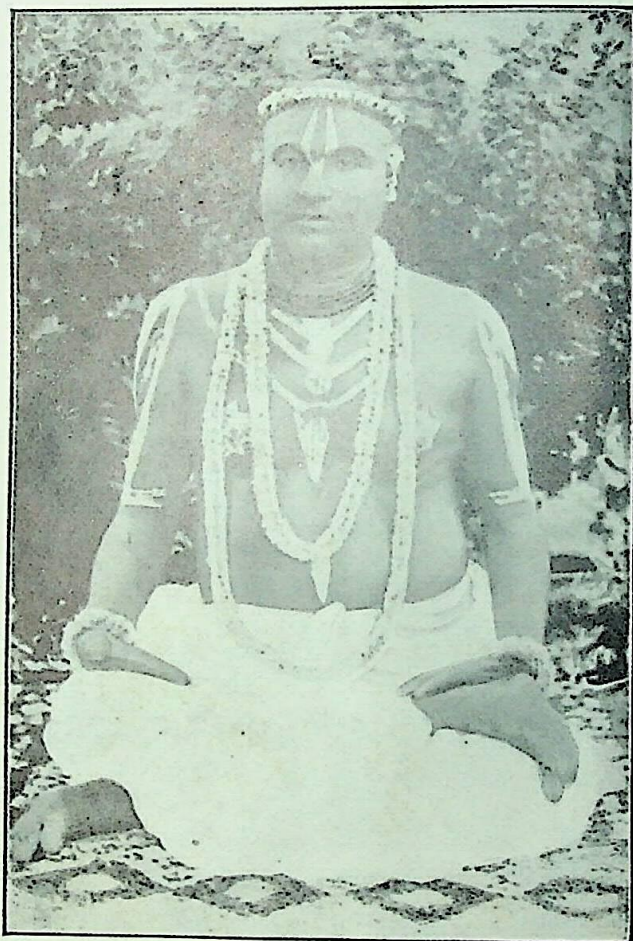
শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণদাস দেব

গিয়াছেন তাঁহার ফিরিতে কিছুদিন বিলম্ব হইবে। সময় মত নবদ্বীপে সকলের সঙ্গে তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে। কেহই কোন রহস্যভেদ করিতে পারিলেন না।

বড় বাবাজী মহাশয় একাকী বহুপথ পর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপনীত হন। কেশীঘাটে জয়নিতাই দেবেন দাদার সঙ্গে মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের দর্শন লালসায় সকালবেলা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুর স্থিতি স্থানে আগমন করেন।

দোতালায় একটি ছোট কোঠায় বন্ধুসুন্দর বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখ ভাগে একটি খোলা ছাঁদ ছিল। সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বড় বাবাজী ও জয়নিতাই গান করিতে লাগিলেন। নয়ন জলে উভয়ের বক্ষ প্লাবিত হইতেছিল। "স্মর রে নব গৌরচন্দ্র মাধব মনোহারী" গান শেষ করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর পদ ধরিলেন,—

কাঁদে আর "রা" "রা" বলে শচীর নিমাই।
"ধা" বলিতে ঢ'লে পড়ে বুঝি রে চেতনা নাই॥
বলে কোথা বৃন্দাবন, মুঞ্জ নিকুঞ্জ কানন ;
(আমার) কোথা ব্রজ-সখা সব কোথা কমলিনী রাই॥
কোথা পিতা নন্দরাজ, সব গোপের সমাজ ;
(আমার) কোথা উপানন্দ তাত কোথা যশোমতী মাই॥
বলে কোথারে ছিদাম, কিঙ্কিনী বসুদাম ;
(আমার) সুবল মঙ্গল কোথা কোথারে দাদা বলাই॥
কোথা বৃষভানুপুর, নন্দগ্রাম কতদূর ;
(কোথা) যাবট যমুনাতট ধবলী শ্যামলী গাই॥

কোথা গিরি-গোবর্দ্ধন, সাধের কুসুম-কানন ;
(আবার) রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, কোথা গেলে দেখ্‌তে পাই ॥
ওহে নবদ্বীপ চাঁদ, আর ক'রো না বিষাদ ;
জগদ্বন্ধু বলে, খত লিখিলে, ধার শোধিতে এলে তাই ॥

গানে আনন্দের বন্যা দেখা দিল। ভানুনন্দিনীর করুণার প্রবাহ যেন অফুরন্ত ধারায় নামিয়া আসিল।

গানের শেষ অন্তরা "জগদ্বন্ধু বলে, খত লিখিলে, ধার শোধিতে এলে তাই" গাহিবার কালে আনন্দ-ঘন-বিগ্রহ বন্ধুসুন্দর প্রেমে ঢল ঢল ভাবে গবাক্ষ খুলিয়া দাঁড়াইলেন। জয়নিতাই "ঐযে" বলিয়া ভাবাবিষ্টভাবে জানালায় দিকে তাকাইয়া ঢুলিতে লাগিলেন। বড় বাবাজী মহাশয়ের অদ্ভুত ভাবদশার উদয় হইল। তিনি অনিন্দ্যসুন্দর বন্ধুসুন্দরের বদনারবিন্দ দর্শন করিয়া আত্মহারা হইলেন। দেহের যেন স্তম্ভদশা। আর নড়িতে পারে না। সর্ব্বাঙ্গ আনন্দ-শিথিল। শুধু ধারা ও কম্প অন্তর রাজ্যের সুখ-সমুদ্রের পরিচয় দিতে লাগিল।

ইহার পর প্রত্যহই প্রভাতে বাবাজী মহাশয় ও জয়নিতাই মাতালের মত নামে মাতিয়া টহল দিয়া বন্ধুসুন্দরের বাসস্থান পর্য্যন্ত আসিতেন। প্রায় প্রত্যহই বন্ধুসুন্দর নিজগৃহের জানালা খুলিয়া দিতেন। কোন কোন দিন নিজে জানালায় দাঁড়াইতেন, কোন কোন দিন দাঁড়াইতেন না। বাবাজী মহাশয় আট দিন শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন। পরে কি যেন কি ইঙ্গিত পাইয়া "দেবেন দাদাকে" বলিয়া বাংলা দেশে চলিয়া আসিলেন।

নবদ্বীপে বড় বাবাজীর প্রভু দর্শন

এই বড় বাবাজী মহাশয়ের প্রথম দর্শন শ্রীবৃন্দাবনে। দ্বিতীয় বার বাবাজী মহাশয় প্রভুর দর্শন করেন শ্রীনবদ্বীপে। ইহা কতিপয় বৎসর পরের কথা, প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করা যাইতেছে।

সেবার রথযাত্রায় রথাগ্রে কীর্ত্তন করিয়া বড় বাবাজী মহাশয় সবে মাত্র নীলাচল হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে ফিরিয়াছেন। কি জানি কোন্ অজ্ঞাত আকর্ষণে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের দর্শন লালসা বাবাজী মহাশয়ের অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রভু কোথায় আছেন তাহা ঠিক জানিতে না পারিয়া দেবেন দাদার (জয়নিতাই) বাড়ীর দিকে রওনা হইয়াছেন। বড়াল ঘাট হইতে যে রাস্তা দ্বাদশ মন্দিরের পাশ দিয়া মহাপ্রভুর বাড়ীর দিকে গানতলা রোডে পড়িয়াছে ঐ রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছেন। যোগনাথ শিবতলা জয়নিতাইর বাড়ী যাইবেন, এই উদ্দেশ্য।

দ্বাদশ মন্দির ছাড়াইতেই পথে নবদ্বীপ দাসের সঙ্গে দেখা। বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপকে শ্রীশ্রীবন্ধুর সেবক বলিয়া বিশেষভাবেই জানেন। শ্রীবৃন্দাবনেও দেখিয়াছেন। অপর একসময় নবদ্বীপ নীলাচলে বাবাজী মহাশয়ের সান্নিধ্যেও কয়েক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। নবদ্বীপকে দেখিয়াই বাবাজী মহাশয় প্রেমোল্লাসে বলিলেন, "তোর সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল হল। প্রভুর দর্শনের জন্য মনটা আকুল হয়েছে। প্রভু কোথায় আছেন জানিবার জন্য দেবেন দাদার বাড়ী যাইতেছিলাম। কেমন যেন অনুভব হইতেছিল প্রভু নবদ্বীপেই কোথাও সন্নিকটে বাস করিতেছেন।

নবদ্বীপ দাস ভক্তিপূর্ণ ভাবে বাবাজী মহাশয়ের চরণে প্রণতঃ হইয়া কহিলেন, "আপনার অনুভব কি ভুল হতে পারে! প্রভু নবদ্বীপেই আছেন। তমালতলা রোডে জগদিদির বাসায় আছেন। জগদিদিকে বোধ হয় চিনেন। রাইমাতার বোন ঝি।" বাবাজী মহাশয় উত্তর করিলেন "হাঁ চিনি, প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামীর শিষ্যা। হরিসভার পিছন দিকটায় বাসা।"

নবদ্বীপ বলিলেন হাঁ তাই, হরিসভার পিছন দিকটাতেই তার বাসা। তবে আপনি একা গেলে দর্শন পাবেন না। আমার সঙ্গে আপনার দেখা হল, একান্ত প্রভুর ইচ্ছায়। আমি প্রভুকে তালাবদ্ধ করে বাহির হয়েছি।

বাবাজী। কেন, তালাবদ্ধ রাখিয়াছ কেন?

নবদ্বীপ। ঐরূপই তাঁহার আদেশ। ভিতরে খিল দিয়া রাখেন, বাহিরে তালা দিয়া রাখি। আমি তালা খুলিলে তিনি খিল খুলিবেন, তবে দেখা হবে।

নবদ্বীপ দাসের সঙ্গে বাবাজী মহাশয় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "তুই যা বললি নবদ্বীপ, কথাটি বড় সুন্দর লাগল। তুই তালা খুলবি, প্রভু খিল খুলবেন। ভক্ত ভগবান দু'য়ের অনুগ্রহ হবে তবে দর্শন মিলিবে। খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন— সাধন পথটাও এই রকম জানিস্। সাধন ভজনের দ্বারা তালা পর্য্যন্ত খোলা যায়। ভিতরের খিল খোলা সম্পূর্ণ তাঁর করুণার উপর নির্ভর করে। তোমাকে পাইয়া ভরসা হইতেছে তালা খুলিবে। কিন্তু খিল খুলিবে কি না তাহা কৃপাময়ই জানেন।

তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটাও কৃপার পূর্ব্বাভাস মনে হইতেছে।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

কিছুক্ষণ বাবাজী মহাশয় আনমনা ভাবে পথ চলিলেন। নবদ্বীপ দাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার হাতে কি আছে আমার হাতে দিন।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "না আমার হাতেই থাকুক। আমি বয়ে নেই। দেওয়ার কালে তোমার হাতেই দিব। ইহাতে প্রভুর জন্য একখানি মটকার কাপড় আছে আর ঠোঙ্গায় আছে প্রভুর সেবার জন্য কিছু মিঠাই। খালি হাতে দেবতা দর্শন করিতে নাই।"

কিছু সময় পরে বাবাজী মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবদ্বীপ, প্রভু কি সারাদিনই ঐরূপ তালাবন্ধ থাকেন?"

নবদ্বীপ। প্রায় সারাদিনই। আমরা দিনে তুইবার কিছু ভোগের দ্রব্য লইয়া তালা খুলিলে, খিল খুলিয়া উহা গ্রহণ করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে দিলেই গ্রহণ করেন। যখন তখন ইচ্ছামত প্রায়ই খোলেন না বা সেবা গ্রহণ করেন না।

বাবাজী। তোমরা প্রভুর সেবক এখানে কে কে আছ?

নবদ্বীপ। তারক গাঙ্গুলী নামক কোলাঘাট নিবাসী একটি ভক্তপ্রাণ ও আমি।

বাবাজী। তোমরা কোথায় থাক?

নবদ্বীপ। আমরা জয়নিতাইয়ের বাড়ীতে থাকি।

বাবাজী। জয়নিতাই কি প্রত্যহ প্রভুর দর্শনে যান?

নবদ্বীপ। যান নিত্যই। কিন্তু গেলেই দর্শন পান না।

জয়নিতাইর মুখে শুনিয়াছি, পাবনায় কোনও সময় প্রভু তাহাকে বলিয়াছিলেন "যত দিন গৌড়দেশে আছি আপনার অবারিত দ্বার।" এই কথা বলার কয়েকদিন পর একদিন প্রভু কপাট খুলিয়াছিলেন না। জয়নিতাই বলিয়াছিলেন, "অবারিত দ্বার বলিয়া আবার দরজা বন্ধ কেন? প্রভু উত্তরে বলিয়াছিলেন, "দেবেন, কাঠের দুয়ার কি দুয়ার?"

কথাটী শুনিয়া বাবাজী মহাশয় হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন। নবদ্বীপ আবার বলিতে লাগিলেন—জয়নিতাই অপর একদিন প্রভুকে বলিতেছিলেন, প্রভু, আপনিও বলিয়াছেন যতদিন গৌড়দেশে আছেন আমার অবারিত দ্বার – তা আপনি কি কখনও গৌড়দেশ ছাড়া নন? "শুনিয়া প্রভু বলিলেন, আমি কি কখনও গৌড়দেশ ছাড়া হতে পারি!" বাবাজী মহাশয় আবারও হুঙ্কার দিয়া নবদ্বীপকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার নয়নে অশ্রু ও অঙ্গে পুলক দেখা গেল। হাতের ঠোঙ্গাটী পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। নবদ্বীপ দাস সামলাইয়া ধরিলেন।

কিছু সময় পর বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।" আবার যেমন ভক্ত তেমনি ভগবান। চতুরতায় কেহ কম নহেন।

কথা বলিতে বলিতে উভয়ে শ্রীশ্রীপ্রভুর থাকিবার গৃহের দ্বারস্থ হইলেন। নবদ্বীপ দাস দরজার তালা খুলিয়া ডাকিলেন। বলিলেন, "প্রভু, বড় বাবাজী মহাশয় আসিয়াছেন দরজা খুলুন।"

বাবাজী মহাশয় বাধা দিয়া কহিলেন "আমার নাম করিও না। আমি প্রভুকে বিরক্ত করিতে আসি নাই। আহা! কত নীরবে

আছেন। তবে এই সেবার দ্রব্যটুকু গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।"

বাবাজী মহাশয়ের কথা শেষ হইতেই খুট করিয়া একটু শব্দ হইল। প্রভু দরজা খুলিলেন। বাবাজী মহাশয় অতি সম্ভ্রমে একপা পিছাইয়া গেলেন। দরজা খুলিয়া প্রভু কপাটের আড়ালে রহিলেন। নবদ্বীপ দাস বুঝিলেন দর্শন দিবেন না। বাবাজী মহাশয় তাহার হাতের সেবার দ্রব্য দুটি নবদ্বীপের হাতে দিয়া কহিলেন—"তুমি প্রভুকে দেও"

নবদ্বীপ দাস কহিলেন, "আপনিই দেন" বাবাজী মহাশয় পুনরায় কহিলেন,······নবদ্বীপ, তুমিই দেও। তুমি দিলেই নিবেন। নবদ্বীপ দাস পরম দীনতার সহিত বলিলেন—"না বাবাজী মহাশয় আপনিই দিন" আপনি দিলেও নিবেন। দেখুন না আপনার জন্য কেমন সুন্দর কপাটটি খুলিলেন। এইরূপ প্রায়ই খোলেন না।

বাবাজী মহাশয় তখন পরম দীনভাবে নতজানু হইয়া কাগজের আবরণ খুলিয়া মটকার কাপড়খানি ও শালপত্রে আবৃত মিঠাইয়ের ঠোঙ্গাটি, প্রভুর ঘরের মধ্যে একটু ঠেলিয়া আগাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই গৃহের দরজা আস্তে আস্তে বন্ধ হইয়া গেল।

বাবাজী মহাশয় উঠিয়া বলিলেন, "চল যাই।" প্রভুর ঘরের বারান্দার ধার দিয়াই রাস্তায় উঠিবার পথ। দুইজনে অগ্রসর হইলেন। হঠাৎ প্রভুর ঘরের রাস্তার দিককার জানালাটা খুলিয়া গেল। উভয়ের চক্ষু পড়িল। মনে হইল যেন একটা তীব্র

আলোর রশ্মি জানালা দিয়া বাহিরে ঠিকরাইয়া পড়িল। নবদ্বীপ দাস ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিলেন—"প্রভু প্রভু"!

বাবাজী মহাশয় স্থির হইয়া গেলেন। গদগদকণ্ঠে কহিলেন, "জয় নিতাই।" জানালা দিয়া শ্রীশ্রীবদনারবিন্দ সুন্দরভাবে দেখা যাইতেছিল। বাবাজী মহাশয় আনন্দাতিশয্যে কেমন যেন একটা অব্যক্ত শব্দ করিলেন। তারপর পথের মধ্যে ধূলায় দণ্ডবৎ করিলেন। জানালা বন্ধ হইয়া গেল।

নবদ্বীপ দাস লক্ষ্য করিলেন, বাবাজী মহাশয় আর আপনাতে আপনি নাই। নবদ্বীপ দাসের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "নবদ্বীপ এখন তুমি তোমার কাজে যাও, আমি এখন মহাপ্রভুর বাড়ীতে যাব।" এইকথা বলিয়া বাবাজী মহাশয় টলিতে টলিতে মহাপ্রভুর বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

দেবী সুরতকুমারীর কৃপালাভ

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মোহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দরশনে যান্তি।
—শ্রীকৃষ্ণদাস

রামবাগানের নিকটে বারবনিতা পল্লী। ষোল নম্বর মানিকতলা লেনে সুরতকুমারী দাসী নাম্নী জনৈকা বারবনিতা বাস করিতেন। তিনি পরমা রূপবতী ও গুণবতী নারী ছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। মেমদের গাউন পরিধান করিলে তাহাকে ইউরোপীয়ান মহিলার

মত দেখাইত। কোনও সময় তিনি বৰ্দ্ধমানের মহারাজ কুমারের ভালবাসার পাত্রী ছিলেন ও তাহার সহিত ইংলণ্ডে বেড়াইতে গিয়াছিলেন।

সুরতকুমারীর একটি আদরের কন্যা ছিল। কন্যাটিকে প্রাণের মত ভালবাসিতেন ও তাহার সকল আব্দার মিটাইতেন। হঠাৎ দৈবনির্ব্বন্ধে কন্যাটির অকালমৃত্যু ঘটে। ফলে, শোকাকুলা মাতার সংসারে অনাসক্তি আসে। শোকাঘাতে পাগলিনীর মত হইয়া সান্ত্বনা লাভের আশায় তিনি নানা স্থানে ছুটাছুটি করিতে থাকেন।

কলিকাতা গঙ্গাতীরে দুই নম্বর নবাব লেনে জগন্নাথ দেবের এক সুদৃশ্য মন্দির আছে। সেখানে তখন একজন হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ মোহান্ত সেবাইত ছিলেন। শোকতপ্তা সুরতকুমারী মোহান্তজীর কাছে আসিতেন। মোহান্তজী তাঁহাকে মানব জীবনের নশ্বরতা ও ভগবদ্ভজনের সার্থকতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশে সুরতকুমারীর প্রাণে শান্তি আসিত। একদিন মোহান্তজী বলেন, "মা, আপনি আগামী রথযাত্রায় পুরীধামে যান। জগন্নাথজীউর দর্শনে প্রাণে আনন্দ পাইবেন। অধিকন্তু, ঐ সময় পুরীধামে বহু সাধুসজ্জন পদার্পণ করেন। তাঁহাদের দর্শনে জীবন ধন্য হইবে। তাঁহাদের উপদেশে জীবনে ভজন-শক্তির উদয় হইবে।" মোহান্তজীর উপদেশ অনুসারে সুরতকুমারী রথযাত্রায় পুরীধাম গমন করেন। রথস্থ জগদ্বন্ধু দর্শন করিয়া প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করেন।

স্বর্গদ্বারে জনৈক পাণ্ডার গৃহে সুরতকুমারী থাকিবার স্থান

করেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি পুণ্যক্ষেত্রে সমাগত সাধুগণের দর্শন মানসে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সিদ্ধবকুল পুরীধামের একটি বিশিষ্ট পুণ্যস্থান। ঠাকুর শ্রীহরিদাস এই স্থানে ভজন করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দরের বহু লীলা-স্মৃতি-বিজড়িত এই স্থান ভক্তগণের নিত্য স্মরণীয়।

একদিন সিদ্ধবকুলতলে বহু ভক্ত-যাত্রী পরিবৃত অবস্থায় নবদ্বীপের বড় বাবাজী শ্রীরাধারমণ চরণ দাস শ্রীশ্রীনিতাই গৌর-সুন্দরের লীলা-তত্ত্বকথা আলোচনা করিতেছিলেন। বহু নর নারীর সঙ্গে সুরতকুমারীও অনতিদূরে বসিয়া বাবাজী মহাশয়ের মধুর কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। নানা কথা প্রসঙ্গে বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর আবার স্বগণে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান নাম প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর। অতি সংগোপনে আছেন।" কথাটি শুনিয়া সুরতকুমারীর মনে পরম আগ্রহ জন্মিল। আরও ভাল করিয়া তাঁহার সংবাদ জানিতে প্রবল ইচ্ছা জাগিল। ইচ্ছা হইল, বাবাজী মহাশয়ের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু এত লোকের ভিড়, যে তাহা ঠেলিয়া কাছে যাওয়া অসম্ভব মনে হইল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন।

ক্রমে আলোচনার আসর ভাঙ্গিয়া গেল। অধিকাংশ লোক প্রসাদাদি গ্রহণের জন্য নানা দিকে চলিয়া গেল। বাবাজী মহাশয়ও উঠি উঠি করিতেছেন। অবকাশ বুঝিয়া সুরতকুমারী মহারাজের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী মহাশয়, আপনি যে বলিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ দেব জগদ্বন্ধু রূপে অবতীর্ণ

হইয়াছেন তিনি কোন্ জগদ্বন্ধু ? কলিকাতার অতুল চম্পটী আর নবদ্বীপ দাস যার ভক্ত সেই জগদ্বন্ধু কি ?" বাবাজী মহাশয় উঠিতে উঠিতে তাহার স্বভাবসুলভ হাস্যময় বদনে বলিলেন, "হাঁ মা, তিনিই।

এই অভিনব বার্ত্তা পাইয়া সুরতকুমারী যেন কেমন হইয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—এইত সেদিন রামবাগান ডোমপাড়ার হরিসভায় কত কীর্ত্তন-সমারোহ করিয়া জগদ্বন্ধু আসিল, আমার বাড়ীর কাছ দিয়া গেল, একবার দরজা খুলিয়াও দেখিলাম না! কতদিন গভীর রাত্রে চম্পটীকে শুনিয়াছি "হরি হরিবোল" ধ্বনি করিয়া পাড়া কাঁপাইয়া চলিয়া গিয়াছে, কোনদিনও তাকাইয়া দেখি নাই। শুনিয়াছি, পাড়ার যাদুমণি বাইজী চম্পটীর কৃপায় বৈষ্ণবী হইয়াছে। কিন্তু আমার তো কোন দিন আগ্রহ জাগে নাই। ডোমপাড়ার কীর্ত্তনের ধ্বনি কত দিন কানে আসিয়াছে, কোলাহল ছাড়া তাহা আর কিছু বলিয়া মনে করি নাই। কী ভুলই করিয়াছি! হায়, আজ কোথায় গিয়া জগদ্বন্ধুর দেখা পাইব!

ভাবিতে ভাবিতে সুরতকুমারী পুরীধাম হইতে কলিকাতা চলিয়া আসেন। যখন পুরীধাম গিয়াছিলেন, তখন মনে সংকল্প করিয়া গিয়াছিলেন আর বাংলায় ফিরিবেন না। বাকীজীবন সমুদ্রতীরে থাকিয়া নিত্য জগন্নাথ দর্শন করিয়া কাটাইবেন। সিদ্ধবকুলতলে মহাপুরুষের শ্রীমুখের নব অবতারের বার্ত্তা সকল সংকল্প ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল।

কলিকাতা নিজ বাসভবনে পৌঁছিয়া সুরতকুমারী রামবাগানে

অনুসন্ধান লইলেন। জানিলেন, প্রভু শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছেন। প্রভুর সেবার জন্য কিছু দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া সুরত শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে চলিলেন। বৃন্দাবন যাইয়া নানাস্থানে খোঁজ খবর করিয়া জানিলেন যে দুই তিন দিন পূর্ব্বে প্রভু ফরিদপুর চলিয়া গিয়াছেন।

দর্শনের উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া সুরতকুমারী বৃন্দাবনের বিশেষ কিছু দর্শনাদি করিলেন না। শ্রীগোবিন্দজীর দুয়ারে প্রণত হইয়া যেন জগদ্বন্ধু দর্শন ভাগ্যে ঘটে এই প্রার্থনা করিলেন। দেবী কলিকাতা ফিরিলেন। আবার কয়েকদিনের মধ্যেই ফরিদপুর যাত্রা করিলেন। ফরিদপুর পৌঁছিয়া সুরতকুমারী ব্রাহ্মণকান্দা বাকচর বদরপুর অনুসন্ধানে জানিলেন, প্রভু পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন। প্রভুর লীলার বৈচিত্র্য বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কলিকাতা ফিরিয়া পুনরায় শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে ছুটিলেন।

ব্রজের পথে উন্মাদিনী

বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া প্রভুর সংবাদ জনে জনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রভু অনেক সময়ই গোপনে আসা যাওয়া করিতেন। অনেকেই তাঁর সন্ধান রাখিতেন না। উন্মাদিনীর মত সুরতকুমারী ব্রজের গলিতে গলিতে "প্রভু জগদ্বন্ধু কোথায় কেউ জান—" বলিতে বলিতে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তখন তাহাকে পূর্ব্বরাগবতী বিরহ-বিধূরা ব্রজবালা বলিয়াই মনে হইত।

ইতিপূর্ব্বে সুরতকুমারী বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে সোমনাথ ব্রজবাসীর সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। আজ ব্রজের পথে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই সোমনাথ ব্রজবাসীর সঙ্গে সাক্ষাত হইল। "ব্রজবাসী, প্রভু বন্ধুসুন্দর কোথায় বলিয়া দিতে পারেন?" সুরতকুমারীর এই কাতর জিজ্ঞাসায় ব্রজবাসী বলিলেন, "ওগো মাতা, তিনি যে আজ সকালেই ব্রজে আসিয়াছেন।"

"প্রভু ব্রজে আসিয়াছেন" "কোথায় আছেন" সুরতকুমারী আর্ত্তের মত সোমনাথের পায়ে ধরিলেন। "বলুন না কৃপা করিয়া কোথায় আছেন তিনি!" সোমনাথ বলিলেন, "আচ্ছা মাতা, আমি তোমাকে কথা দিতেছি, আমি জানিয়া আসিয়া তোমাকে খবর দিব।"

কয়েক ঘণ্টা পরে সোমনাথ আসিয়া সংবাদ দিলেন "প্রভু কেশীঘাটে লছমীরাণীর কুঞ্জে আছেন।" শোনামাত্র প্রেমপাগলিনী লছমীরাণীর কুঞ্জে ছুটিলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন, ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে প্রভু রঘুনন্দন গোস্বামীর রাধামাধব কুঞ্জে গিয়াছেন।

"কোথায় রাধামাধব কুঞ্জ" যাহাকে সম্মুখে পান তাহাকেই সুধাইতে লাগিলেন। অনেক খুঁজিয়া সেখানে গিয়া পৌঁছিলেন। দেখিলেন, সাধনের ধন সেখানে নাই। কোথায় গিয়াছেন কেহ বলিতে পারেন না। কেহ বলেন রাধাকুণ্ডে, কেহ বলেন গোবর্দ্ধনে, কেহ বলেন গোবিন্দ কুণ্ডে।

তিন দিন ধরিয়া উন্মাদিনী অবিরাম অনুসন্ধান করিলেন। সর্ব্বত্র পাতি পাতি করিয়া খুঁজিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যেখানেই যান সেইখানেই গিয়া শোনেন কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অন্যত্র গিয়াছেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সুরত রাত্রি দিবা কেবল ছুটিতে লাগিলেন। রাস্তার লোক বলিত, ক্ষেপী ক্ষেপিয়াছে।

সর্ব্বদা নয়নধারায় তার বক্ষ ভিজিত। "হা প্রভু হা প্রভু" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িত! "সখি, কোন্ গলিমে গিয়া মেরা শ্যাম" বিধূরাবালার বিরহগীতি মুখে লাগিয়া থাকিত। উঠিতে বসিতে বলিতে "জগদ্বন্ধু" জীবন-তারা হইল। এই ভাবে তিনদিন তিনরাত্র কাটিয়া গেল। মনে হইত, এ উন্মাদিনী প্রাণে বাঁচিবে না।

চতুর্থ দিনে শুনিলেন, প্রভু পুনরায় কেশীঘাটে লছমী-রাণীর কুঞ্জে আছেন। ভগ্নহৃদয়া সুরত মনে মনে ভাবিলেন আমি পতিতা, পাপীয়সী নিতান্ত ভাগ্যহীনা। তাই প্রভুর দর্শন যোগ্যতা আমার নাই। আমাকে দর্শন দিবেন না বলিয়াই প্রভু এই ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আমার অনুসন্ধানে তাঁহার কষ্ট হইতেছে।

সুরত ভাবিলেন আমি হতভাগিনী, আর প্রভুকে কষ্ট দিব না। আর আমি দর্শন আশায় নিকটে যাব না। যখন তাঁহার নিজের কৃপা হয় দর্শন দিবেন, না হয় কদাপি না দিবেন। দূরে থাকিয়া যাহাতে কিঞ্চিৎ সেবাভাগ্য পাই, সেই চেষ্টাই করিব। যদি সেবাগ্রহণ করেন তবেই জীবন ধন্য মানিব।

এইরূপ ভাবিয়া তিনি আর দর্শনের চেষ্টা করিলেন না।

প্রভুর সঙ্গে সেবক কেহ আছেন কি না, তিনি কোথায় থাকেন ইত্যাদি খোঁজ করিয়া জানিলেন, নবদ্বীপ দাস সঙ্গে আছেন। সুরত নবদ্বীপ দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার নিকট প্রভুর সেবায় জন্য যাহা সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহা দিলেন।

নবদ্বীপ দাসের নিকট অনেকক্ষণ ধরিয়া খুটি নাটি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কি কি দ্রব্য সামগ্রী প্রভুর সেবায় লাগে তাহা জানিয়া লইলেন। এক একদিন এক এক জিনিষ আনিয়া নবদ্বীপ দাসের হাতে দিতে লাগিলেন। পতিতপাবন পরম-দয়াল বন্ধুহরি সুরতকুমারীর প্রেমভক্তিমাখা সেবার দ্রব্য-সকল সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। না করিয়া উপায় কি ? নিজ শ্রীমুখে অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতং অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

"পত্র, পুষ্প, ফল, জল যে আমাকে যাহা ভক্তির সহিত প্রদান করে, সেই সেই ভক্তিমাখা উপহার আমি গ্রহণ করিয়া থাকি।" সুরতকুমারীর দেওয়া প্রত্যেকটি দ্রব্যে ব্রজের প্রেম-মাধুরী মাখান থাকিত। ভালবাসার ধন ভালবাসায় ধরা পড়িলেন।

সেবাভাগ্য ও স্বপ্নভাগ্য

স্নুরতকুমারী কেশীঘাটের নিকট একটি বাসস্থান ঠিক করিয়া সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য, প্রভুর সেবাভাগ্য লাভ করিবেন। প্রত্যহই একবার নবদ্বীপ দাসের সঙ্গে দেখা করেন—কি দ্রব্য সেবায় চাই জানিয়া লন—দুষ্প্রাপ্য হইলেও শত চেষ্টা করিয়া তাহা সংগ্রহ করেন। এইভাবে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইল।

ভক্তের সেবালালসা ভগবানকে পর্য্যন্ত লুব্ধ করিয়া ফেলে। প্রভু বন্ধুসুন্দর নবদ্বীপ দাসের দ্বারা মাঝে মাঝে স্নুরতকুমারীর নিকট এটা ওটা চাহিতে লাগিলেন। চানাভাজা, পরটা, লাড্ডু, কচুরী, পেরা ইত্যাদি দ্রব্য বালকের মত চাহিতেন। প্রভু চাহিয়াছেন শুনিলে স্নুরত আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। সাধ্যমত দ্রব্যাদি নিজে তৈয়ারী করিয়াই দিতেন। যাহা নিজে তৈয়ারী করিবার যোগ্যতা ছিল না, তাহা ভাল দোকান হইতে অতি পবিত্র ভাবে তৈয়ারী করাইয়া প্রভুর সেবায় লাগাইতেন।

স্নুরতের দর্শন লালসা অন্তরে তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাহিরে কোন চেষ্টা দেখাইলে পাছে প্রভু স্থান ত্যাগ করিয়া যান, এই আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট রহিতেন। মনে মনে প্রভুর দর্শনের ধ্যান করিতেন। ক্রমে স্বপ্নে দর্শন পাইতে লাগিলেন

একদিন স্বপ্নে দেখিলেন—পরম জ্যোতির্ম্ময় এক পুরুষ একখানি বাঁধাঘাট আলো করিয়া স্নান করিতেছেন। স্নুরত

পরম কৃপাপাত্রী "শ্রীশ্রীস্নুর"
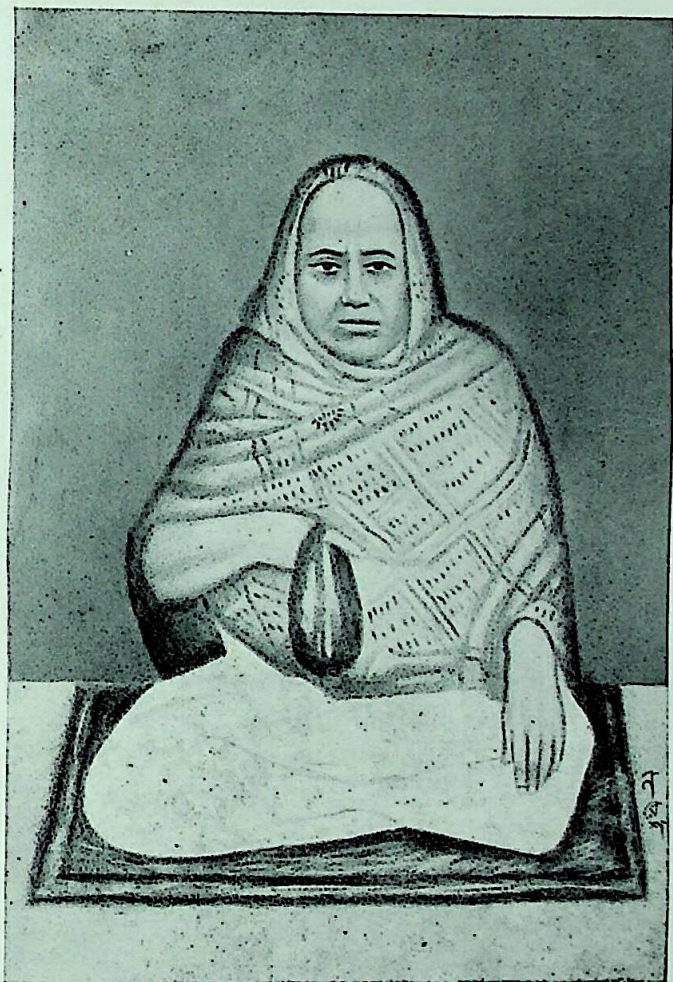
শ্রীমতি সুরতকুমারী দেবী

যেন কলসী কক্ষে করিয়া যমুনায় জল আনিতে যাইয়া রূপ দর্শন করিতেছেন। রূপের ছটায় তাহার অন্তর বাহির উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। গণ্ড বক্ষ ছাপাইয়া তার নয়নে জল ঝরিতেছে। সত্যসত্যই জাগিয়া দেখিতেন বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে। আহা! স্বপ্ন কেন ভাঙ্গিল বলিয়া শিরে করাঘাত করিতেন।

অপর একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, একটি প্রশস্ত পথ ধরিয়া এক বিরাট পুরুষ চলিয়া যাইতেছেন। পুরুষবরের সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে ঢাকা। বস্ত্রের আড়াল দিয়া শ্রীবদন ও বক্ষের কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীঅঙ্গের মাধুর্য্যময় সুষমা দর্শন করিয়া সুরত 'ঐ যে প্রভু' 'ঐ যে প্রভু' বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়াছেন। 'ঐ যে প্রভু ঐ যে প্রভু' বলিতে বলিতে সুরতের সেই দিনকার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। তারপর দুই তিন দিন "ঐ যে প্রভু ঐ যে প্রভু" শব্দ তাহার মুখে লাগিয়াই ছিল। স্বপ্নের আনন্দাবেশ "বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"

"আজ সুরু দেখে ফেলেছে"

সুরতকুমারী নিজে পরমাসুন্দরী ছিলেন এবং অতীব লজ্জাশীলা রমণী ছিলেন। যমুনার ঘাটে বহু লোকসংঘট্ট বশতঃ তিনি অঘাটে স্নান করিতেন। একদিন অতি প্রত্যুষে ঐরূপ অঘাটে স্নান করিতেছেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন চারিজন বাহক একখানা পাল্কী বহন করিয়া লইয়া আসিল।

তাহারা যমুনায় সেই অঘাটায় পাল্কীখানি নামাইল ও জলে নামাইয়া অর্দ্ধ নিমজ্জিত করিল।

এইরূপ ব্যাপার সুরতকুমারী কোন দিন দেখেন নাই। তিনি ভাবিলেন, কোনও বড় লোকের পর্দ্দানসী স্ত্রী হয়ত এই ভাবে যমুনায় স্নান করিতে আসিয়াছে। সেই স্ত্রীলোকটি কত রূপবতী ও কত মূল্যবান অলঙ্কার তার গায়ে আছে ইহা দেখিবার জন্য সুরত পাল্কীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুরত নিকটে দাঁড়াইয়াছে, অমনি পাল্কীর দরজা খুলিয়া গেল। সুরত দেখিলেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দুই হাতে যমুনার জল তুলিয়া মাথায় দিতেছেন। রূপের প্রভায় নয়ন মন স্নিগ্ধ শীতল হইয়া গেল। এমন মধুর দর্শন অল্প সময় মাত্র হইল বলিয়া অজ্ঞাতসারে এক দারুণ অতৃপ্তিও প্রাণে লাগিয়া রহিল।

পাল্কীর দরজা বন্ধ হইয়া গেল। বাহকগণ নীরবে বহন করিয়া লইয়া গেল। সুরতও তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া বাসায় গেলেন। বাসায় গিয়া প্রভুর দ্রব্যাদি নিত্য যেমন তৈয়ারী করেন সেইরূপ তৈয়ারী করিতে তন্ময় হইয়া গেলেন। কি জানি কেন মনের মধ্যে একটি অফুরন্ত আনন্দের উৎস উদ্বেলিত হইতেছিল।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর স্নান করিয়া কুঞ্জে যাইয়া নবদ্বীপ দাসকে বলিলেন "নবা রে, আজ সুরু আমায় দেখে ফেলেছে।" তৎপর নবদ্বীপ সেবার দ্রব্যাদি লইতে সুরতকুমারীর বাসায় আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, তুমি নাকি আজ প্রভুকে

দেখিয়াছ ?” “কৈ, না তো, কে বলিল আপনাকে ?” সুরত উত্তর করিলেন।

নবদ্বীপ হাসিয়া বলিলেন “হ্যাঁ গো, প্রভু পাল্কীতে যমুনাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—“সুরু আজ আমায় দেখে ফেলেছে !” আর বুঝিতে বাকী থাকিল না। আজ সকাল হইতে কেন যে মনের তলে অফুরন্ত আনন্দের উৎস খেলিতেছে তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। হায় হায়! কেন ভাল করিয়া দেখিলাম না ভাবিয়া সুরত অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

হায় রে! এত নিকটে পাইয়াও প্রাণ ভরিয়া, নয়ন ভরিয়া দেখিলাম না কেন ? আত্মনিবেদন করিলাম না কেন! হায় রে আর কি পাব, আর কি হবে। এ ভাগ্য কি বারবার হয়! কি করি কোথায় যাই। সুরতকুমারী শিরে আঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

“আজও দেখেছে”

সুরতকুমারী প্রভুর চিন্তায় নিজের আহার বা বসন ভূষণের কথা একেবারেই ভুলিয়া থাকিতেন। একসময় সোনাগাছি পল্লীর সর্ব্বপেক্ষা বিলাসিনী ছিলেন যিনি, আজ তিনি ব্রজের ধূলায় পাগলিনী। ছিন্ন মলিন আলু থালু বেশভূষা, রুক্ষ কেশ, দীনতা ভরা দৃষ্টি।

যখন পথে চলেন, পথের ছেলের দল পাগলী পাগলী বলিয়া পিছনে ছুটে। তাই যেখানে বেশী লোকজন সে পথ দিয়া তিনি প্রায়ই চলেন না। গলিঘুচি ঘুরিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যান। আপন মনে নাচেন, গান করেন, হাস্য করেন, জয় প্রভু, জয় জগদ্বন্ধু, জয় প্রভু জগদ্বন্ধু উচ্চারণ করেন। দর্শন লালসা তীব্রতর হইয়া উঠে। ভয়ে, কোন চেষ্টা করেন না। পাছে, চলিয়া যান, সেবায় বঞ্চিত হন।

রজকদের বস্ত্র শুকাইবার একটি ছোট মাঠ। তার মধ্যদিয়া কোন পথ নাই। তবু ক্বচিৎ কখনও লোক চলে। লোকদৃষ্টির অন্তরাল দিয়া চলিবার মানসে একদিন প্রেমোন্মাদিনী সুরত-কুমারী ঐ ছোট মাঠটির কিনার ধরিয়া চলিয়াছেন। মাঠটুকু ছাড়াইতেই একটি অতি সরু নোংরা গলি। কালেভদ্রে সে গলিতে লোক হাটে। সুরত সেই গলির মধ্যে দুই চারি পা অগ্রসর হইয়াছেন। অমনি সম্মুখে এক অভাবনীয় দৃশ্য। আজ কিন্তু স্বপ্ন নয়, বাস্তবেই স্বপ্নের দেবতার দর্শন।

এক দীর্ঘাকৃতি নয়নমনোহারী মূর্ত্তি, সর্ব্বাঙ্গ গরদের কাপড়ে ঢাকা। পরিধানে গরদের বস্ত্র। চরণ পর্য্যন্ত দোদুল্যমান কোচা। শুধু শ্রীচরণের চম্পককলি-সদৃশ অঙ্গুলিগুলি দৃষ্ট হইতেছে। বাম শ্রীহস্তেরও কয়েকটি অঙ্গুলি বস্ত্রের বাহিরে আছে। দক্ষিণ শ্রীহস্তে একটি কমণ্ডলু, তাই কবজী পর্য্যন্ত দেখা যায়। শ্রীমস্তক ওষ্ঠ ও নাসিকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বস্ত্রাবৃত। পটলচেরা চক্ষু দুইটি মাত্র উন্মুক্ত।

সুরত দেখিলেন, দুইটি পদ্মপলাশ লোচন। রক্তপদ্ম তুল্য

শ্রীকর ও শ্রীচরণ। বস্ত্র ভেদ করিয়া যে অঙ্গজ্যোতি বাহির হইতেছে তাহা তপনের কিরণকে বিমলিন করিতেছে। সেই চক্ষুতে চক্ষু পড়িল। সুরত নিজ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সঙ্কোচে ছোট গলির একপাশে অতি সন্তর্পণে সুরত আপনাকে সরাইয়া লইলেন। খঞ্জন গমনে পুরুষসুন্দর চলিয়া গেলেন। সুরত জানে না কি দেখিলেন। কাহাকে দেখিলেন। তবু আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। কোনমতে টলিতে টলিতে গৃহে চলিয়া গেলেন। সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ভরিয়া গিয়াছে। সর্ব্ব দেহ আনন্দে জড়তা প্রাপ্ত হইতেছে।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। নবদ্বীপ দাস আসিলেন। "সুরদি সুরদি" বলিয়া ডাকিতে সুরতের সংজ্ঞা ফিরিল। নবদ্বীপ বলিলেন, আপনি তো আজও প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন। কুঞ্জে গিয়া প্রভু আমাকে বলিলেন, "সুরু আজও দেখেছে।"

সুরত তখন বুঝিলেন, যিনি কৃপা করিয়া গলিপথে দর্শন দিয়াছেন তিনি সেই ধ্যানের ধন বন্ধুসুন্দর। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আহা! কি মন্দ ভাগ্য আমার, পাইয়াও চিনিলাম না! কেন তখন পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম না! কেন শ্রীচরণ দুখানি মস্তকে বক্ষে ধারণ করিলাম না! কেন নয়ন ভরিয়া রূপসুধা আস্বাদন করিলাম না! নিতান্তই হতভাগিনী আমি, তাই এ হেন প্রাপ্ত-রত্ন হারাইলাম।

———

"প্রভু আমার সাক্ষাৎ গৌর"

নিরমল গোরাতনু, কষিত কাঞ্চন জনু,
হেরইতে পড়ি গেনু ভোর।

একদিন স্বরতকুমারী শ্রীশ্রীপ্রভুর থাকিবার ঘরের বাহিরে ঝাট দিতেছেন। জানালা দিয়া এক টুকরা কাগজ উড়িয়া তাহার সম্মুখে পড়িল। শ্রীশ্রীপ্রভুর হস্তাক্ষর-অঙ্কিত কাগজ খণ্ড তুলিয়া লইয়া স্বরত পরম ভক্তি সহকারে নিজমস্তকে স্পর্শ করাইলেন। সজল নয়নে পাঠ করিলেন,—

"তুমি প্রত্যহ সেবার জল জোগাইবে" কথা কয়েকটি অতি সাধারণ। কিন্তু স্বরতের অন্তরে যে প্রবল দর্শন-লালসা ও অদর্শন-জনিত সন্তাপ বিদ্যমান ছিল, তাহা উহাতে অনেক প্রশমিত হইয়া গেল। প্রভু নিজে সেবা চাহিলেন—ইহাই তো দাসীর জীবনের চরম সার্থকতা। তখন ঝাড়ু দিয়া স্বরত যে ধূলিগুলি একত্র করিয়াছিল, আনন্দে বিহবল হইয়া তাহার মধ্যেই গড়াগড়ি করিতে লাগিল।

প্রভুর আজ্ঞা পালন স্বরতের জীবনের ব্রত হইল। স্বরত স্থূলাঙ্গী। চিরকাল সুখে লালিত, বিলাসিতায় বর্দ্ধিত। কলসী কাঁখে করিয়া জল আনা তাহার পক্ষে মোটেই সহজ সাধ্য নহে। তথাপি প্রত্যহ যমুনা হইতে এক কলসী করিয়া জল কক্ষে তুলিয়া অতি ধীরে পথ চলিয়া ধ্যানাবিষ্টের মত আসিয়া প্রভুর গৃহের সম্মুখে রাখিতেন।

তাহার কলসীটি লইয়া যমুনার ঘাটে যাইবার রূপ, গিয়া যমুনাকে প্রণাম করিবার ভাব, কলসীটি মার্জ্জন করিবার প্রণালী,

বস্ত্রপূত করিয়া জল ভরিবার রীতি, লইয়া গৃহে ফিরিবার ভঙ্গি, তখনকার তাহার মুখের ও চক্ষের নিরুপম ভাবব্যঞ্জকতা, দেখিলে মনে হইত, জল নহে, হৃদয়ের প্রীতিমধুই কলসী ভরিয়া প্রাণবল্লভের সেবার জন্য বহিয়া লইয়া চলিয়াছেন ব্রজের কোন গোপবালা।

একদিন সুরত ঐরূপ অনুরাগ ভরে যমুনার জল লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন প্রভুর গৃহের দরজার সম্মুখে। কক্ষ হইতে কলসী নামাইবেন এমন সময় খট করিয়া দরজা খুলিয়া গেল। দরজা খুলিবার শব্দে সুরতের মনে হইল বুঝি বা সেবার জল ঘরের মধ্যে রাখিয়া যাইতেই প্রভুর ইচ্ছা। কিন্তু চক্ষু তুলিয়া চাহিতে যাহা দেখিলেন তাহাতে চমকিত হইয়া সঙ্কোচে তিন পা পিছাইয়া গেলেন।

দরজা জুরিয়া বন্ধুসুন্দর দাঁড়াইয়া আছেন। দরজা বিরাট, তদপেক্ষাও বিরাট শ্রীদেহ। শ্রীমস্তকের অধিকাংশ চৌকাঠে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীবক্ষের কিয়দংশ উন্মুক্ত, তাহা হইতে যেন চাঁদের জোৎস্না ছড়াইতেছে। সুরত আনন্দে কাঁপিতে লাগিলেন। নয়নে যাহা দেখিলেন, হৃদয়পটে তাহা আঁকিলেন। মুখে কেবল দু'টি শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইতে লাগিল— "গৌর! গৌর! সোনার গৌর!!"

ধীরে দরজার কপাট বন্ধ হইয়া গেল। প্রকৃতিস্থ হইয়া গৃহে ফিরিতে দেবীর অনেক সময় লাগিল। দেহে মনে প্রাণে যেন একটা বিদ্যুতের ক্রিয়া হইয়া গিয়াছে। আর যেন কোন চেষ্টা নাই। যাহা পাইলে সকল পাওয়া শেষ হইয়া যায়, তাহা

মিলিয়াছে। বিরহ-তপ্ত মরুহৃদয়ে ভক্তি-যমুনার প্লাবন আসিয়া চিরতরে স্নিগ্ধ শীতল করিয়া দিয়াছে। পাওয়া চাওয়াকে ছাড়াইয়া গিয়া যেন একেবারে নিশ্চেষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন পর বন্ধুসুন্দর বাংলায় ফিরিয়া আসেন। জানিতে পারিয়া সুরতকুমারীও কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এইবার প্রভু কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ দুই মাস শ্রীবৃন্দাবনে নানা স্থানে বাস করেন। দশ পনর দিন পরপর স্থান বদলাইতেন। সম্ভবতঃ আপনাকে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করিয়াই ঐরূপ করিতেন। অথবা ভিন্ন ভিন্ন লীলাস্থানে ভাবমাধুর্য্য স্বানুভাব আস্বাদনের জন্য স্থান বদলাইতেন—তিনিই জানেন কেন কি জন্য কি করিতেন। পাথরাপুরা, লছমীরাণীর কুঞ্জ, অযোধ্যাওয়ালীর কুঞ্জ, ছত্রিশগড় রাজার কুঞ্জ, রঘুনন্দন গোস্বামীর কুঞ্জ, জ্ঞানগুধরী, রাধাকুণ্ড, কুসুমসরোবর, এই সকল স্থানে অনেক সময় বাস করিয়াছেন। অনেক সময় সমস্ত রাত ব্রজের পথে পথে যমুনা তটে গোচারণ মাঠে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। এই সময় শ্রীমান রমেশচন্দ্রকে কতিপয় উপদেশ পূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। রমেশের স্বাস্থ্যরক্ষা, চরিত্র গঠন, বালকগণের জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন, ফরিদপুর সহরে কীর্ত্তন প্রচারণ ও অন্যান্য ধর্ম্মীয় আচরণ সম্বন্ধে প্রভু কতটুকু চিন্তিত থাকিতেন, পত্রে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমনও দেখা যায়, দুই তিনদিন পর পরও পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

ব্রজ হইতে রমেশের প্রতি

বৃন্দাবন, ১লা নভেম্বর, ১৮৯৭

"বাড়ীতেই কীর্ত্তন করিও। বাহ্য লক্ষণ সর্ব্বদা ত্যাগ করিও। তবে শান্তি হইবে। পরচর্চ্চা কদাপি অন্তরে বা কর্ণে স্থান দিও না। হরিতকী, তুলসী, ধাত্রী ইত্যাদি প্রতিদিন অধিক গ্রহণ করিও। প্রতিদিন সঙ্গীসহ যেন শেষরাত্রে টহল হয়। আর কিছু শীঘ্র চাইয়া বিরক্ত করিব না।"

প্রভুর পত্র পাইয়া রমেশচন্দ্র আনন্দে আপ্লুত হইয়া প্রিয় অনুগত ছাত্রদিগকে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। অনেকেই প্রভুর হস্তাক্ষর নকল করিয়া লইলেন। তখন অনেকে প্রভুর হস্তাক্ষরের অনুকরণেই লিখিতেন। প্রভু ভক্তগণের প্রাণ। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাই তাহাদের কাছে অতি মধুর লাগিত। প্রভুও অনেক সময় নানাপ্রকার ভঙ্গী করিয়া রসিকতা করিয়া পত্র দিতেন। প্রভুর পত্রের উত্তর শীঘ্র পাইবার জন্য এবং পোষ্টকার্ড টিকেট কিনিতে প্রভুর অসুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া বালকগণ প্রভুর চিঠির মধ্যে অনেক টিকেট দিয়া দিয়াছিলেন। উত্তরে প্রভু লিখিলেন—"টিকিস ত মুই ভাই পেনু। হরিবল। স্মৃতি যে ফের জাগছে টাগছে, এ মোর বড় ভাগ্যিস বটে। না জানি কোন ঘাটে আজ বা মুখ ধুইচি।"

"হাজরেওক্ৎতে চেরাগ লাগানওয়ালে ফকীর"

হাজ অর্থ সাঁঝ বা সন্ধ্যাবেলা। ওক্ৎত পদে সময় বুঝায়। চেরাগ বলে প্রদীপকে। লাগান অর্থ প্রজ্জ্বলিত করান। কথাটির

অর্থ হইল সন্ধ্যাকালে প্রদীপ প্রদানকারী ফকীর। কথাটির গূঢ় তাৎপর্য্য হইল যে, ভক্তের জীবনে যখন দুঃখের সন্ধ্যা নামে, তখন কৃপার আলো জ্বালাইয়া যিনি সকল দুঃখ দূর করেন।

বন্ধুর চিঠির ভাব ভাষায় বালকভক্তগণের কী যে আনন্দ, তাহা লেখনীতে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

রমেশচন্দ্র প্রভুর কাছে নিজের ও বালকদের সকল অবস্থা সম্বন্ধেই লিখিতেন ও ব্যবস্থা চাহিতেন। ঐসকল জিজ্ঞাসার উত্তরে লিখিলেন,—

বৃন্দাবন—নভেম্বর, ১৮৯৭

১। প্রাতে খালি পেটে ৬টি বড় পাটনাই হরতকী ভক্ষণ। বৈকালে ৬টি।

২। নিজ হাতে হবিষ্যান্ন। লবণ ব্যবহার নিষেধ। রোজ নালতা পাতা ভিজান জল। শিশ্ন উর্দ্ধ করিয়া কৌপীন পরিধান করিও।

Fakir

"বৈষ্ণবই সাধু"

রমেশচন্দ্র পত্র পাইয়া প্রভুর লিখিত নিয়মাদি যথাযথ পালন করিয়া ও করাইয়া চলিতে লাগিলেন। এই সময় তাহার চিত্তকে অন্যদিকে আকৃষ্ট করিয়া নানাপ্রকার শিক্ষা দীক্ষা দিবার প্রচেষ্টা চলে! রমেশচন্দ্র সাধু, গুরু, বৈষ্ণব, দীক্ষা, নামমাহাত্ম্য প্রভৃতি কতিপয় বিষয় সম্বন্ধে শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকটে যথাযথ ভাবে জানিতে চাহেন। তদুত্তরে প্রভু লিখিলেন,—

বৃন্দাবন—২৯শে নভেম্বর, ১৮৯৭

১। মন্ত্রদাতা গুরুকে গোস্বামিগণ শ্যামের প্রকাশ রূপ উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তাহার সহিত শ্যাম সম্বন্ধ।

২। সাধু, গুরু, বৈষ্ণব ইহা কাল্পনিক কথা মাত্র। সাধু এই কথাটি ত্যাগ করিয়া গুরু ও বৈষ্ণব এই শব্দদ্বয় ব্যবহার করিও। বৈষ্ণবই সাধু। ধরায় আর সাধু সম্ভবে না। সুতরাং সাধু এই শব্দটি ত্যাগ করিও।

(রমেশচন্দ্র কোন তান্ত্রিক ব্যবসায়ী গুরু সম্বন্ধে, "তিনি সাধু লোক" এইরূপ কথা লিখিয়াছিলেন)

গুরু, বৈষ্ণব লক্ষণ ও নামমাহাত্ম্য

রমেশচন্দ্রের জিজ্ঞাসায় শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে গুরুর লক্ষণ, বৈষ্ণবের লক্ষণ, নামমাহাত্ম্য ও কিরূপে নাম করিলে প্রকৃত প্রেম লাভ হইতে পারে তাহা লিখিয়া পাঠান।

"যাঁহার বপুতে বিষ্ণু লক্ষণ ও অথবা মহাপুরুষের লক্ষণ থাকে তিনিই গুরু। জীব উদ্ধারে বা ভবসমুদ্র পার করিতে যিনি সমর্থ তিনিই গুরু। এতদ্ব্যতীত গোস্বামিরাও গুরু হইতে পারেন। অধিকারী ঠাকুর বা অন্যান্য সম্প্রদায়ীগণ গুরু-বাচ্য নহেন।"

"যাঁর শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন অন্য গতি নাই, বা যিনি গোস্বামী শাস্ত্র ভিন্ন অন্য গ্রহণ করেন না তিনিই বৈষ্ণব।"

"সমগ্র প্রয়োগ ও সাধনের ফল লাভ এবং স্বীয় ও পরকীয়

উদ্ধার সাধন অপিচ চতুর্দ্দশ ভুবনের সর্ব্বথা মাঙ্গল্যবিধান হয়। ইহা নামমাহাত্ম্য।”

“নাম গ্রহণে সবার সমান অধিকার। ইহাতে নাই জাতি কুল বিচার। একথা সর্ব্বতোভাবে সত্য ও সকলের গ্রহণীয় এবং অবলম্বনীয়। নিতাই নিষ্ঠা আবশ্যকীয়। সাধনে “বর্ণ” বিচার ও কায়িক মানসিক নিষ্ঠাকেই নিতাই নিষ্ঠা বলে।”

“গৌর-গদাধর বা গোপীকৃষ্ণের স্মরণ-সান্নিধ্যকে “ভজন” বলা যায়।”

“অষ্টাঙ্গে নতি, লুণ্ঠন, এবং উর্দ্ধ বাহুদ্বয়ে উচ্চ নৃত্যসহ মহাপ্রভুর স্বরূপ কীর্ত্তন, স্মরণ ও সন্নিধান করিলে উচ্ছ্বাস, আনন্দ, ভাব, ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি হইয়া থাকে। “মহাপ্রভুর পরিকরে যে কীর্ত্তন করেন ইহাকেই স্বরূপ-কীর্ত্তন বলা যায়।”

রমেশচন্দ্র বালকদের লইয়া নিত্য টহল নগরকীর্ত্তন করিতেন। বহু বাধা বিঘ্নের মধ্যে এই কার্য্য করিতেন। মাঝে মাঝে উত্তম উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইত। অন্তর্য্যামী দূরে থাকিয়াও বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়া পত্র দিতেন।

একসময় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যানকালে রমেশচন্দ্রের মনে সন্দেহ হইল, কৃষ্ণ ঠিক কাল বর্ণই, কিংবা অন্য কোন বর্ণ? প্রভু ব্রজ হইতে তার উত্তর লিখিয়া পাঠান,—

১। টহল, নগর ও কীর্ত্তনের যেন ত্রুটি না হয়।

২। নিতাই বোল। কৃষ্ণ বোল। হরিবোল।

৩। যথাতথা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ জপ ও কৃষ্ণরূপ চিন্তা করিও। কৃষ্ণকে ভাল বাসিও। তবে কন্দর্পাদি নিশ্চয়ই দূরে পলাইবে।

সব মঙ্গল হবে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। ভাই, কৃষ্ণ কাল নয়; ঠিক ঠিক সবুজ বর্ণ।

বন্ধু॥ বৃন্দাবন, ৬।১২।৯৭

রমেশচন্দ্র বালকদিগকে লইয়া কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মচর্য্য পালন নিয়ম নিষ্ঠা আসনাদি শিক্ষা দেন। ইহা লইয়া অনেক প্রকার প্রশ্ন উঠে। নানাজনে নানাপ্রকার বলিয়া কখনও কখনও রমেশের মনে সন্দেহ লাগাইয়া দেয়। কর্ত্তব্য হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া ফেলিতে চায়। রমেশ সমস্যার মীমাংসার জন্য প্রভুকে জানায়। কখনও ইহাতে বিরক্ত হইবেন মনে করিয়া জিজ্ঞাসা না করিয়া মনেই চাপিয়া রাখেন। অন্তর্য্যামী বন্ধুসুন্দর মনের কোণের সকল খবর জানিয়া বৃন্দাবন হইতে পত্রে লিখিলেন,—

"কীর্ত্তন-মঙ্গলের সদা চেষ্টা পাইও"

বৃন্দাবন, ৭।১২।৯৭

ভাই গৌরাঙ্গজীবন!

ভাই নাম বাবাজী, যখন যে কথাটথা শোন তখনই পরিষ্কার করে নিও। সহরটাকে ঘুরে ঘুরে শীতল ছাপা সাদা বরফের মত করে দিও। কোথাও যেন কৈতব না থাকে।

কীর্ত্তন-মঙ্গলের সদা চেষ্টা পাইও। শেষ রাত্রে যে কোন প্রকারে টহল কাহাকেও দ্বারা করাইও। Fakir.

রমেশচন্দ্রের মনে কখনও যাহাতে সম্পদের বাসনা না জাগে তাহার জন্য বন্ধুসুন্দর সাবধান করিয়া পত্র লিখেন। যাহাদিগকে কৃপার আকর্ষণে নিজ সন্নিধানে টানিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাদের

মধ্যে কেহ কেহ অন্যত্র গমনাগমন ও অন্যভাবে ভাবান্তরিত হইবার লক্ষণ দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া এক পত্র লিখিলেন,—

বৃন্দাবন, ৮।১২।৯৭

"কাহাকেও কদাচ আর টানিয়া লইব না। তুমি হও আর যেই হোক না কেন। আর না। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আবারও করিলাম। আর মোর ধরাধামে কেহই নাই। সব শূন্য। তুমি সম্পদ লইয়া থাক। এ হতে সুখের বিষয় আর কি আছে ?"

Fakir.

পত্রখানা লিখিয়াই প্রভু বন্ধুসুন্দর মনে মনে ভাবিলেন, হয়ত ঐ আক্ষেপের পত্রে রমেশ প্রাণে বেদনা পাইবে। তাই তৎপরদিবস পুনরায় লিখিলেন,—

বৃন্দাবন, ৯।১২।৯৭

"বন্ধু-ব্যথীষু

নারিকোল ছোবরা প্রচুর। নালতা পাতা ঢের ঢের। তাহাদিগকে (ছাত্রদিগকে) ধর্ম্ম শিক্ষা ও সঙ্গীত শিক্ষা দিও। ফকীরের কথাও শিখাইও। তাদের কিছু দিও বই নিও না। নিঃসঙ্কোচে যাইও। কথা কহিও। তবে কোন অভাব থাকিবে না। আমার চিঠিগুলি যেন চিঠির মত পড়িও না। মুখস্থ করিয়া লইও।"

"রাত্রিকাল পাপীতাপীর কলুষ শ্রাদ্ধের সময়। শেষ রাত্রে যেন তেন প্রকারে সকলে হরিনাম শুনতে পায় তাহা করিও। নিত্য নগরকীর্ত্তন, টহল, নিষ্ঠা, কারুণ্য, অক্রোধ। টহলই শেষ ধর্ম্ম।"

Fakir.

"নিতাই মঙ্গল কবিরাজ"

রমেশচন্দ্র ফরিদপুরে কীর্ত্তনাদি প্রচার সম্বন্ধে উপদেশ চাহিলেন। নিজের সাধন ভজন ও নিত্যনৈমিত্তিক জীবন-যাপনের অনর্থ নিবৃত্তির জন্য উপায় জানিতে চাহিয়া পত্র দিলেন। পত্র পাইয়া প্রভু লিখিলেন,—

বৃন্দাবন, ১৩।১২।২৭

"তোমায় বিষ্ণু কৃপা করিবেন। তুমি ফরিদপুরের এ যাবত নিতাই মঙ্গল কবিরাজ। শ্রীশ্রীনাম সংকীর্ত্তন, শ্রীশ্রীনাম অনুশীলন, শ্রীশ্রীনাম মুদ্রাঙ্কণ, শ্রীশ্রীনাম বিতরণ, শ্রীশ্রীনাম অর্চ্চন। এই জন্য বিষ্ণু তোমায় কৃপা করিবেন। চিন্তা নাই॥"

"যথাযথ কৌপীন ধারণ করিলে কন্দর্পের কোন উৎপাত হয় না। এখন হইতে শিশ্ন ঊর্দ্ধ করিয়া কৌপীন দৃঢ় করিয়া পরিও। শিশ্ন ঊর্দ্ধ থাকিলে নিদ্রা বিকারাদিও সত্যই হইবে না। ইহার যেন ত্রুটি না হয়।"

"দেহ ভারী বোধ হইতেই, হরেকৃষ্ণ নাম ঊর্দ্ধনেত্রে স্থির হৃদয়ে, কৃষ্ণকে স্বীয় মানসপটে বসাইয়া যত্ন করিয়া জপ করিও। অহোরাত্রই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাবিও॥ ডাকিও, কাঁদিও, গাইও, জপিও, সেবিও, বাসিও, আপন করিও।"

"নিতাইয়ের গান কি নিয়েছ? সম্বাদ সম্পূর্ণ চাই। ব্যস্ত রহিলাম। আমি কিছুতেই ব্যস্ত হই না। কিন্তু এই জন্য ব্যস্ত রহিলাম॥ তোমার বন্ধু॥"

"উষা টহল দেওয়াইও। রোজ নগর করিও। নূতন গান

ও নূতন তাল। আমি আজ স্বপ্নে দেখি যে, তুমি রাঢ়ি আখর দিতেছ ও খোল বাজাইতেছ। ইহা যেন সত্য হয়।"

"গোলমরিচের গুড়া ও ঘি সহ সৈন্ধব কলিকাতার মত রোজ তুইবার খাইও॥ স্বর হবে॥ বন্ধু॥"

সুরতকুমারীর প্রতি কৃপাপত্রী

"হৃদয়ে গৌরচন্দ্র জপিও"

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর ফরিদপুর চলিয়া আসিলেন। বদরপুর বাদল গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পর দেবী সুরতকুমারীও প্রভুর বিরহে কাতর হইয়া বৃন্দাবন ছাড়িয়া কলিকাতা আসিলেন। অন্তরে আকুল আগ্রহে —আর কবে দেখা পাব! আর কবে সেই রূপ-সুধার লাবণ্য-সাগরে স্নাত হইব!

লছমীরাণীর কুঞ্জে দরজার সম্মুখে যে মোহন মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন তাহাই বুক জুড়িয়া বসিয়া আছেন। পুনঃ দর্শন লালসায় বিরহ সন্তাপে সর্ব্বদা ছটফট করেন, কখনও গুণ গুণ করিয়া, কখনও কণ্ঠ খুলিয়া গান করেন,—

"মন্ত্র মহৌষধি, তুহু জানসি যদি, মঝু লাগি করবি উপায়।"

কি উপায়ে যে জ্বালা জুড়াইবেন, ভাবিয়া আকুল হইয়া রামবাগানের কোন ভক্তের নিকট হইতে প্রভুর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া শ্রীচরণ সমীপে এক পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্রে লিখিলেন—কি ভাবে জীবন চালাইব, কি ভাবে ভজন সাধন

করিব, কি মন্ত্র জপ করিব, কৃপা করিয়া জানাইলে পতিতা দাসী চির কৃতার্থা হইবে। অন্তরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাটি সর্ব্বশেষে লিখিলেন। জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়াছে। আবার কবে দেখা দিবেন!

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর দেবী সুরতকুমারীকে শ্রীহস্তে উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন,—

শ্রীমতি ভরসা

গোরা দাস্যেষু

শ্রীশ্রীসুর—

"তোমার কারুণ্য লিপিকা পাঠ করিলাম। সাক্ষাৎ আদি করা বৃষভানুনন্দিনীর নিষেধ। সাক্ষাৎ হইবে না॥ বন্ধু॥"

"ত্রিস্নান করিও, নিত্য লক্ষনাম করিও। শ্রীমৎ ভাগবৎ পাঠ করিও। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা পাঠ করিও। নিদ্রালস্য ত্যাগ করিও। স্ত্রীপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ ও বাক্যাদি ত্যাগ করিও। চক্ষু কর্ণে মনুষ্য বিষয় গ্রহণ করিও না।

হবিষ্য করিও, লবণ সৈন্ধবাদি ত্যাগ করিও। হৃদয়ে গৌরচন্দ্র জপিও। স্বরূপ দামোদরে আত্মসমর্পণ করিও, গৌর গদাধর ধ্যান করিও, মিলনাদি স্মরণে আবিষ্ট হইও॥"

কৃপাপত্রী পাইয়া সুরত আনন্দে গলিয়া গেলেন। সন্তপ্ত প্রাণে শান্তির বারি বর্ষিত হইল। যদিও প্রভু লিখিয়াছেন ভানুনন্দিনীর নিষেধ বশতঃ দর্শন দিবেন না তথাপি শ্রীহস্তের অক্ষর ও নিরুপম উপদেশামৃত লাভে তাহার প্রাণ পরম পুলকে

স্পন্দিত হইল। পত্রের প্রত্যেকটি অক্ষর এত মধুর লাগিয়াছিল যে, তিনি প্রত্যহ উহা শতাধিকবার আবৃত্তি করিতেন এবং তাহাতে অশেষ তৃপ্তি লাভ করিতেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু পত্রে নাম জপাদি করিতে লিখিয়াছেন। সুরতের অন্তরে তখন মন্ত্রাদির জন্য একটি লালসা জাগিতে লাগিল। অন্তরের আকূতি জানিয়াই অন্তরের দেবতা কয়েকদিনের মধ্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে আর একখানি পত্র পাঠাইলেন। সেই পত্রে কৃষ্ণ মন্ত্র, কৃষ্ণ গায়ত্রী, রাধা গায়ত্রী, রাধা মন্ত্র ইত্যাদি এবং কোন্ সখীর আনুগত্যে কি ভাবে কোন্ কুঞ্জের কি সেবা করিতে হইবে তাহা বিস্তৃতভাবে লিখিত ছিল। এই অপার করুণার দান পাইয়া সুরতকুমারী কৃতকৃতার্থা হইলেন। তাহার সকল সাধ যেন পূর্ণতা লাভ করিল।

সোনাগাছির পরিবর্ত্তন

সুরতকুমারী শ্রীশ্রীপ্রভুর নির্দ্দেশিত ভজন-প্রণালী নৈষ্ঠিক ভাবে জীবনে আচরণ করিতে লাগিলেন। বারবিলাসিনী কঠোর ব্রহ্মচারিণী হইলেন। পতিতা রমণী ব্রজের উজ্জ্বল রসের আস্বাদনে মঞ্জরীর সিদ্ধদেহ লাভ করিলেন। তাঁহার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে সোনাগাছির পতিতা মহলে এক অভিনব জাগরণ আসিল।

যাদুমণি নাম্নী বারবনিতার চম্পটী ঠাকুরের কৃপা লাভে

পরিবর্ত্তনের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুরতকুমারী ও যাদুমণির প্রভাবে শতাধিক বারবনিতার জীবনে হরিভক্তির প্রবাহ আসে। চম্পটী মহাশয়ের দ্বারা কত পতিতা যে মহাউদ্ধারণ বন্ধুসুন্দরের করুণাশ্রয়ে পবিত্র জীবনের অধিকারিণী হইয়াছেন, তাহার কোন লিখিত ইতিহাস নাই। সমাজে যাহারা লাঞ্ছিতা, কে তাহাদের খবর রাখে? একমাত্র যিনি পতিতপাবন তাঁহার কৃপার প্রবাহ সমাজের নিম্নতম ভূমিকেও উপেক্ষা করে না।

কোনও সময়ে চম্পটীঠাকুর সোনাগাছির একদল ভক্তিমতী বারবনিতা লইয়া রামবাগানে শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শন করাইতে আসিয়াছিলেন। প্রভু গৃহে, পার্শ্বে রমেশচন্দ্র। বাহিরে নারীগণ দর্শনের আশায় দণ্ডায়মানা। তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে থালায় থালায় সেবার দ্রব্যাদি। চম্পটীঠাকুর পুনঃ পুনঃ প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন উক্ত জননীদিগকে দর্শন দিবার নিমিত্ত।

শ্রীশ্রীপ্রভু প্রথমে রমেশচন্দ্রকে দরজা বন্ধ করিয়া দিতে কহিলেন। পরে আপনার বাম হস্তের তর্জ্জনীতে কতকগুলি কাপড় জড়াইয়া সেই অঙ্গুলিটি দরজার দুই কপাটের মধ্যে একটু ফাঁক করিয়া, সেই পথে বাহির করিয়া দিলেন। চম্পটী মহাশয় আনন্দ উল্লাসে উচ্চৈঃস্বরে জননীদিগকে বলিলেন—"ঐ যে প্রভু দর্শন দিতেছেন, তোমরা দর্শন কর! ঐ যে বস্ত্রাবৃত শ্রীহস্তের অঙ্গুলি দেখ! ঐটুকু দর্শন পাওয়াও জীবের জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফল! তোমরা আনন্দ কর। হরি হরিবোল!"

জননীগণ পরমানন্দে উলুধ্বনি করিলেন। ঐ বস্ত্রাবৃত অঙ্গুলিটি দর্শনেই নিজেদের কৃতার্থ মনে করিলেন। সকলে নিজ নিজ

হস্তস্থিত দ্রব্যাদিপূর্ণ থালা প্রভুর গৃহের সম্মুখে রাখিয়া প্রণত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু ঐ সকল দ্রব্যাদি রামবাগানের ঘরে ঘরে বিতরণ করিয়া দেওয়াইলেন। পতিত-পাবনের পতিতপাবনী লীলার ইহা এক অপূর্ব্ব অধ্যায়। কত পদদলিতা পরম ধনের সন্ধানে ধন্যা হইয়াছে !

ভক্তবর মথুরানাথের দর্শন ভাগ্য

ফরিদপুর সহর হইতে উত্তর দিকে তিনমাইল দূরে টেপাখোলা গ্রাম। গ্রামবাসী বঙ্কুবিহারী নাগ মহাশয় বাকচর গ্রামে শিক্ষক ছিলেন। সেখানে প্রভুর দর্শন লাভ করেন ও প্রভুর রচিত পদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

নাগ মহাশয় টেপাখোলা গ্রামে আসিয়া ভক্তসমাজে প্রভুর বার্ত্তা জানান। ভক্তবর মথুরানাথ কর্ম্মকার সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। নাগ মহাশয়ের নিকট শ্রীশ্রীপ্রভুর পদ পদাবলী পাইয়া তিনি প্রথমে তৎপ্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। "ঐ শ্যাম রায়, ঐ গোরা রায়" প্রভৃতি পদ তাহার কণ্ঠহার হয়। তৎপর শ্রীপাদ জয়নিতাই যখন ফরিদপুর প্রচারণে আসেন তখন তাঁহার দুর্ল্ভ সান্নিধ্য লাভে মথুরানাথের জীবনে ভক্তির প্রবাহ আসে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরসুন্দর আবার প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, জয়নিতাইর মুখে এই বার্ত্তা পাইয়া মথুরানাথের মন প্রাণ

বন্ধুসুন্দরের দিকে আকৃষ্ট হয়। দর্শনের লালসা বর্দ্ধিত হয়। শ্রীশ্রীপ্রভু তখন শ্রীবৃন্দাবনে। কবে প্রভুবন্ধু ফিরিবেন, তাঁর দর্শন পাইব, মথুরানাথ এই ভাবনায় উৎকণ্ঠায় দিন যাপন করিতেছিলেন।

হঠাৎ শুনিতে পাইলেন শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং বদরপুর গ্রামে বাদল বিশ্বাস মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। শোনামাত্র কর্ম্মকার মহাশয় দর্শন লালসায় উন্মাদের মত বদরপুর ছুটিয়া আসেন। বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ী পোঁছিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কোনও ভক্ত প্রভুর থাকিবার গৃহ দেখাইয়া দিলেন।

গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া প্রভু শয়ন করিয়া আছেন। মথুরানাথ দর্শনের জন্য ছটফট করিয়া গৃহখানির চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। গৃহের দরজার ধারের বেড়ার গায়ে একটা ক্ষুদ্র রন্ধ্র ছিল। মথুর সেই রন্ধ্রপথে নয়ন নিবদ্ধ করিয়া গৃহের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া শয়ন করিয়া আছেন। কেবল মাত্র শ্রীশ্রীচরণ-যুগল অনাবৃত আছে। রাঙা টুকটুকে দুখানি চরণতল অন্ধকার গৃহের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছে। মথুরের নয়ন-যুগল সেই চরণ-যুগলে পতিত হইল। চরণের বর্ণ ও জ্যোতির ছটা দেখিয়া মথুরানাথ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ঐ সময় শ্রীশ্রীপ্রভুর অঙ্গ হইতে অপূর্ব্ব গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। এমন মধুর গন্ধ মথুরানাথ জীবনে কখনও কোথাও পান নাই। অপার্থিব চরণ ছটায় নয়ন মুগ্ধ—অপার্থিব অঙ্গগন্ধে নাসিকা বিভোর।

মথুরানাথ আত্মহারা হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মনে মনে ঐ চরণেই দেহমন বিক্রয় করিয়া দিলেন।

প্রভুর সঙ্গে কোন কথা হইল না। তাঁহার শ্রীবদন দেখা হইল না। তথাপি যাহা দেখিলেন মথুরানাথ সেদিন তাহাতেই ভরপুর হইয়া গৃহে গমন করিলেন। কতিপয় দিবস তাঁহার চক্ষে ঐ চরণের জ্যোতির ছটা ও নাসিকায় ঐ শ্রীদেহের সৌরভ সর্ব্বদার জন্য লাগিয়া রহিল।

শ্রীপাদ জয়নিতাইর কৃপায় মথুরানাথ শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীগ্রন্থের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শনের পর হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতে বসিলে প্রতি অক্ষরে প্রভুর কথা মনে পড়িত, প্রভুর রাতুল চরণ নয়নে ভাসিত। সেই অঙ্গগন্ধে হৃদয় মাতিয়া উঠিত। প্রভুবন্ধুই যে সেই শচীনন্দন, এই বিশ্বাস মথুরানাথের অন্তঃপটে ক্রমেই দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

"আমি তোর চিরগুরু"

শ্রীশ্রীপ্রভু দুঃখীরাম ঘোষের মাধ্যমে রমেশচন্দ্রের সংবাদ লইলেন। অতঃপর দুঃখীরামের হাত দিয়াই গোপনে কয়েকটি চিঠি প্রেরণ করিলেন।

শ্রীমতি

রমাজী !

"তোর মাচ্টারী ছাড়ায় কাতর হয়েছিনু। এখনও আছি। যার ইস্কুল তার কথা নেই, পরের কথায় কেন ? আবার মাচ্টারী

নে। নইলে যেন তুই মরেছ। হেন বোধ হয়। সঙ্গীদের কোথা ফেলে যাবি? যথাযথ থেক। সবার সহিত ব্যবহার রেখ। সতর্ক থেক। বিপদ হবে না।"

(জগদ্বন্ধু ওঁ ব্রহ্মচারী)

"তুই টাকার আম অদ্য দিস্। দিব্যি রইল। দিস্ দিস্ দিস্ দিস্ দিস্।

আমি তোর চিরগুরু। আমার কথায় ফরিদপুর থাক। আমার কোন কথা লঙ্ঘন কর না।"

দুঃখীরামের হাতে দিয়া চিঠি পাঠাইলেন। দুঃখীরামের হাত দিয়া রমেশের প্রেরিত আম আসিল। প্রভু রমেশের কল্যাণে কীর্ত্তনানন্দের মধ্যে আম লুটাইয়া দিলেন। পুনরায় পত্র দিলেন।—

"কেন দুঃখে ম্রিয়মান"

"ধৈর্য্য বাঁধ নাথে সাধ বধুয়ার জয়।
রাই বাস আড়ে হাস বধু তোর রয়॥
রাগে গড় গড় মানে ঢর ঢর আমার ত রমারাণী।
সাপে তাপে জড় সদা ধর ফর বিরহ ব্যাকুল প্রাণী॥
সাধের চম্পিয়া চাঁদ পাশে গিয়া চন্দ্রিকা করেছে পান।
বন্ধু হেদে রয় মধ্বনিল বয় কেন দুঃখে ম্রিয়মান॥"

ইতি—কাকচরিত

তন্দ্রার জন্য ভক্ত শাসন

বাদল বিশ্বাস মহাশয়ের বাহিরের ঘরে কীর্ত্তন হইতেছে। নবদ্বীপ দাস কীর্ত্তন করিতেছেন। ভক্তগণ দোহারকী করিতেছেন। স্বয়ং প্রভু মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন। হঠাৎ তন্দ্রাবেশে নবদ্বীপের তাল কাটিয়া গেল। প্রভু অত্যন্ত বেদনা পাইয়া মৃদঙ্গ রাখিয়া উঠিলেন। নিজ চরণের রবারের পাতুকা হস্তে লইয়া নবদ্বীপকে কয়েক ঘা লাগাইয়া দিলেন।

নবদ্বীপ চমকিয়া উঠিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভু ক্লান্ত হইয়াছেন মনে করিয়া গোপাল মিত্র বাতাস করিতে লাগিলেন। প্রভু অতীব তুঃখের সহিত ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "কীর্ত্তনে তাল কাটিলে কি অপরাধ হয় জানিস? মহাপ্রভুর অঙ্গহানি হয়। অত অলসতা কেন?" প্রভুর তুঃখ ও রোষ দেখিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন।

অপর একসময় পাবনা থাকা কালে একদিন প্রভাতে নবদ্বীপ টহল কীর্ত্তন করিয়া ফিরিয়াছেন। শুনিতে পাইলেন প্রভু ঘরে নাক ডাকাইতেছেন। প্রভুর নাকের শব্দ পাইয়া নবদ্বীপও নিজ গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া নিদ্রামগ্ন হইলেন। টহলের পর প্রভাত কালে নিদ্রা বিধি নহে। তা ছাড়া নবদ্বীপ দাসের বসিয়া বসিয়া ঘুমাইবার নিয়ম ছিল—শয়ন করিয়া নিদ্রা নিষেধ ছিল। একে তো প্রভাতে নিদ্রা, তাতে আবার শয়ন করিয়া।

মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রভু শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন। একখানি বাঁশের চটা দিয়া নবদ্বীপের গায়ে তিনটা আঘাত করিলেন। বলিলেন,

"নাকের শব্দ শুনিয়া মনে করিয়াছ ঘুমাইয়াছি।—আমি কি ঘুমাই রে? দেহকে অত সুখ দিতে চাও কেন—নিষেধ করি তবু শোন না!"

নবদ্বীপ লজ্জিত হইলেন। প্রভু নিজ প্রিয়জনকে যেমন আদর যত্ন করিতেন—নিয়ত তাহাদের কল্যাণ চিন্তায় নিরত থাকিতেন। তেমনই নিয়ম ভঙ্গ করিলে, আদেশ অমান্য করিলে কঠোর শাসন করিতেন। কোমলতায় কুসুমকে হার মানাইতেন, কঠোরতায় বজ্রও মাথা হেট করিত।

কৌতুক ছলে কীর্ত্তন

গোয়ালচামট ব্রাহ্মণকাঁদা দুই গ্রামের মাঝামাঝি স্থলে হরিমোহন দাসের বাড়ী। হরি পাষণ্ডীর মত মানুষ। বাড়ীর অন্যান্য লোকগুলিও সেইরূপ। বাড়ীতে ভুলেও হরিনাম কীর্ত্তন হয় না। বাড়ীর পাশ দিয়া কোন কীর্ত্তন গেলে তাড়া করিয়া আসে। বৈষ্ণব বাবাজীরা যে একতারা বাজাইয়া বাড়ী বাড়ী গান গায়, তাহাও তার পক্ষে অসহ্য। বাড়ীতে ভিখারী ভিক্ষা পায় না।

ভক্তেরা বলেন, "প্রভু, হরিমোহনের বাড়ী যদি কীর্ত্তন করাইতে পারেন তবে বুঝি।" প্রভু কেবল হাসেন। মাঝে মাঝে মধুর ভাষায় বলেন, "দেখ না, ভানুনন্দিনী কি করেন!" ভক্তগণ সেই দিনের অপেক্ষায় আছেন, যে দিন হরিমোহনের বাড়ী কীর্ত্তনানন্দে ডুবিয়া যাইবে। প্রভু বন্ধুসুন্দর বদরপুর হইতে ব্রাহ্মণকাঁদা আসিয়াছেন। ভক্তবৃন্দ লইয়া সকাল সন্ধ্যায় বিভোর

থাকেন। একদিন সন্ধ্যার কীর্ত্তনের পর ভক্তগণ বিশ্রাম করিতেছেন। হঠাৎ রাত্র দ্বিপ্রহরে রঙ্গলাল বন্ধুহরি নবদ্বীপকে ডাকিলেন এবং তাহাকে দিয়া অন্যান্য সকল ভক্তগণকে ডাকাইলেন। সকলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া প্রভুর নিকটে দাঁড়াইলেন।

ব্রাহ্মণকাঁদার বাড়ীর পুকুরের উত্তর তীরে নারায়ণ দাস বৈরাগী ছিল। বৈরাগী হরবোলা ছিল, নানারকম শব্দের অনুকরণ করিতে পারিত। গান করিতে পারিত বলিয়া প্রভু তাহাকে ভালবাসিতেন। নারায়ণ দাস বিরক্তভাবে উঠিয়া আসিয়া অন্যদিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, "কি মুস্কিল! পিরভুর জন্য রাইতে ঘুমাইবার উপায় নাই।"

প্রভু বলিলেন, "বোরেগী, ছেলে মরলে মা যেমন কাঁদে সেইরূপ কাঁদতে পারবি?" নারায়ণ দাস বলিল, "পিরভু, হুকুম করলে পারমু না ক্যান্। প্রভু তখন ভক্তদিগকে বলিলেন, "আমি একটি খাটিয়ায় মরার মত কাপড় ঢাকা দিয়া শুয়ে থাকব। তোরা মরা নেবায় গান করে পথ চলবি। বোরেগী মরার কান্না করবে।"

রঙ্গলালের ইচ্ছানুরূপ ভক্তগণ ঐ অঞ্চলের মরা নেবার গান ধরিল—"বল রে স্বরূপ ব্রজে যাব কোন পথে।" নারায়ণ দাস সুর করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিল—"বাবা রে বাবা! বাবা আমার কোথায় গেলি রে!" খাটিয়ার উপর প্রভু কাপড় ঢাকা দিয়া মরার আকারে রহিলেন, ভক্তগণ খাটিয়া কাঁধে লইলেন। মাঝে মাঝে "বলহরি হরিবোল" বলিতে লাগিলেন।

চারিদিকের লোক কে মরিল কে মরিল বলিয়া বাহির হইল। লোক অনেক জমিল। হরিমোহনের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া

প্রভুর ইঙ্গিতে ভক্তগণ, "ওরে, নামা নামা আর পারি না, বলহরি হরিবোল" বলিয়া প্রভুকে নামাইয়া ফেলিলেন। নারায়ণ দাসের মরার কান্না চলিতে লাগিল—বাবা আমার কোথায় গেলি রে!

বাড়ীর নরনারী হৈ চৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল "ওরে, মরা নামাস্ না রে, কার বাড়ীর মরা রে, এখানে নামাবি কেন, আর জায়গা পেলি না" ইত্যাদি বলিতে লাগিল। ভক্তগণ কে কার কথা শুনে। চারিদিকে কোলাহল।

হঠাৎ খাটিয়ার মধ্যে প্রভু উঠিয়া বসিলেন, চারিদিকে হাসির হৈ হিল্লোর পড়িয়া গেল। বাড়ীর মেয়েরা "ওমা, এ যে পিরভু! এ যে পিরভু! পিরভু আবার এত রঙ্গও জানে!" ইত্যাদি বলিতে লাগিল। ইঙ্গিত পাইয়া ভক্তগণ বদ্ধজীবের স্বরূপ-জাগরণকারী প্রভুর অভিনব গানের পদ ধরিলেন,—

ভুলে মর্ম্ম, একি কর্ম্ম, ও মন তরবিরে কোন্ বলে।
ত্যজি সত্য ধর্ম্ম, জ্ঞান কর্ম্ম, কুসঙ্গেতে মজে র'লে॥
সপ্তম মাসেতে যবে জননী জঠরে,
গর্ভের অনলে পুড়ে ডাকিতে কাতরে।
(কোথা দীননাথ) (এই মতিহীনে দয়া কর)
এবার জনমিয়ে, ভবে গিয়ে, পূজিব পদযুগলে॥
ভূমিষ্ঠ হইতে মায়া জ্ঞান হরি নিল,
প্রণব জঠর-স্মৃতি অন্তর হইল।
(সব পাশরিলে) (বিষ্ণুমায়া পরশনে)
শেষে শৈশবেতে, দিবা রেতে, র'লে ধূলাখেলার ছলে॥

বাল্যেতে খেলিলে সদা সঙ্গীগণ সনে,
কাটালে কৈশোরকাল পুস্তক পঠনে।
(স্মরণ কর নাই) (মন্‌রে হরিনামের পড়া)
তুমি যুবাকালে, মোহজালে, পড়িলে রিপুর কৌশলে॥
সংসার চিন্তাতে পড়ে, প্রৌঢ়কাল গেল,
ক্রমে বক্ষে বদ্ধমূল হ'ল পাপ-শেল।
(নাম ভুলে র'লে) (ধন-মদে অন্ধ হ'য়ে)
তখন জায়ার ভয়ে, নত হ'য়ে, পড়িলে তার পদতলে॥
এল রে বার্দ্ধক্য ঐ অতীব ভীষণ,
শুভ্র কেশ, লোল চর্ম্ম, কোটরে নয়ন।
(এমন কি করিবে) (আগে তারে ডাক নাই)
ত্যজি মায়া ছবি, আয়ু রবি, যাবে কাল অস্তাচলে॥
জগদ্বন্ধু দাসে বলে শুন মূঢ় মন,
সময় থাকিতে তাঁরে কর রে স্মরণ।
(সদা হরিবল) (হরি হরি হরিবল)
মায়া মোহ ভুলে, বাহু তুলে, নাচ সদা হরিব'লে॥

গানখানির প্রত্যেকটি পদ হরিমোহনের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে লাগিল। প্রত্যেকটি অক্ষর যেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই রচিত। সঞ্জীবনী শব্দ স্পর্শে হরিমোহন জাগিয়া উঠিল। তারপর ভক্তগণের মধুর কণ্ঠমাধুর্য্যে সে দ্রব হইতে লাগিল। অবশেষে নবনী-অঙ্গিয়া বন্ধুসুন্দরের শ্রীঅঙ্গের হেলন-দোলন-মাধুর্য্যে সে একেবারে গলিয়া গেল। আত্মহারা হইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিল। চারিদিকে অগণিত লোক উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করিল। মধ্যরাত্রে

সেই কীর্ত্তনের রোলে ব্রাহ্মণকাঁদা গোয়ালচামট মুখরিত হইল। প্রভুর উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল। প্রভুর রঙ্গ দেখিয়া সকলের হাসিতে হাসিতে শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। হাসির দেবতা নিজেও খলখল হাসিতে লাগিলেন।

ভক্তবৎসলতার আকর্ষণ

ঢাকা সহরে "ইম্পিরিয়াল সেমিনারী" নামক একটি স্কুল ছিল। বর্ত্তমান ফরাসগঞ্জের খানিকটা অংশকে তখন ডাইল পট্টি বলিত। ইম্পিরিয়াল সেমিনারী ঐ স্থানে অবস্থিত ছিল। রমেশচন্দ্র সেখানে শিক্ষকতার কার্য্যে চাকুরী পাইলেন। তিনি নানা কারণে ফরিদপুর স্কুলের কার্য্য পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। ঢাকায় কাজ পাইয়া সেখানে চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা করিয়াও শ্রীশ্রীপ্রভুর সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। ঢাকা গিয়া কোথায় থাকিবেন? রমেশচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র উপেন্দ্র সেন কনিষ্ঠ নগেন্দ্র সঙ্গে ৮।২ নং নবাবপুর অবস্থান করিতেন। রমেশচন্দ্র তাহার সঙ্গে রহিলেন। সেখান হইতে প্রভুকে পত্র দিলেন হৃদয়ের আর্ত্তি জানাইয়া। আসিবার পূর্ব্বে শ্রীচরণ দর্শন মিলে নাই এই ব্যথা বুকভরা।

গৌর পূর্ণিমা আসিয়াছে। শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা জাগিয়াছে। ইচ্ছাময় ইচ্ছামাত্রই যাত্রা করিলেন। ব্রজে চলিয়াছেন ব্রজবিহারী, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া মানসনেত্রে ভাসিয়া

উঠিতে লাগিল প্রিয় রমেশের বেদনাযুক্ত মুখখানি। ভক্তের চিন্তায় ভক্তবৎসল অধীর হইয়া উঠিলেন।

ট্রেণখানি তখন কুষ্টিয়া ষ্টেসনে মাত্র পৌঁছিয়াছে। প্রভু গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। নামিয়া বিপরীতমুখী ট্রেণে গোয়ালন্দ পৌঁছিলেন। ষ্টীমারে উঠিয়া নারায়ণগঞ্জ আসিয়া নামিলেন। ষ্টীমার হইতে নামিয়াই কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবাবপুর কোথায়? তারা হাসিয়া বলিল, নবাবপুর এখানে কোথায়? তাহা তো ঢাকায়। তখন পুনঃ ট্রেণ ধরিয়া ঢাকায় আসিলেন। ষ্টেসনে নামিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ীওয়ালাকে বলিলেন, "নবাবপুর যাব।" গাড়ীওয়ালা নবাবপুর পৌঁছিয়া অনেকক্ষণ ঘুরিল। কিন্তু রমেশ শর্ম্মা কোথায় থাকে খোঁজ করা গেল না।

প্রভু তখন গাড়ী হইতে নামিয়া বালকের মত এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন ও যাহাকে নিকটে পাইলেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "রমেশকে চিনেন?" রমেশচন্দ্র তখন নূতন আসিয়াছেন—এত বড় ঢাকা সহরে কে তাকে চিনে! নবাবপুর অঞ্চলটাও ছোট নয়। বন্ধুসুন্দর শিশুর মত চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের এই অজ্ঞতা প্রিয়জনের উপভোগ্য।

ললাটে অগ্নিশিখা

শ্রীমান নগেন্দ্র রাস্তায় উপর দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া প্রভু মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রমেশকে চিন ?" নগেন্দ্র উত্তর করিল, "হাঁ চিনি। তিনি আমাদের স্কুলের মাষ্টার, এই বাড়ীতে থাকেন।" প্রভু বলিলেন, "তাকে ডেকে দিতে পার ?" বালকটি বলিল "হা পারি, আপনি দাঁড়ান।"

"আপনি দাঁড়ান" বলিয়াই নগেন্দ্র প্রভুর শ্রীমুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। একমুহূর্ত্ত মাত্র কপালের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল। সে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া দৌড়িয়া গেল। রমেশচন্দ্রের নিকট গিয়া নগেন্দ্র অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বলিল, "মাষ্টার মশায়, আপনার বাসার সম্মুখে একজন সাধু আসিয়াছেন। তাঁহার কপালে আগুন জ্বলে, তিনি আপনার খোঁজ করিতেছেন।"

রমেশচন্দ্র কপালে আগুন-জ্বলা সাধুর কথা শুনিয়াই বুঝিলেন প্রভু ভিন্ন অন্য কেহ নয়। তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, দীর্ঘ চারিহস্ত পুরুষবর পথ আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রাণের দেবতাকে পাইয়া রমেশ-চন্দ্র আনন্দে আত্মহারা হইলেন। চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন, "এখন হঠাৎ কোথা হইতে আসিলে ?" প্রভু বলিলেন, "শ্রীবৃন্দাবন চলেছিলাম। তোর কথা মনে করে প্রাণটা যেন কেমন করে উঠল। তাই কুষ্ঠে পর্য্যন্ত গিয়ে ছুটে ফিরে এলাম।"

শ্রীশ্রীপ্রভুকে লইয়া রমেশচন্দ্র গৃহে গেলেন। স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "ছাখ রমেশ, আমি নারায়ণগঞ্জ নামিয়াই পথিক লোকদের নবাবপুর কোথায় তাহা জিজ্ঞাসা করি। সকলে হাসিয়া বলে, নবাবপুর এখানে কোথায় তাহা তো ঢাকায়। তারপর ঢাকায় আসি।
তারপর "রমেশ রমেশ রমেশ" করে কত পথ যে ঘুরেছি। কত মানুষকে সুধায়েছি।" প্রভুর প্রাণভরা কথা শুনিয়া গভীর স্নেহ-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া রমেশ স্নিগ্ধ শীতল হইল। অজ্ঞাতসারে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল, রমেশের নয়নে। নয়নের অশ্রু মুছিয়া মুখে মৃদু হাসিয়া রমেশচন্দ্র বলিলেন, "প্রভু, ঢাকা সহরে রাস্তার নম্বর না হইলে তোমার রমেশকে চিনিবে কে ?"

তৎপর রমেশচন্দ্র ফরিদপুর ছাড়িবার কারণ প্রভুকে জানাইলেন। শুনিয়া প্রভু বলিলেন 'ভালই করেছিস।' রমেশচন্দ্র বলিলেন, "তোমার তো সবই ভাল।" গম্ভীরভাবে বন্ধুসুন্দর কহিলেন,"রমেশ, নিতাইচাঁদের কৃপা হইলে সবই ভাল।"

রমেশচন্দ্র রন্ধন করিলেন। বহুকাল পরে বহু আদরে প্রভুকে খাওয়াইলেন। সারারাত্র কথা বলিয়া কাটাইলেন। কেহ ঘুমাইলেন না। তবু দুজনের কথা শেষ হয় না। দীর্ঘকাল পরে রমেশ প্রভুকে পাইয়াছেন, প্রভু রমেশকে পাইয়াছেন। আবার মিলন হইতে না হইতেই বিরহ আরম্ভ। প্রভু ব্রজের পথে চলিলেন।

"যাঁর কথা, তিনিই দাতা"

শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া জ্ঞানগুধরী একটি ছোট কুঞ্জে কয়েকদিন থাকিলেন। এবার কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন না। সর্ব্বদা মৌনী থাকিতেন, সমস্ত রাত্রি যমুনা পুলিনে আকাশের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিতেন। যমুনা পুলিনে অনেক গাভী থাকিত। তাহারা শ্রীশ্রীবন্ধুগোপালে ঘিরিয়া থাকিত ও আদরে গা চাটিত।

ব্রজবাসীরা বন্ধুসুন্দরকে "মৌনী বাবা" বলিয়া সম্বোধন করিত। জ্ঞানগুধরী হইতে কয়েকদিনের জন্য মদনমোহন পাড়া রঘুনন্দন গোস্বামীর রাধামাধব কুঞ্জে গিয়া কিছুদিন রহিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু রঘুনন্দন গোস্বামীকে একখানি শ্রীমদ্ভাগবত নিজ শ্রীহস্তে দিয়াছিলেন। গোস্বামিজী ঐ গ্রন্থখানি নিত্য পূজা করিতেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বা গ্রন্থখানি কাহাকেও দেখাইবার কালে বলিতেন, "এ যাঁর কথা, তিনিই দাতা।" বলিতে রঘুনন্দন পুলকিত হইতেন।

লীলাদর্শনে ভাবাবেশ

শ্রীবৃন্দাবনে মথুরাবাসী লক্ষ্মীচাঁদ শেঠ নামক কোন এক ধনী গৃহস্থ ভক্তের এক ঠাকুরবাড়ী আছে। ঐ ঠাকুরবাড়ীতে সময় সময় বিপুল আড়ম্বরে ও জাকজমকের সহিত মহা মহোৎসবাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। সময় সময় ভগবানের অনেক লীলা যথা-সম্ভব সুন্দররূপে অভিনীত হইয়া থাকে।

একদা উক্ত শেঠের বাড়ীতে একটি পুষ্করিণী মধ্যে গজেন্দ্র-মোক্ষণ লীলা দেখান হইতেছিল। বহু ভক্ত-দর্শক তথায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মহামহোল্লাসে "জয় রাধে শ্যাম" ইত্যাদি জয়ধ্বনি দিতেছিলেন। অভিনয়টি এমন সুন্দরভাবে অভিনীত হইতেছিল যে, বিশ্বাসী প্রেমিক ভক্তের নিকট উহা প্রত্যক্ষ ঘটনাবৎ বোধ হইতেছিল।

ঐ পরম আনন্দের সময় শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর তথায় উপস্থিত ছিলেন। লীলারসময় বন্ধুহরি লীলাভিনয় দেখিতে দেখিতে পরম দশা প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে পরম সাত্ত্বিক মূর্চ্ছাদশা ঘটিয়া যেন বহির্দৃশ্যে অচেতন বা মৃতবৎ ব্রজের রজেঃ পড়িয়া রহিলেন। রাজর্ষি বনমালী রায় মহাশয়ও ঐদিন ঐ লীলা দর্শন করিতে ঐস্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর হইতে অনতিদূরেই ছিলেন।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের মহাভাবদশা দর্শন করিয়া তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেছিলেন। তিনি রজমণ্ডিত বপু মহাভাবাবিষ্ট বন্ধুসুন্দরের শ্রীচরণের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। যাহারা অভিনয়ান্তে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন তাহারা যে সকল মন্তব্য করিতেছিলেন রাজর্ষি তাহা শুনিতে পাইতে-ছিলেন। অনেকেই বলিতেছিলেন, "এই লোকটি মরিয়া গিয়াছে।"

ক্রমে সমস্ত লোক বাহির হইয়া গেলে ভাবাবিষ্ট বন্ধুসুন্দরের প্রতি শেঠের কর্ম্মচারিবৃন্দের দৃষ্টি পড়িল। তাহারা কয়েকজন মিলিয়া বন্ধুসুন্দরের শ্রীদেহ বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতঃ স্থির

সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ইনি নিশ্চয় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন তাহারা পরামর্শ করিলেন—এই লোকটি মূর্চ্ছাদশা হইতে বা অন্য কোন কারণে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার দেহের শেষ কার্য্যাদি করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

এইরূপ পরামর্শ করিয়া যেইমাত্র তাহারা শ্রীদেহ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন রাজর্ষি বাহাদুর তড়িৎগতিতে ছুটিয়া গিয়া সকলের গতিরোধ করিলেন। তিনি সবাইকে বলিলেন, "আপনারা কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন?" আপনারা ইঁহাকে চিনেন না। ইনি একজন মহাপুরুষ, সকলের পূজ্য। আমাদের মত সামান্য জীবের ন্যায় ইঁহার কখনই মৃত্যু হইতে পারে না। পরম লীলার অভিনয়াদি দেখিতে দেখিতে ইঁহার পরম সাত্ত্বিক মূর্চ্ছা ঘটিয়াছে। আপনারা একটু সরুন। বর্ত্তমানে যে সুব্যবস্থা করিতে হয় তাহা আমিই করিতেছি।"

অদ্ভুত অন্তর্দ্ধান

ভক্তবর রাজর্ষি বাহাদুর সত্বর বাহকগণ সহ উত্তম শিবিকা আনাইয়া শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুহরিকে অতি যত্ন সহকারে শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদজীর কুঞ্জে আনয়ন করিলেন। শ্রীশ্রীবন্ধুকে ঐ অবস্থায় এক পবিত্র বিছানায় রাখিয়া কয়েকজন ভক্ত-প্রহরী নিযুক্ত করিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন ও অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

অন্তঃপুরে যাইবার সময় উক্ত ভক্ত-প্রহরীদিগকে বিশেষভাবে বলিয়া গেলেন, যেন তথায় শ্রীশ্রীপ্রভুর বিঘ্ন বা অশান্তিজনক

কোনরূপ গোলমাল না হয়। যেন সকলেই মনে মনে জপ করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটায়। অসম্ভব হইলে যেন তাহারা পর্য্যায় ক্রমে জাগিয়া থাকে। কোনমতেই যেন তাহারা সকলে একযোগে নিদ্রা না যায়। ঘরের সমস্ত দরজা জানালা যেন উত্তম রূপে বন্ধ থাকে।

এবম্বিধ বহু উপদেশ প্রদান করিয়া রাজর্ষি অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। তিনি আরও বলিয়া গেলেন, যেন শ্রীশ্রীবন্ধুহরি কোথাও চলিয়া না যান। জাগরিত হইলেই যেন অন্তঃপুরে গিয়া কেহ তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দেয়।

ভক্তগণ রাজর্ষির নির্দ্দেশমত, সৎসাহসে বুক বাঁধিয়া পরমানন্দে রাত্রি যাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু কেমন করিয়া কি যে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়া গেল তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম কেহই উপলব্ধি করিতে পারিল না। সকলেরই মাথা ঘুরিয়া গেল। যে সকল ভক্ত-প্রহরী সুদৃঢ় সংকল্প করিয়াছিল যে তাহারা পর্য্যায় ক্রমে জাগিয়া থাকিবে, কিছুতেই ঘুমাইবে না, তাহাদের মধ্যেও এক অতীব অলস ভাব ও জড়তা আসিয়া পড়িল।

শত চেষ্টাতেও তাহারা জাগিয়া থাকিতে পারিল না। প্রভাতে শঙ্খ ঘণ্টার মধুর ধ্বনিতে, বিহঙ্গের কূজনে, প্রভাতী কীর্ত্তনে সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সকলে চকিতে জাগিয়া উঠিল। দেখিল—দরজা জানালা যথাবৎ বন্ধ আছে কিন্তু শ্রীশ্রীবন্ধুহরির শয্যা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে।

এই অদ্ভুত ঘটনায় প্রহরীগণ মহাভীত হইয়া পড়িল। অবশেষে অন্তঃপুরে গিয়া করজোড়ে সবিনয় সঠিক সবিস্তার

ঘটনা রাজর্ষির নিকটে জ্ঞাপন করিল। রাজর্ষি সংবাদ অবগত হইয়া দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলেন। শেষে শ্রীশ্রীবন্ধুহরির শয্যা পার্শ্বে গিয়া যখন দেখিলেন বাস্তবিকই তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। *

ক্লিন্ন হইয়া ফিরিয়াছি

বৈশাখ মাস। বৃন্দাবনে প্রচণ্ড গরম পড়িয়াছে। প্রভুর পত্রে সংবাদ পাওয়া গেল। নবদ্বীপ দাস বাকচর ছিলেন। তিনি কলিকাতা গিয়া প্রভুকে পত্র দিলেন। জানাইলেন, অত গরম আপনার সহ্য হবে না, শীঘ্র চলিয়া আসিবেন। প্রভু জ্যৈষ্ঠের প্রথমে বাংলায় ফিরিবেন মনে করিয়া পাথের চাহিয়া চম্পটীকে পত্র দিলেন। ইতিমধ্যে প্রভুর কষ্ট দেখিয়া একজন মর্ম্মী ভক্ত পাথেয়ের টাকা দিয়া দিলেন। প্রভু অমনি বাংলায় চলিয়া আসিলেন।

কলিকাতা হইয়া আসিলেন না। ব্যাণ্ডেল হইয়া ফরিদপুর চলিয়া আসিলেন। বদরপুর পৌঁছিয়া বাদল বিশ্বাসের ভবন হইতে নবদ্বীপ দাসকে পত্র দিলেন।—

---

* শ্রীপাদ জয়নিতাইর নিকট শ্রুত হইয়া শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী জগদ্গুরু গ্রন্থে এই কাহিনী যে ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (২৯৭-৩০০পৃঃ) প্রায় সেই ভাবেই লিখিত হইল।

বদরপুর

নবদ্বীপ,

আমি কল্য রাত্রিযোগে এইস্থানে আসিয়াছি। তুমি আসিও। একখানি আয়ুর্ব্বেদ অভিধান আনিও। অর্দ্ধসের লবাং আনিও। আমার কথা কেহই যেন না জানে। সোমবার।

ফকার।

ব্রজে পত্র পাইয়াছি। গরমে ক্লিন্ন হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়াছি। পঙ্গুবৎ, বল নাই। চম্পটীর নিকট টাকার জন্য মাত্র লিখিয়াছিলাম। অন্য কোনও কারণ নাই। পঁচিশ টাকা একজন ভিক্ষা দিল। অমনি আসিলাম।

এক মৃদঙ্গ হইলে দেহে পুনঃ বল সঞ্চার হবে। ইহা জানিবা। চম্পটীর সহিত হারাধনের বাড়ী যাইয়া তুই এক দিনের মধ্যেই খোল প্রস্তুত করিয়া খোল লইয়া চলিয়া আসিও। আমার নিকট আসিতেছ ইহাই প্রকাশ মাত্র। বাংলা দেশের কথা অপ্রকাশ থাকিবে। এই পত্র গোপন রাখিবে। কেহই দেখিবে না। কেহ কিছুই জানিবে না। লিখিত দ্রব্যগুলি সহ সত্বর রওনা হইও।

ফকীর

একত্রে রহিল।—(১) লবাং (২) আয়ুর্ব্বেদ অভিধান, (৩) খোল, (৪) করতাল, (৫) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা পাঁচ খানি।

"গুরু অভিপ্রেত কার্য্যকে গুরু দীক্ষা বলে"

বদরপুর পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু রমেশচন্দ্রকে এক পত্র দিলেন। কতিপয় ভক্ত প্রভুর প্রদর্শিত ভজনপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্য-ভাবে চলিতে আরম্ভ করায় রমেশচন্দ্র ও তাহার অনুগতদিগকে সতর্ক করিয়া পত্রখানা লিখেন।

কতিপয় ভক্তের নাম উল্লেখ করিয়া লিখিলেন, "ইহারা সকলেই অন্যত্র দীক্ষিত। ইহাদের আগমন, সঙ্গ উপদেশ, ভাব ব্যবহার সমগ্রই উদ্দেশ্যপূর্ণ ও স্বার্থাধীন। ইহাদের বিষয় মনপট হইতে সর্ব্বথা মুছিয়া ফেলিবে। নতুবা ভবিষ্যৎ তোমাদেরও ইহাদের দশা ঘটিবে। সকলকে ইহা শিখাইয়া লিপিবদ্ধ ও খাতাস্থ করিও।" 'ফকীর'

"গুরুদীক্ষা কাহাকে বলে" রমেশের কোনও পত্রে এইরূপ প্রশ্ন ছিল। এই পত্রে শ্রীশ্রীপ্রভু তাহার যথাযথ উত্তর দেন।

১। গুরু অভিপ্রেত কার্য্যকে গুরু দীক্ষা বা গুরুপ্রণালী বলা যায়। গুরুতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব একই বলা যায়।

২। যে প্রকার "পুষ্পবন্তৌ" শব্দে চন্দ্রস্মূর্য্য বুঝায়, এই প্রকার গুরু, গৌরাঙ্গ, গোপী, রাধাশ্যাম সব মিলিয়া এক হরিনাম। হরিবোল বললে সব বলা হইয়া যায়। হরিনাম শব্দে শ্রীহরির নাম নয়।"

রামচরণ শাহর বাগান

শ্রীমান রমেশচন্দ্র ছাত্রগণ লইয়া নবাবপুর উপেন্দ্র সেনের বাসায় আছেন। সেদিন হঠাৎ প্রভু কৃপা করিয়া এই বাসায় পদার্পণ করিয়া গেলেন। কিন্তু প্রভুর মত একটু বসিবার স্থান বা শয়নের স্থান মেছ-বাড়ীতে হয় না। প্রভুর থাকিবার স্থান মনের মত কোথাও পাওয়া যায় কিনা, রমেশচন্দ্র তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

অবশেষে একটি ভাল স্থান পাইলেন। স্থানটি ঢাকা সহরের পূর্ব্ব উত্তর প্রান্তে টীকাটুলিতে অবস্থিত। একটি প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ী। ভিতরে একটি পুকুর, পুকুরের উত্তর দক্ষিণ তীরে দুইটি বাঁধান ঘাট। উত্তর তীরের ঘাটের উত্তরে একটি একতালা দালান। দালানের দক্ষিণ পার্শ্বের সম্মুখে বারান্দা। তিনটি কোঠা। মাঝেরটি বড় হলঘর। উত্তরদিকে ছোট রোয়াক। পূর্ব্বধারে রান্নাঘর। পূর্ব্ব তীরে একটি নবনির্ম্মিত মন্দির। মন্দিরে তখনও বিগ্রহ স্থাপন হয় নাই।

রমেশচন্দ্র বাগানের মালিক রামচরণ শাহ সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার অনুমতি লইলেন, এবং ওখানে থাকিতে আরম্ভ করিলেন। রমেশচন্দ্র তাহার অনুগত ছাত্রগণ লইয়া ওখানে অবস্থান করিতে থাকিলেন। কালীমোহন, লোকনাথ, তারকেশ্বর প্রমুখ প্রিয় ছাত্রগণ রমেশচন্দ্রের আদর্শ সাত্ত্বিক জীবন যাপনে যত্নপরায়ণ ছিলেন। রমেশচন্দ্র বাগানের পুকুরের উত্তর পার্শ্বের দালানেই থাকিতেন। নিষ্ঠা পবিত্রতা সহকারে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহারাদি করিতেন। সকল কার্য্য ছাত্রেরা নিজেরাই

করিতেন। রমেশচন্দ্র তাহাদিগকে এবং অন্যান্য সমাগত ছাত্রগণকে ব্রহ্মচর্য্য তপশ্চর্য্যা শিক্ষা দিতেন এবং প্রভুবন্ধুর বার্ত্তা দিতেন। রমেশ আপনাকে বিদ্যার্থী সেবক বলিয়া পরিচয় দিতেন।

রমেশচন্দ্রের কার্য্যে ফরিদপুরে যেরূপ সব বাধাবিঘ্ন ছিল, ঢাকা তাহা কিছুই থাকিল না। তিনি পরমানন্দে অনুগতগণ লইয়া প্রভুর নির্দ্দেশিত পথে চলিতে লাগিলেন এবং কবে প্রভু আসিয়া এই সুন্দর বাগান-বাড়ীটিতে অবস্থান করিবেন, এই "আশাবন্ধ" লইয়া অপেক্ষায় কাল কাটাইতে লাগিলেন।

প্যারীমোহন ও সুধন্বকুমার

প্যারীমোহন ঢাকা সার্ভে স্কুলে পড়ে। সৌভাগ্যবশতঃ প্যারী রমেশচন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করে। রমেশচন্দ্রের কৃপায় শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া প্যারী তাহার আদেশ উপদেশ প্রতিপালনে সর্ব্বদা যত্নপর।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের একখানি পদ্মাসনে উপবিষ্ট কিশোর প্রতিকৃতি প্যারীমোহনের শয়ন শয্যার পার্শ্বে একটি টেবিলের উপর সুসজ্জিত থাকিত। প্যারীমোহন সকাল সন্ধ্যায় ধূপধূনা দিয়া তাঁহাকে প্রণাম ভক্তি করিত। প্রত্যহ স্নানান্তে পুষ্পচন্দনে পূজা করিত। বন্ধু-শ্রীমূর্ত্তিখানি তার প্রাণতুল্য ছিল।

প্যারীমোহন থাকিত একটি মেছে। মেছে আরও অনেক ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে ঢাকা মিডফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল সুধন্বকুমার। মেছের ছাত্রেরা অনেকেই

প্যারীমোহনের অতিরিক্ত ভক্তিভাব পছন্দ করিত না। একদিন সুধন্বকুমার প্রভৃতি কয়েকজন কৌতুক করিয়া প্যারীর সেবিত প্রভুর শ্রীমূর্ত্তিখানি লুকাইয়া রাখিল।

কলেজ হইতে ফিরিয়া প্যারী তার প্রাণের ঠাকুর দেখিতে না পাইয়া জনে জনে জিজ্ঞাসা করিল। কেহই কিছু বলিল না। প্যারী বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। এই অবস্থা দেখিয়া সুধন্ব তাড়াতাড়ি শ্রীমূর্ত্তি বাহির করিয়া দিল। প্যারীর মুখে স্বর্গীয় দীপ্তি দেখা দিল। একখানি চিত্রপটের প্রতি একজন শিক্ষিত যুবকের এত আকর্ষণ, আর্ত্তি ও ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়া সুধন্বের মন গলিয়া গেল। সে প্যারীর নিকট প্রভুর বিষয় জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল। প্যারী যেটুকু বলিতে পারিল, বলিয়া অবশেষে বলিল যে, এ বিষয় বলিবার যোগ্যপাত্র রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। সুধন্ব যেটুকু শুনিল তাহাতেই মুগ্ধ হইল। বন্ধুসুন্দরকে আপনজন বলিয়া মনে হইল।

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ সুধন্বকুমারের পরম বন্ধু। উভয়েই মিডফোর্ডের একই শ্রেণীর ছাত্র। সুধন্ব মেছে থাকে আর পূর্ণ তাহার কাকা ও মায়ের সঙ্গে নয়াবাজার একটি বাসায় থাকে। প্যারীমোহনের কাছে প্রভুবন্ধুর সংবাদ পাইয়া সুধন্বের ইচ্ছা হইল এই সংবাদটা প্রিয় পূর্ণচন্দ্রকেও দিতে। সুধন্ব পূর্ণের বাসায় রওনা হইল।

পথিমধ্যে

রমেশচন্দ্র ইম্পেরীয়াল সেমিনারীর শিক্ষক। ঐ স্কুলের অপর একজন শিক্ষকের নাম রাধাবল্লভ বসাক। বসাক মহাশয় উচ্চশিক্ষিত রমেশচন্দ্রের নিকট প্রভুর বার্ত্তা পাইয়া তাহার নিকট হইতে একখানি প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি লইয়া বাসায় যাইতেছিলেন। বসাক মহাশয় সদরঘাট ও বাংলা বাজারের সংযোগ স্থল দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন।

ঘটনাচক্রে ঐ স্থান দিয়া পূর্ণচন্দ্র যাইতেছিল। বসাক মহাশয় হাতের চিত্রখানি পূর্ণচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পূর্ণচন্দ্র তখন বসাক মহাশয়ের হাত হইতে শ্রীমূর্ত্তিখানা হাতে নিয়া দেখিতেই কি যেন একটি তড়িৎশক্তির মত শিহরণ তাহার সর্ব্বাঙ্গে খেলিয়া গেল। অতিকষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ফটো কার?" রাধাবল্লভ বাবু বলিলেন, "ইনি প্রভু জগদ্বন্ধু।"

"ইনি কে?" পূর্ণ জানিতে চাহিলে রাধাবল্লভ বাবু বলিলেন, "ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার।" চৈতন্যভাগবতে আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ মাকে বলিয়াছিলেন,—

"আরও দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥"

আবার ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন,—

"এই মত আরো আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দ রূপ হইবে আমার॥
তাহাতেও তোমাসব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবে মহা সুখে আমা সঙ্গে॥"

এই সব প্রমাণ বলিয়া মহাপ্রভুই যে আবার প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর রূপে প্রকট হইয়াছেন এই কথা বসাক মহাশয় পূর্ণচন্দ্রকে বুঝাইয়া বলিলেন। অবশেষে কহিলেন এ সম্বন্ধে আমি কোন কিছু জানি না, এই বিষয় বলিবার শ্রেষ্ঠ অধিকারী শ্রীযুত রমেশ চক্রবর্ত্তী, তিনি আমাদের স্কুলের শিক্ষক। থাকেন, রাম শাহের বাগানে। শ্রীমূর্ত্তিতে প্রভুর রূপ দেখিয়া ও বসাক মহাশয়ের কাছে দুই চার কথা শুনিয়া পূর্ণচন্দ্র যেন কেমন হইয়া গেলেন। পূর্ণচন্দ্র বসাক মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন, আপনি আগামী কল্য আমাদের বাসায় যাবেন, আপনার সঙ্গে রমেশচন্দ্রের দর্শনে যাব। পূর্ণচন্দ্রের অন্তরে ইচ্ছা, এই সংবাদটি সুধন্ব সরকারকে দিবে। তারপর দুইজনে মিলিয়া রমেশচন্দ্রের কাছে যাবে।

পূর্ণচন্দ্র বাসায় ফিরিয়া তাহার কাকা শ্রীযুত হরগোবিন্দ বাবুর কাছে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর কথা বলিলেন। রাধাবল্লভ বাবু যে প্রমাণ দিয়াছেন সেই প্রমাণ উল্লেখ করিয়া বলিলেন— ইনি মহাপ্রভুর অবতার। হরগোবিন্দ বাবু পরম ভাগবত ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের কথায় তিনিও বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন।

যখন পূর্ণচন্দ্র তাহার কাকাবাবুর কাছে এই সকল কথা বলিতেছে—ঠিক তখনই সুধন্বকুমার আসিল। যে খবর পূর্ণ-চন্দ্র তাহার কাকাকে দিতেছে, সেই খবর পূর্ণকে দিতেই সুধন্ব আসিয়াছে। পূর্ণও সেই খবর সুধন্বকে দিতে আগ্রহযুক্ত হইয়া আছে। পূর্ণচন্দ্র ও সুধন্বকুমার উভয় উভয়কে একই সংবাদ দিল—“মহাপ্রভু আবার প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দররূপে

অবতীর্ণ হইয়াছেন।” সুধন্ব আগে বলিল প্যারীমোহনের কথা, পরে বলিল রমেশ চক্রবর্ত্তী নামে কে টীকাটুলি আছেন তার কথা। পূর্ণচন্দ্র আগে বলিলেন মাষ্টার বসাকের কথা, পরে বলিলেন রমেশচন্দ্রের কথা।

পরদিন রাধাবল্লভ বসাকের সঙ্গে হরগোবিন্দ বাবু, পূর্ণচন্দ্র ও সুধন্ব রামচরণ শাহের বাগান-বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

পূর্ণচন্দ্রের ভাবদশা

বাগান বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই পূর্ণ আত্মসংবিৎ হারা হইতে লাগিল। পূর্ণ দেখিল তাহার সম্মুখে একটু উপরে হরগৌরীর মূর্ত্তি বিরাজমান। তদ্দর্শনে পূর্ণ জয় রাম জয় রাম বলিতে লাগিল। (জনৈক রামাইত সন্ন্যাসীর সঙ্গফলে পূর্ণচন্দ্র রামনাম জপ করিত) জয় রাম জয় রাম বলিতে বলিতে পূর্ণ আবিষ্ট হইয়া পড়িল।

রমেশচন্দ্র পাক করিতেছিলেন। জয় রাম ধ্বনি শুনিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। অবস্থা দেখিয়া তিনি ছাত্রদিগকে ও পূর্ণের সঙ্গীদিগকে হাত ধরাধরি করিয়া পূর্ণকে ঘিরিয়া বসিতে বলিলেন। স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন। তাহারা ঐরূপ করিলে পূর্ণ শয়ন করিল। শয়ন করিয়াই জগদ্বন্ধু জগদ্বন্ধু জগদ্বন্ধু বলিতে আরম্ভ করিল।

রমেশচন্দ্র প্রভু বন্ধুসুন্দরের একখানি শ্রীমূর্ত্তি আনিয়া পূর্ণের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন “এই যে জগদ্বন্ধু। দেখ, চোখ খোল,

এই তো সম্মুখে জগদ্বন্ধু।” পূর্ণ চক্ষু খুলিয়া অপলক নেত্রে শ্রীমূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর বলিতে লাগিল, “জগদ্বন্ধু, তুমি আবার কার সাধন কর তোমাকেই তো সকলে সাধন করে। তুমি তো সেই সর্ব্বারাধ্য রামচন্দ্র।” এইরূপ বলিয়া হাসিতে লাগিল।

একটু পরে পূর্ণ চক্ষু বুজিয়াই হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিল—“রমেশ কোথায়?” রমেশচন্দ্র বলিলেন, “এই যে আমি, দেখ।” পূর্ণ বলিল, “রমেশ ভগবানের দ্বিতীয় অবতার।” এই বলিয়া চক্ষু খুলিতেই রমেশচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি পড়িল। আবেশ ছুটিয়া গেল। পূর্ণ লজ্জিত হইয়া সিঁড়ির পার্শ্বে গিয়া চুপ করিয়া বসিল।

রমেশচন্দ্র প্রভুবন্ধুর কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। হরগোবিন্দ বাবু ও সুধন্ব মনোযোগ করিয়া শুনিতে লাগিল। পূর্ণ দূর হইতে শুনিতে লাগিল। প্রভুর অপরূপ রূপ, অলৌকিক খেলা, পতিত উদ্ধারণ লীলা, ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা, হরিনাম দান ইত্যাদি বহু কথা রমেশচন্দ্র বলিলেন। রমেশচন্দ্রের প্রত্যেকটি কথা শ্রোতারা ক্ষুধার্ত্তের মত আস্বাদন করিল।

ক্রমে পূর্ণচন্দ্রও সুধন্বকুমার রমেশচন্দ্রের অনুগত হইয়া পড়িল। তাহারা প্রায় প্রত্যহই বাগানে আসিত। প্রভুর আদেশ উপদেশ তাহাদের জীবনের সর্ব্বস্ব হইল।

"পূর্ণচন্দ্রেরই সুধা"

সুধন্ব আসিয়া পূর্ণকে খবর দিল, প্রভু ঢাকা আসিতেছেন। পূর্ণ বলিল, "কি করিয়া জানলি ? কোনও পত্র এসেছে ?" সুধন্ব বলিল, "রমেশচন্দ্র বলিলেন, আজ একটি ময়ূর নৃত্য করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে—ইহাতেই তিনি বুঝিয়াছেন প্রভু আসিবেন।"

কয়েকদিন পূর্ব্বে পূর্ণ একদিন স্বপ্নে দেখিয়াছে—একখানি সিংহাসনে প্রভু বসিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে প্রভু কৃষ্ণ বলরাম হইয়া গেলেন। পুনঃ শ্রীকৃষ্ণই একটা পর্দ্দা টানিয়া টানিয়া নিজেদের ঢাকিয়া ফেলিলেন, আবার প্রভুকে দেখা যাইতে লাগিল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল। পূর্ণ যেন লোকজনকে ডাকিয়া প্রভুকে দেখাইতেছিল।

এইরূপ স্বপ্নে প্রভুকে দর্শন করিয়া পূর্ণের মনটা বড় আনন্দ পূর্ণ ছিল। সুধন্বের কথা শুনিয়া পরদিবস উভয়ে রামচরণ শাহের বাগানে ছুটিয়া গেল। গিয়া শুনিল, সত্য সত্যই প্রভু আসিয়াছেন।

বারাণ্ডায় কীর্ত্তন হইতেছে। ঘরের মধ্যে প্রভু আছেন। অনেক্ষণ কীর্ত্তন হইল। কীর্ত্তনান্তে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় প্রভু বাহিরে আসিলেন। ভক্তবৃন্দের মধ্যে বসিলেন। রমেশচন্দ্র পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন—প্রভুর শ্রীমুখের দিকে তাকান নিষেধ। পূর্ণচন্দ্র ও সুধন্ব মস্তক অবনত করিয়া রাতুল চরণ দর্শন করিতে লাগিল ও কণ্ঠের মধুর দু'চারটি কথা কর্ণ ভরিয়া পান করিতে লাগিল।

রমেশচন্দ্র তাহাদিগকে লইয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য বলিলেন, প্রভু, ইহার নাম পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, আর ইহার নাম সুধন্ব কুমার সরকার। মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যয়ন করে।

পদ্মপলাশ আঁখি দুটি খুলিয়া কৃপাবারি বর্ষণ করতঃ প্রেমময় প্রভু তাহাদিগের প্রতি অবলোকন করিয়া বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে কহিলেন,—

"ইনি পূর্ণচন্দ্র! তা'হলে ইনি তো পূর্ণচন্দ্রই।
আর ইনি সুধা, তা'হলে ইনি হলেন পূর্ণচন্দ্রের সুধা।"

এই কথা কয়টি শ্রীশ্রীপ্রভু এমনই মন মাতানোর সুরে অতি অভিনব ও চিত্তাকর্ষি-ভঙ্গিতে কহিলেন যে, অপ্রাকৃত সঙ্গীত-লহরীর মত তাহা তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ প্রলেপিত করিয়া দিয়া শিরায় শিরায় নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকলেই মহাজনের পদে শুনিয়াছেন,—

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মন প্রাণ।"

জানি না, অন্তর্য্যামী প্রভু তাহাদিগকে অন্তরে অন্তরে আরও কত কথা বলিলেন। বহির্ম্মুখী আমারাও প্রত্যক্ষ করিলাম, একখানি শ্রীমুখের একটি মাত্র বাক্য দুইটি মানুষের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া দুইটি প্রাণকে চিরজীবনের তরে দুইখানি রাঙা চরণের মূলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।
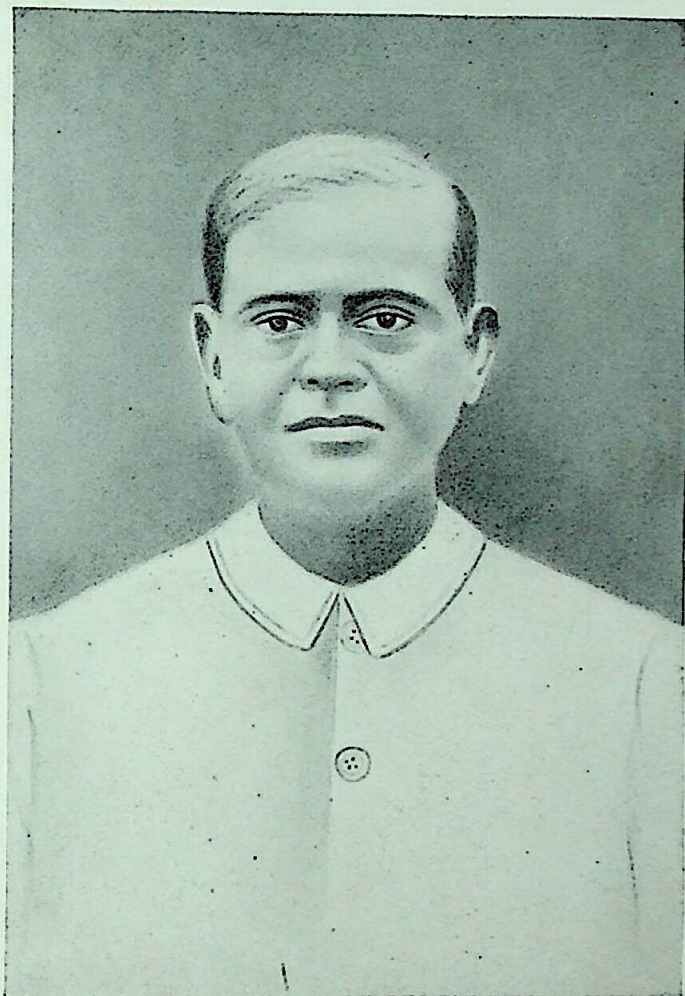
ডাঃ শ্রীসুধন্বকুমার সরকার

এত মিষ্টি জল !

শ্রীশ্রীপ্রভু অনেক সময় এটা ওটা সেটা দিয়া একটা ফর্দ্দ করিয়া ভক্তদিগকে আনিয়া দিতে বলিতেন। একদিন ঐরূপ কতগুলি জিনিষের মধ্যে একটা তামার পালির (পানপাত্র) কথা ছিল। অন্যান্য শয্যা বাসনপত্রের কথাও ছিল।

রমেশচন্দ্র ফর্দ্দখানি পূর্ণচন্দ্রের হাতে দিলেন। পূর্ণ বাজারে গেলেন। অন্যান্য জিনিষ ক্রয় করা হইয়া গেল। তামার পালি কিনিবার কালে পূর্ণের মনে হইল, জল খাইতে কাঁসার পালি উত্তম। পূর্ণ নিজেও তাই ভালবাসে। পূর্ণচন্দ্র তখন প্রভুর ফরমাইজ মত তামার পালি কিনিয়া তৎসহ আর একটা ভাল খাগরাই কাঁসার একটি পানপাত্রও কিনিয়া লইল।

কাঁসার পালিটার ভিতরটা পরিষ্কার ছিল না। দোকানী সামান্য একটু পরিষ্কার করিয়া দিয়া বলিল ভাল করিয়া মাজিয়া ধুইয়া নিবেন। ঘরে অনেক দিন অব্যবহার্য্য অবস্থায় ছিল বলিয়াই দাগগুলি পড়িয়াছে, মাজিলেই যাইবে। পূর্ণচন্দ্রও উহা ভাল করিয়া মার্জ্জন করিয়া প্রভুকে দিবেন ভাবিলেন।

পূর্ণ দ্রব্যাদি আনিয়া প্রভুর ঘরের সম্মুখে রাখিয়া রমেশ-চন্দ্রের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিল। ইত্যবসরে ঘরের মধ্যে বাসনের শব্দ হইল। রমেশচন্দ্র ভিতরে যাইয়া দেখিলেন প্রভু স্বয়ং ঐ অপরিষ্কার কাঁসার পালিটি লইয়া গিয়াছেন এবং নিজেই উহাতে জল ভরিয়া পান করিতেছেন।

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "প্রভু, ধোয়ামাজা হল না অই পালিতে জল খাইলে ? প্রভু বলিলেন, রমেশ রে, জল তো রোজই খাই কিন্তু আজ জল যত মিষ্টি লাগিল এত মিষ্টি জল আর কোনদিন খাই নাই।"

রমেশচন্দ্র বলিলেন, পূর্ণের পালি কিনিবার জন্য যে প্রাণের আগ্রহ, উহার মাধুর্য্যই প্রভু জলের সঙ্গে আস্বাদন করিয়াছেন।

অপর একদিন পূর্ণ একটি শীতল পাটি কিনিয়া আনিয়াছে। ইচ্ছা, ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া প্রভুকে দিবেন। একটু পরেই দেখা গেল পাটি নাই। অনুসন্ধানে দেখা গেল—প্রভু নিজেই নিয়া উহা পাতিয়া শয়ন করিয়াছেন। উদ্দেশ্যে কিছু আনিলে উহা দেওয়ার অপেক্ষা না করিয়াই গ্রহণ করিতেন। পূর্ব্বের চৌর্য্যস্বভাবের নব রূপ!

প্রভু সবই জানেন

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের রূপ-মাধুর্য্য উন্মুক্তভাবে আস্বাদনের লালসা জাগিয়াছে পূর্ণ ও সুধার মনে। তারা একটি বুদ্ধি আটিয়াছে। প্রভু স্নান করেন সন্ধ্যার পর। ঐসময় পুকুর পারের কলাবাগানে লুকাইয়া থাকিলে প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ দর্শন হইবে। একদিন উভয়ে বিকালে বাগানে আসিয়া কাজ আছে বলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে চলিয়া গেল। তাহারা পুকুর পারের কলাবাগানে লুকাইয়া রহিল।

সন্ধ্যার সময় প্রভু বন্ধুহরি রমেশচন্দ্রকে বলিলেন, "রমেশ, আজ শরীর ভাল না, আজ আর স্নান করবো না।" পূর্ণ ও সুধন্ব অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল। স্নানের সময় অতীত হইলে চলিয়া আসিয়া শুনিতে পাইল যে, প্রভুর শরীর খারাপ বলিয়া আজ আর স্নান করিবেন না। তখন তাহারা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই প্রভু বলিলেন, "রমেশ, শরীর ভাল বোধ করিতেছি, যাই স্নান করি।" এই বলিয়া স্নান করিলেন।

পরদিন পূর্ণ ও সুধন্ব আসিয়া শুনিল, প্রভু পরে স্নান করিয়াছেন। শুনিয়া তারা সংকল্প করিল, যত রাত্রই হউক আজ কলাবাগানে লুকাইয়া প্রভুকে দেখিবই। কিন্তু সেদিনও শরীর ভাল নয় বলিয়া প্রভু স্নান করিতে গেলেন না, সুধন্ব ও পূর্ণ বহু রাত্রি পর্য্যন্ত কলাবাগানে মশকের দংশনে অতিষ্ঠ হইয়া চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া যাইবার পর অধিক রাত্রিতে প্রভু বলিলেন, "এখন শরীর ভাল বোধ হইতেছে, স্নান করিব।" এই বলিয়া স্নান করেন।

পরদিন সুধন্ব ও পূর্ণ আসিয়া শুনিল প্রভু অধিক রাত্রিতে স্নান করিয়াছেন। তখন তাহারা প্রভুর দর্শন মানসে কলাবাগানে লুকাইয়া থাকিবার কথা রমেশচন্দ্রকে বলিল। রমেশচন্দ্র বলিলেন "প্রভু অন্তর্য্যামী, তাঁহার নিকট চালাকী করিয়া কোন কাজ করিবার উপায় নাই। প্রভু সকলের সব জানেন ও বোঝেন।"

"কিবা খাবার এনেছিস্"

একদিন পূর্ণচন্দ্র প্রভুর সেবার জন্য আম, কাল জাম ও তরমুজ লইয়া রামশাহের বাগান-বাড়ীতে আসিল। তখন প্রভু একাই ঘরের ভিতর আছেন। পূর্ণ মনে করিল রমেশচন্দ্রের আসিতে বিলম্ব আছে, আমি আম তরমুজ বানাইয়া রাখি। ফলগুলি পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিয়া পূর্ণ যত্নের সহিত প্রস্তুত করিল। কাসুন্দীর শিশি নিকটে পাইয়া তাহা দ্বারা কাল জাম মাখাইল।

এদিকে প্রভু ঘরের মধ্যে হাঁটিয়া বেড়াইতেছেন। শ্রীচরণের চলার শব্দ শোনা যাইতেছিল। পূর্ণচন্দ্রের মনে হইল প্রভুর খুব ক্ষুধা পাইয়াছে। উত্তর দিককার দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পূর্ণ বলিতে লাগিল, "জগদ্বন্ধু, জগদ্বন্ধু, দরজা খোল, তোমার জন্য খাবার আনিয়াছি। আমি তোমার দিকে তাকাব না, শুধু খাবার দিয়ে যাব।"

শ্রীশ্রীপ্রভু গৃহাভ্যন্তর হইতে মধুর কণ্ঠে কহিলেন "কে রে ?" পূর্ণ উত্তর করিল "আমি পূর্ণ," "কে, পূর্ণ ? কিবা খাবার এনেছিস্" পূর্ণ বলিল, "আম জাম তরমুজ।"

পূর্ণের কথা শেষ হইতে প্রভু অতি ধীরে ধীরে দরজাখানি খুলিয়া দিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে পূর্ণ সেই অনিন্দ্যসুন্দর সুবর্ণোজ্জ্বল মোহন মূর্ত্তিখানি এক ঝলক দর্শন করিল। দর্শন করিয়াই মস্তক অবনত করিল। ঐ এক ঝলকেই পূর্ণ পূর্ণদর্শন করিল। দেখিল, কটিতে একখণ্ড বস্ত্রমাত্র আবৃত। আর সমস্ত

অঙ্গ খোলা। রূপের ছটায় পূর্ণ নিজেও যেন আলোকিত হইয়া উঠিল।

অতি সন্তর্পণে তৈয়ারী ফলগুলি পূর্ণ ভিতরে রাখিয়া আসিল। প্রভু দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পর রমেশচন্দ্র স্কুল হইতে আসিলেন। পূর্ণের মুখে সবকথা শুনিলেন। প্রভু দরজা খুলিয়া দিলে ভিতরে গিয়া রমেশ দেখিলেন, পূর্ণের দেওয়া ফল সবই গ্রহণ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র বলিলেন, "পূর্ণ, বন্ধু সকলেরই, সকলেই তার সেবার অধিকারী।"

সুধন্ব ও প্যারীর দর্শন

সুধন্ব ও প্যারীমোহন এক মেছেই আছে। প্রত্যহ প্রভুর কাছে আসে। ভক্তদের মুখে প্রভুর অলৌকিক কথা শোনে। মনে মনে ভাবে আমরা তো এ পর্য্যন্ত কিছু দেখিতে পাইলাম না। এইরূপ চিন্তা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করিয়াছে, কেহ কাহাকেও বলে নাই।

একদিন উভয়ে উভয়ের কাছে কহিল ভাই, "প্রভু যদি তাঁহার ঐশ্বর্য্য কিছু না দেখান, তাহা হইলে আর আসিব না প্রভুর নামও করিব না।" এইরূপ সংকল্প করিয়া দুইজনে সন্ধ্যায় বাগান-বাড়ীতে আসিয়া দেখেন কীর্ত্তনানন্দ হইতেছে। তাহারা কীর্ত্তনে যোগ দিল। কীর্ত্তনের মধ্যে ভাবাবেগে দুইজনেই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। অনেক রাত্রে কীর্ত্তন শেষ হইল। উহাদের

আবেশ ছুটিল না। উভয়ে অজ্ঞান অবস্থায় শয়ন করিয়া রহিল। অন্যান্য ভক্তেরা তাঁহাদের ভাব ভঙ্গ হইবার ভয়ে কেহ ডাকিল না, স্পর্শও করিল না।

কৃষ্ণপক্ষের গভীর রজনী। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার অতি নিকটস্থ মানুষকে পর্য্যন্ত দেখা যায় না। সুধন্ব ও প্যারী উভয়েরই আবেশ কাটিয়া গিয়াছে তবু কেহ কাহাকেও দেখে নাই। উভয়েই আলস্য জড়তার নিদ্রিতের মত শয্যায় পড়িয়া আছে।

এমন সময় প্রভু আসিয়া সুধন্বের মস্তকে শ্রীহস্তের অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন এবং অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাকিলেন। আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে সুধা বন্ধুর অনুসরণ করিল। প্রভু পুকুরের ঘাটে যাইয়া অবগাহন করিতে নামিলেন। ইঙ্গিত অনুযায়ী সুধন্ব শুষ্কবস্ত্র লইয়া ঘাটলায় বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ জলে থাকিয়া স্নানান্তে উঠিলেন। শুষ্কবস্ত্র চাহিয়া পরিধান করিতে লাগিলেন।

যেইমাত্র সর্ব্বাঙ্গের বস্ত্র উন্মোচন করিয়াছেন, অমনি শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিতে বাগানখানা আলোকিত হইয়া উঠিল। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের মত একমুহূর্ত্ত কৃষ্ণারজনীর গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত হইল। পাখীগণ পর্য্যন্ত প্রভাত কাল আগত মনে করিয়া কলরব করিয়া উঠিল। সুধন্ব জ্যোতির ঝলকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। প্রভু শুষ্কবস্ত্র অঙ্গে জড়াইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

প্রভু যখন সুধন্বকে ডাকিয়া লইয়া যান তখনই প্যারীমোহন জাগিয়া উঠিয়াছে এবং প্রভুর স্নান দর্শন করিবার জন্য বসিয়া রহিয়াছে। শ্রীঅঙ্গের আলোর ছটায় যখন চারিদিক উদ্ভাসিত

হইয়াছিল তখন প্যারীমোহন তাহা পুলকিত চিত্তে দর্শন করিয়াছে। সে আর ঘুমায় নাই, বসিয়াই রহিয়াছে। রমেশ-চন্দ্রকে স্নান করিয়া যাইতে দেখিয়া বুঝিল এইবার প্রভাত হইল।

প্যারী ঘাটে গিয়া দেখিল সুধন্ব ঘুমাইতেছে। সে তাহাকে ডাকিয়া তুলিল। প্যারীমোহনের সংশয় হইল, সুধন্বটা বোধ হয় কিছুই দেখে নাই ঘুমের ঘোরেই রহিয়াছে। সুধন্ব মনে করিল, প্রভু কৃপা করিয়া ডাকিয়া আনিয়া আমাকে যাহা দর্শন করাইয়াছেন, প্যারীর তা ভাগ্যে ঘটে নাই। সে এতক্ষণ বারান্দায় ঘুমাইয়াই ছিল। আমি যে কেন ঘাটলায় পড়িয়া আছি তাহা সে নিশ্চয়ই বুঝিতেছে না।

উভয়ে মেছের দিকে চলিল, অনেকক্ষণ দুজনে নীরবে থাকিল অপরে বঞ্চিত হইয়াছে মনে করিয়া। শেষে সুধা বলে, "কিরে প্যারী ?" প্যারী বলে, "কিরে সুধা ?" সুধা বলে "কি দেখলি ?" প্যারী বলে, "আমার হয়ে গেছে, তুই কি দেখলি ?" সুধা বলে, "আমিত কৃতার্থ, তুই কি দেখলি ?" শেষে উভয় উভয়ের কণ্ঠ ধরিয়া "জয় জগদ্বন্ধু" বলিতে বলিতে পরম উল্লাস দেখা দিল। প্রভুর অন্তর্য্যামিত্ব ও জ্যোতির্ম্ময় ঐশ্বর্য্য দর্শনে উভয়েই মুগ্ধ ও হতবিহ্বল হইয়া পড়িল।

শিক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার

সুধন্বকুমারের বাড়ী কাটিগ্রাম (ঢাকা)। বাবা জমিদার। কাটিগ্রামের জমিদারদের সঙ্গে বরুণ্ডী গ্রামের জমিদারদের খুব সৌহার্দ্দ্য। প্রতিবেশী জমিদারদের মধ্যে প্রায়শঃই হিংসা বিদ্বেষ লাগিয়া থাকিত। কিন্তু কাটিগ্রাম ও বরুণ্ডীর জমিদারদের মধ্যে কোনদিন বাদবিসংবাদ হয় নাই।

বরুণ্ডী কাটিগ্রাম হইতে দেড় মাইল দূর। জমিদার চন্দ্রকুমার নিয়োগী বরুণ্ডীর খ্যাতনামা লোক। চন্দ্রকুমারের দুইপুত্র, ব্রজেন্দ্র ও অপূর্ব্ব। অপূর্ব্ব মানিকগঞ্জের পোষ্টমাষ্টার। ব্রজেন্দ্র ধানকোড়া গ্রামের হাইস্কুলের শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি ধানকোড়া গার্লস্কুলের হেডমাষ্টারী করিতেন। কাটিগ্রামের সুধন্বকুমারের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রকুমারের ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

ব্রজেন্দ্র বাল্যে ধনুকবান তৈয়ারী করিয়া পশু পাখী শিকার করিতেন। একদিন এক সাধু পুরুষ আসিয়া পক্ষী শিকারে নিষেধ করেন। পরে একদিন ঐ মহাপুরুষ তাহাকে সঙ্গে লইয়া গভীর বনের মধ্যে চলিয়া যান ও তাহার কর্ণে একটি মধুর নাম অর্পণ করেন। নামটি ব্রজেন্দ্রের খুব মধুরলাগে। অতঃপর ঐ মহাপুরুষের সঙ্গে তিনি আরও গভীর বনে যান। মহাপুরুষ হঠাৎ অন্তর্ধান করেন। ব্রজেন্দ্র তাঁহার দেওয়া নামটি উচ্চৈঃস্বরে জপিতে লাগিলেন। নয়ন-মনোহর মূর্ত্তি দর্শনে ইন্দ্রিয় কৃতার্থ হইল। ব্রজেন্দ্র সুধাইল, "আপনি কে ?" মহাপুরুষ
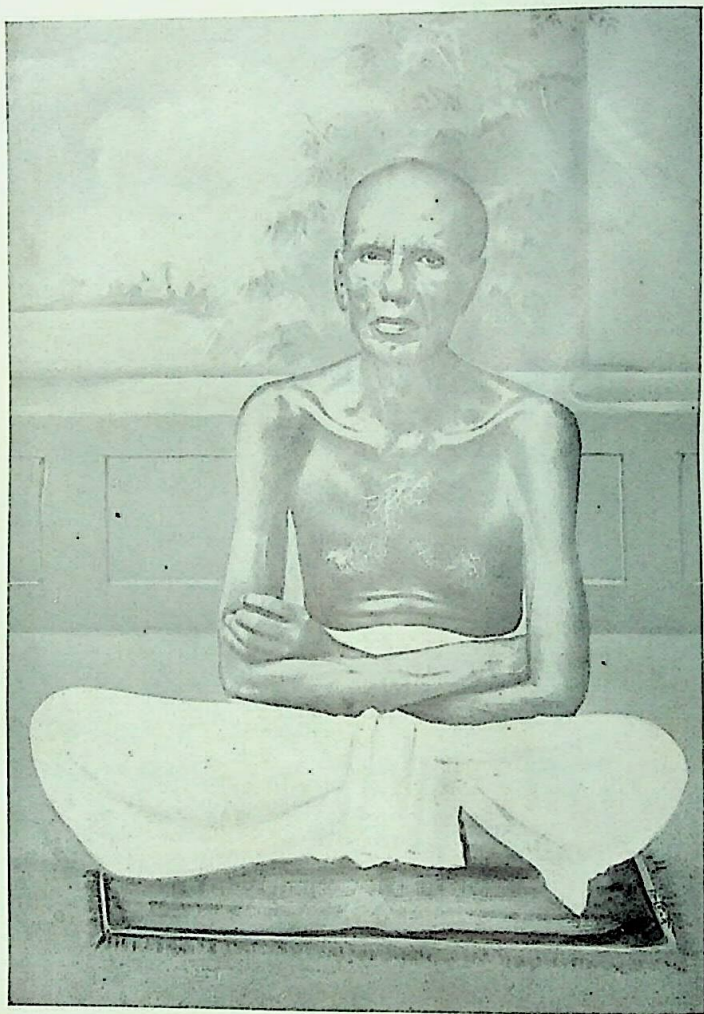
ভক্তবর—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার নিয়োগী

বলিলেন, "আমি ভক্তের দাস।" ব্রজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি করিব?" উত্তর আসিল, "জগদ্বন্ধু নাম করিস।"

"জগদ্বন্ধু" নামটিই ব্রজেন্দ্র কর্ণে লাভ করিয়াছিলেন। জগদ্বন্ধু সম্বন্ধে নামটি ছাড়া তিনি আর কিছু জানিলেন না। হঠাৎ সুধন্বকুমার ঢাকা হইতে বাড়ী আসিয়াছে। বাল্য সখা ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। সুধন্বের উদ্দেশ্য, ঢাকা তিনি যে প্রাণজুড়ান বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন তাহা ব্রজেন্দ্রকে দিবেন। সুধন্বের মুখে "জগদ্বন্ধু"র কথা শুনিয়া ব্রজেন্দ্র চমকিয়া উঠেন। সুধন্ব ব্রজেন্দ্রকে প্রতিকৃতি দেখায়। বড় মধুর লাগে। ব্রজেন্দ্র সুধন্বকে বলে ঐ নাম সে আগে কি ভাবে শুনিয়াছে। উভয়েরই মনে হয় যে, ঐ ছদ্মবেশী মহাপুরুষ বন্ধুই হবেন। ভক্তদাস নামটি ব্রজেন্দ্রের চিরপ্রিয় ছিল। নিজরচনায় অনেক সময় গাহিতেন,—

"যাও হে চতুরানন বল গে সবায়।
ভক্তদাস বলে যেন মোরে সবে গায়॥"

অনন্তর ব্রজেন্দ্র ঢাকা গিয়া রমেশচন্দ্রের সঙ্গ ও সান্নিধ্য পাইয়া বিশেষভাবে প্রভুর কৃপালাভ করেন। প্রভুর আদেশে ব্রজেন্দ্র বৃন্দাবনে চলিয়া যান। দীর্ঘদিন ফিরেন না। ব্রজেন্দ্রের জননী পুত্রের জন্য কাতর হইয়া অভিমান ভরে প্রভুকে অনেক কথা বলেন। মায়ের আব্দার শুনিয়া প্রভু বলিলেন, "পাগলকে কিছু বলিস না, ঐ আসছে।" তৎপর দিনই ব্রজেন্দ্র বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হন।

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দর মাঝে মাঝেই বরুণ্ডী গ্রামে আসিতেন। আসিতেন সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে ঢাকিয়া ছদ্মবেশে সর্ব্বলোকলোচনের অন্তরাল দিয়া। ব্রজেন্দ্রকে ধরা দিতেন। কারুণ্যপূর্ণ ঢলঢলে চাহনি ব্রজেন্দ্রের মন প্রাণ চুরি করিত। তপ্ত হেমকান্তি দর্শনে সোনার গৌর বলিয়া চিনিয়া লইতে তাহার বেশী কাল বিলম্ব হইত না।

যেন কত যুগ যুগান্তরের আপন জন। অতি সঙ্গোপনে, অতি নিকটে টানিয়া লইয়া—অমৃতবর্ষিণী বাক্যে ভক্তকে পরিতৃপ্তি দান করিতেন। ব্রজরসের নিগূঢ় মাধুরী তাহাকে ভোগ করাইতেন। তাহার স্বীয় মঞ্জরী-স্বরূপ জাগাইয়া দিয়া কুঞ্জসেবা মাধুর্য্যে নিমজ্জিত করিতেন। প্রভুর অযাচিত কৃপায় ব্রজেন্দ্র অতি অল্প বয়সেই ব্রজগৌর লীলাতত্ত্ব-সিন্ধু মধ্যে অবগাহন করিয়া নিবিড়ভাবে আস্বাদনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

একদিন গভীর রাত্রে বন্ধুসুন্দর ব্রজেন্দ্রকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাকিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে বলিলেন। আজ্ঞাধীন ভক্ত অনুচরের মত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন অন্ধকারের মধ্যে। প্রবেশ করিলেন এক গহন কাননে। "এখানে অপেক্ষা কর, যাবৎ আমি না আসি। এক পদও এদিক ওদিক যাবি না" বলিয়া বন্ধুসুন্দর কোথায় যেন লুকাইয়া গেলেন। অত্যল্পকাল পরেই একটা ভীষণাকৃতি সর্প তাহার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া আগাইয়া আসিল। মাটি হইতে মস্তক তুলিয়া তাহা ব্রজেন্দ্রের প্রায় মুখের নিকটবর্ত্তী করিল। ফোস্ ফোস্ গর্জ্জন চলিতে লাগিল। দুইটী চক্ষু হইতে ক্রূরতার বহ্নি ফাটিয়া বাহির হইতে

লাগিল। এইরূপ অবস্থায় পলায়নপর না হইয়া থাকা যে কোন মানুষের পক্ষেই অসম্ভব।

ব্রজেন্দ্র কিন্তু শান্ত স্থির অচঞ্চল ভাবেই রহিলেন। বন্ধুসুন্দরের আদেশ শিরে লইয়া অবচলিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুখে নাম জপ চলিতে লাগিল। মন প্রাণ তাহাতে ডুবিয়া গেল। কিছু সময় পরে সর্পরাজও ফণা গুটাইয়া বনে ঢুকিয়া পড়িল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বন্ধুসুন্দরের স্বর্ণকান্তি ফুটিয়া উঠিল। মধুর হাসিয়া কহিল, "ভয় পাস নাই তো"!

"ভয় কি! তোমার কৃপায় সর্ব্বত্র বিজয়—" ভক্তবর অতি সহজ ভাবে উত্তর দিলেন।

এই কঠোর পরীক্ষার কয়েকদিন পর আর একদিন বন্ধুসুন্দর তাহাকে দর্শন দিলেন আধ স্বপ্ন আধ জাগরণ অবস্থায়। "আজ তোকে নাম মন্ত্রে অভিসিক্ত করিব" বলিয়াই বন্ধুসুন্দর একটি মহামন্ত্র তাহার তুই কর্ণে তুইবার উচ্চারণ করিলেন। স্বয়ং নামীর মুখে মাধুর্য্য-মণ্ডিত নাম পাইয়া ব্রজেন্দ্রকুমার অপার আনন্দ-পয়োধিনীরে ডুবিয়া যান।

ভাবাবেশে প্রাপ্ত নাম ঠিক কি অঠিক, ইহা লইয়া কিঞ্চিৎ সন্দেহ ভাব ব্রজেন্দ্রকুমারের মনে উকিঝুকি মারিত। একদিন শ্রীযুত রমেশচন্দ্রের মুখে শুনিলেন যে, প্রভু বন্ধুসুন্দর তাহাকেও ঐ নাম জপ করিতে সাক্ষাৎ ভাবে আদেশ করিয়াছেন। পরে শ্রীবন্ধুসুন্দরের শ্রীহস্ত লিখিত ত্রিকাল গ্রন্থে ঐ নাম সমাবেশ

দর্শন করিয়া ব্রজেন্দ্রকুমারের সংশয় বর্জ্জিত বিপুল আনন্দের উদয় হয়। প্রভু ঐ নামের আদ্যে একটি "জয়" শব্দ যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ব্রজেন্দ্রকুমার ঐ মন্ত্রকেই জীবনের সার করিয়াছিলেন। নাম পাওয়ার পর কিছুকাল সংসার বিষয়ে প্রবল বিরাগ উপস্থিত হয়। কয়েক বৎসর সংসার পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশে পর্য্যটন করেন। অবশেষে পিতৃ আজ্ঞায় গৃহে ফিরিয়া ব্রজেন্দ্রকুমার দেবী বিরজামোহিনীর পাণিগ্রহণ করেন। সংসারী হইয়াও ব্রজেন্দ্র কঠোর তপস্বীর মত ছিলেন। পতিপত্নী উভয়ে প্রভুর নামে কীর্ত্তনে মাতোয়ারা থাকিতেন।

ব্রজেন্দ্রকুমার ধানকোড়া স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছেন বহু বৎসর। তাঁহার গম্ভীর চিন্তাশীল স্বভাব ও ছেলেদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ও মধুর উপদেশাবলীতে সকলে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত ভয় করিত, ভালবাসিত। বহু ছাত্রের জীবনে আধ্যাত্মিক উন্মাদনা জাগিয়াছে ব্রজেন্দ্রকুমারের সঙ্গপ্রভাবে। দ্বিজেন্দ্র নামক একটি ছাত্রকে তিনি বিশেষ স্নেহ করিতেন। তাহার সঙ্গভাগ্যে ছাত্রটীর জীবনে কৌমার বয়সেই প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হয়। শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর কৃপাকর্ষণ অনুভব করিয়া দ্বিজেন্দ্র সংসার ত্যাগ করিয়া প্রভুবন্ধুর চরণে শরণাপন্ন হন। অদ্যাপি তিনি বৈরাগ্যময় ভজনপথে বন্ধুসুন্দরের চরণসরোজে ভৃঙ্গের মত লাগিয়া আছেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি তাঁহার পূজ্যপাদ শিক্ষক ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁহার জীবন সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদুক্তি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই ফলবতী হইয়া

গিয়াছে। ইহাতে তিনি যে দ্রষ্টাপুরুষ ছিলেন, তাহা নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিভাত হয়।

শ্রীশ্রীহরিকথা গ্রন্থ রচনা করিয়া ভক্তগণকে আদেশ করেন উহা পাঠ করিতে। ব্রজেন্দ্র বলিলেন, "প্রভু হরিকথা আদৌ বুঝা যায় না, পড়িয়া কি হবে" রস পাওয়া যায় না।" গম্ভীর ভাবে প্রভু বলিলেন, "একি যোষিতা যে রস পাবে ?"

"এ মহাউদ্ধারণ গ্রন্থ। অবিরাম পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবে। ভাগবত গ্রন্থের মত পৃথক ভাবে রাখিয়া নিত্য পাঠ করিবে। হরিকথা পাঠে তোমরা নির্ম্মল ছাপ সাদা বরফের মত ধবধবে হইয়া যাইবে। কৈতব থাকবে না। যাহারা মাহেশ ব্যাকরণ পড়িবে তাহারা বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিবে। মুখস্থ করে রাখ, সময়ে আমিই বুঝাইব।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর এই মহাবাণী হৃদয়ে গাঁথিয়া লইয়াছিলেন ব্রজেন্দ্রকুমার। হরিকথা তাহার কণ্ঠহার ছিল। যে সকল কথাগুলি বীজমন্ত্রের মত, বুঝা যায় না, তাহাও তাহার কণ্ঠেতে ছিল। কাহারও অসুখবিসুখে উহা পাঠ করিয়া ঝাড়িয়া দিতেন। তাহাতে অদ্ভুত ফল দেখা যাইত।

কোন কোনদিন হরিকথার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গান করিতেন। কীর্ত্তনের সঙ্গী পত্নী, পঞ্চপুত্র ও দুইকন্যা। মৃদঙ্গ বাজাইতেন কনিষ্ঠ অপূর্ব্ব কুমার। গাইতে গাইতে ব্রজেন্দ্র চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেন। ছেলে মেয়েদের প্রত্যহ কীর্ত্তন করিতে হইত। কীর্ত্তন না করিলে ব্রজেন্দ্রের পত্নী পুত্র কন্যাদের খেতে দিতেন না।

হরিকথার একস্থানে আছে 'কীট অরিষ্ট'—জয় হরিবোল জয় নিতাই" এই কথাটি ব্রজেন্দ্রের মুখে প্রায়ই শোনা যাইত। ব্রজেন্দ্র অধিকাংশ সময় আনমনা থাকিতেন। কখনও বাজার করিতে গিয়া কোন কীর্ত্তন পাইয়া সেখানে বসিয়া যাইতেন। সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিতেন। একদিন অসুস্থ ছেলের জন্য ঔষধ পথ্য আনিতে বাহির হইয়া কোথায় কীর্ত্তনানন্দে ডুবিয়া যান। রাত্রে বাড়ী আসিয়া মনে পড়ে কেন গিয়াছিলেন বাহিরে। প্রভু কৃপায় পুত্র সুস্থ হইয়া যায়।

স্কুলে ছাত্র পড়াইতেন। তাহার পড়াইবার পরিপাটী ও ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রণালী ছিল অদ্ভুত। বহু ছাত্র তাহার হাতে মানুষ হইয়া হরিভক্তি লাভে ধন্য হইয়া গিয়াছে। ব্রজেন্দ্রকুমার দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন—তাহার হস্ত পদ কর্ণ প্রভৃতি অস্বাভাবিক ভাবে বড় ছিল। সকলের দৃষ্টি পড়িত।

গ্রাম গ্রামান্তরের বহু নরনারী ব্রজেন্দ্রকুমারের ভক্তিতে আকৃষ্ট হন। অনেক ব্রাহ্মণকুমার বাড়ীতে পড়িয়া থাকিত। এ হেতু ব্রাহ্মণ সমাজে একটি বিরুদ্ধতা দেখা যায়। কিন্তু বেশী দিন উহা স্থায়ী হয় নাই। তাহার ভক্তি-সম্পদের মাধুর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যান।

কাটীগ্রামের রজনী রায় ব্রজেন্দ্রের সংসর্গে আসিয়া পরম ভক্ত হন। রজনী রায়ের এক আত্মীয় ব্রজেন্দ্রের কৃপায় বিশেষ ভাবে প্রভুর চরণাশ্রয় করেন। স্বপ্নে প্রভুর সঙ্গে তার কথা হইত। একদিন নিদ্রিতাবস্থায় প্রভুর সঙ্গে তিনি গমন করেন। অনেক কণ্টকাকীর্ণ পথ ধরিয়া তিনি চলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে

দেখা যায়, চরণতলে বহু কণ্টক বিদ্ধ হইয়া আছে। তিনি পূর্ব্বে কখনও বৃন্দাবনে যান নাই কিন্তু প্রত্যক্ষ দৃষ্টের মত সব বর্ণনা করেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেকেই প্রভুর দিকে অগ্রসর হন। বহুভক্ত সঙ্গে ব্রজেন্দ্রকুমার ফরিদপুর গিয়া প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া আসেন।

রাত্রের অন্ধকারে প্রভুর অঙ্গনে আসেন। পরদিন রমেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, "ব্রজেন্দ্র, অন্ধকারে কি করিয়া রাত্রে আসিলে?" ব্রজেন্দ্র বলেন, "না, আলো তো ছিল! প্রভুর ঘরের উপরে বড় আলো ছিল।" রমেশ শুনিয়া অবাক হন। বস্তুতঃ প্রভুর গৃহের উপর কোন আলো ছিল না। কোনদিনও থাকিত না। ভক্তসঙ্গে ভগবানের আনন্দের খেলা অফুরন্ত।

ব্রজেন্দ্রকুমার আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব ছিলেন। নিরন্তর স্মরণ মনন তাঁহার জীবাতু ছিল। দীন শান্ত ভাবে জীবন কাটাইয়া শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রভুবন্ধু স্মরণে মহানামাক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ক্যান্‌সার রোগে দীর্ঘ দিন ভুগিয়াছেন কিন্তু একটি দিনের জন্য ব্যাধির তাড়নায় হাহুতাশ দেখা যায় নাই। মধ্যম পুত্র বীরেন্দ্র নাথ সর্ব্বদা পিতার পার্শ্বে থাকিয়া সেবা করিতেন। নাম কর, এছাড়া আর কোন কথাই সেই শয্যাশায়ী মহাপুরুষের মুখে কেহ শুনিতে পাইত না।

তাহার শিক্ষাগুণে ও আশীর্ব্বাদে তাঁহার পুত্র কন্যা পৌত্র পৌত্রীগণ সকলেই শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের শ্রীচরণনিষ্ঠ ভক্ত।

শ্রীরাধাবল্লভের কথা

"রমেশ, তুই আমার রাধাবল্লভকে দেখিস"

ঢাকা সহর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণ দিকে বাঘৈর গ্রাম। সাহা জমিদারদের বাসস্থান। উক্তগ্রামে জগবন্ধু সাহা মহাশয়ের বাস। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ রাধাবল্লভ। রাধাবল্লভ বাল্যে পিতৃহীন, জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের আদরে পালিত। রাধাবল্লভ তেঘরিয়া স্কুলে পড়ে। বর্ষায় বাঘৈর হইতে তেঘরিয়া যাওয়া বিশেষ অসুবিধা বলিয়া জেঠামহাশয় রাধাবল্লভকে ঢাকা ডাইলপট্টিতে স্থিত ইম্পিরিয়াল সেমিনারীতে সেভেন্থ ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া দেন। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বালক রাধাবল্লভ প্রত্যহ স্কুলে যাতায়াত করিত।

বাঘৈর গ্রামের কতিপয় ভক্তলোক একবার নবদ্বীপ ধাম যান। তাহারা নবদ্বীপ হরিসভায় বন্ধুসুন্দরের রচিত পদ কীর্ত্তন শুনিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন। লম্বা লম্বা কাগজে মুদ্রিত কতিপয় গান তাহারা নবদ্বীপ হইতে নিজ গ্রামে আনিয়া প্রচার করেন। গ্রামবাসী ভক্তগণ এক বৎসর ঐ সব গান কীর্ত্তন দ্বারাই একটি অষ্টপ্রহর ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠান করেন। ঐ সময় বালক রাধাবল্লভ ঐ কীর্ত্তনে মুগ্ধ হয়। কয়েকটি গান তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। আপন মনে সে ঐ গান গাহিত। রাধাবল্লভ সঙ্গীতজ্ঞ না হইলেও তাহার অন্তরটি সঙ্গীতময়।

রাধাবল্লভ ইম্পিরিয়াল সেমিনারীতে তখন থার্ড ক্লাসে পড়িতেছে। যুবকদের দলে মিশিয়া বেশ চতুর চালাক হইয়া

"সুবল বটু" শ্রীরমেশ প্রিয়

শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ সাহা
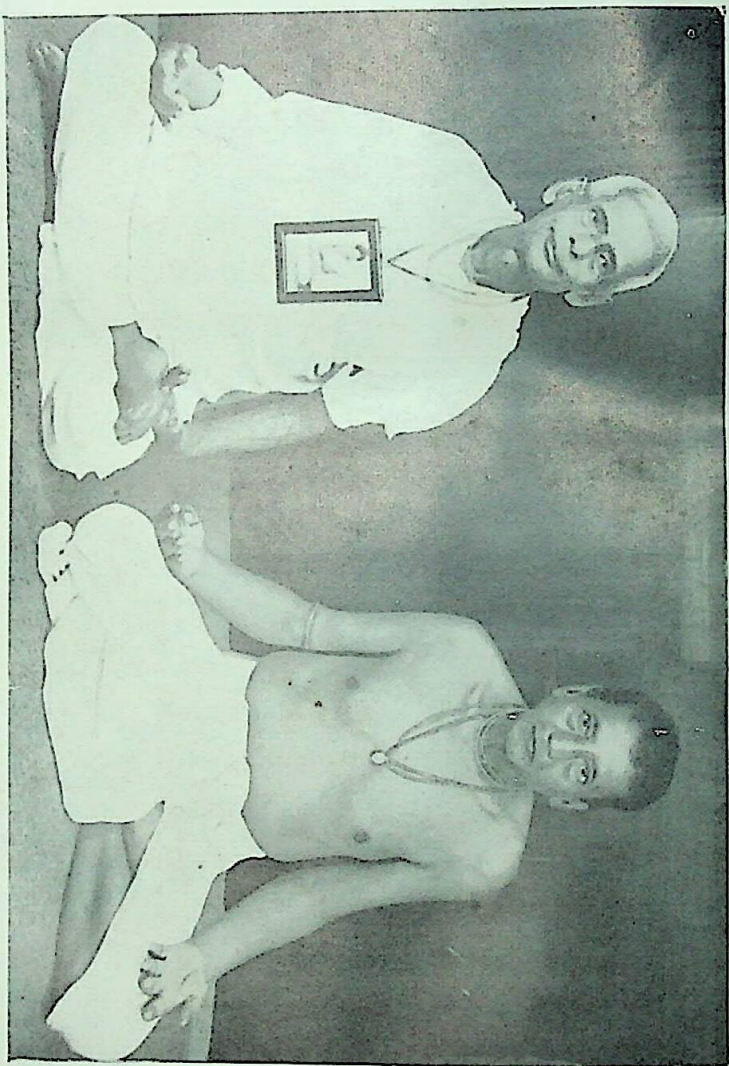
উঠিয়াছে। একদিন তাহাদের স্কুলে একজন নূতন শিক্ষক আসিলেন। তাহার ছোট ছোট চুল, সুদীর্ঘ শিখার গুচ্ছ। সাদা থানের কাপড় পরিধানে। কণ্ঠে বাহুতে তুলসীর মালা। এই বেশধারী শিক্ষক ছাত্রেরা কখনও দেখে নাই। তাহারা বেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠে।

নূতন শিক্ষক যখন ছাত্র পড়াইবার জন্য ক্লাসে প্রবেশ করে, রাধাবল্লভ বিদ্রূপের সুরে বলে "বাবাজী, এদিকে আসছ কেন, পথ ভুলিয়া গিয়াছ নাকি।" শিক্ষকের গোক্ষুরাকৃতি সুদীর্ঘ শিখা সকল বালকেরই হাস্যের উদ্রেক করে। রাধাবল্লভ চুপে বলে, "একদিন কাঁচি দিয়া কেটে দিলেই বেশ হবে", এইরূপ নানা বালক নানা মন্তব্য করিতে থাকে। শিক্ষক গম্ভীরভাবে আসনে বসে।

এই নূতন শিক্ষকটি আমাদের বন্ধুগতপ্রাণ রমেশচন্দ্র। ফরিদপুরের শিক্ষকতা ছাড়িয়া ঢাকায় শিক্ষকতার চাকুরী তখন প্রথম লইয়াছেন। ছাত্রদের বিদ্রূপোক্তি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রমেশচন্দ্র পড়াইতে আরম্ভ করেন। অল্প সময় মধ্যেই ছাত্রগণ নিস্তব্ধ হইয়া যায়। গুঞ্জরণ থামিয়া যায়। রমেশচন্দ্রের পাঠনভঙ্গি, ইংরেজীর উচ্চারণের সুস্পষ্টতা, ব্যবহারের অমায়িকতা ছাত্রদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। ছাত্রের দল রমেশচন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

পাঠ দিবার সঙ্গে সঙ্গে রমেশচন্দ্র সর্ব্বদা চরিত্রগঠন ও জীবনগঠনের কথা বলিতেন। উচ্চশিক্ষিত সকলে হইতে পারে না নির্ম্মল চরিত্রবান সকলেই হইতে পারে। চরিত্রের পবিত্রতাই

জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সকল কথা পূত চরিত্র রমেশচন্দ্রের মুখ হইতে এমন শক্তিযুক্ত হইয়া বাহির হইত যে, যে-ছাত্র শুনিত সে-ই নবভাবে জীবন গঠনের প্রেরণা পাইত। রাধাবল্লভও পাইল।

দিগেন্দ্ররায় রাধাবল্লভের সহপাঠী। দিগেন্দ্র প্যারীমোহন সেনের ভাগিনেয়। প্যারীমোহন সেন রমেশচন্দ্রের প্রিয়। তাহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্যারীর পরিচয়ে দিগেন্দ্রও রমেশের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। একদিন রমেশচন্দ্র দিগেন্দ্রকে বলিলেন, "রাধাবল্লভকে বলিস্ "চুলের বিলাসিতা যেন ত্যাগ করে। ছোট ছোট করিয়া যেন ছাটে।" দিগেন্দ্রের মুখে এই কথা শুনিয়া রাধাবল্লভের আনন্দ হইল। রমেশচন্দ্রের দৃষ্টিতে পড়ার আগ্রহ রাধাবল্লভের প্রবল ছিল।

রমেশচন্দ্রের স্নেহের দৃষ্টিতে রাধাবল্লভের জীবনের মোড় ঘুরিল। রাধাবল্লভ যৌবন চাঞ্চল্যে অধীর হইয়া রমেশচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। রমেশচন্দ্রের উপদেশ ও নির্দ্দেশ রাধাবল্লভকে অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী করিল।

রাধাবল্লভ অনেক সময় বাগানবাড়ীতে আসিয়া থাকিত। ছুটির সময় রমেশের সান্নিধ্যে থাকিত। পরীক্ষার সময় রমেশ তাহাকে নিকটে ডাকিয়া রাখেন। শ্রীশ্রীপ্রভু একদিন রমেশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "রমেশ, তুই আমার রাধাবল্লভকে দেখিস্।" রমেশচন্দ্র সারাজীবন প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছেন।

নবদ্বীপ হইতে আগত ভক্তগণের মুখে যে কীর্ত্তন শুনিয়া রাধাবল্লভ মুগ্ধ হইয়াছিল, সেই কীর্ত্তনই আবার শুনিতে লাগিল

রমেশচন্দ্রের সঙ্গীদের মধ্যে। ইহাতে রাধাবল্লভের প্রাণে বিপুল আনন্দের উদয় হইল। পূর্ব্বের শোনা সেই মধুর পদগুলি এখন নবীনভাবে হৃদয় স্পর্শ করিল।

রাধাবল্লভের দর্শন

প্রভু বন্ধুসুন্দর কিছুদিন যাবত রামচরণ শাহর বাগানে আসিয়াছেন। রাধাবল্লভ কত আসে কত যায়, কিন্তু ভাগ্যে দর্শন মিলিতেছে না। আজ রাধাবল্লভ মধ্যাহ্নে বাঘের হইতে আসিয়াছে। বাগানে কেহই নাই। গৃহমধ্যে একা প্রভু আছেন। রাধাবল্লভ হল ঘরটির মধ্যে বসিল।

বসিয়া রাধাবল্লভ নয়ন নিমীলন করিয়া ধ্যানাবিষ্টের মত মানসে প্রভুর কাছে নিবেদন করিতে লাগিল। প্রভু কতদিন আসিলাম, একদিনও দেখা দিলে না! আজ তো কেউ নাই একটিবার একটু দর্শনের ভাগ্য দেও না! এই ভাবে কাতর প্রার্থনা চলিতে লাগিল।

হঠাৎ রাধাবল্লভের কর্ণে কপাটের কড়ানাড়ার শব্দ প্রবেশ করিল। ভাবিল, বিড়ালের কাণ্ড। শব্দ আরও বাড়িল। তখন চক্ষু খুলিয়া রাধাবল্লভ যাহা দেখিল, তাহাতে সে একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল।

শ্রীশ্রীপ্রভু স্বয়ং দাঁড়াইয়া আছেন। তাহারই মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শ্রীচরণে কপাটের কড়া নাড়িতেছেন। সুবিশাল

দেহখানি ঝলমল করিতেছে। কপাটের উপরে উঠিয়াছে শ্রীমস্তক। রাধাবল্লভের দৃষ্টি পড়িল শ্রীমুখের দিকে। কপালের মধ্যদেশ জ্যোতির্ম্ময় যেন একটা অত্যুজ্জ্বল টর্সের আলো। দর্শকের চক্ষু ঝলসিয়া উঠিল। রাধাবল্লভ আর কিছু দেখিতে পাইল না। শির অবনত হইল, করুণার কথা ভাবিয়া হৃদয় ভরপুর হইয়া গেল।

রমেশচন্দ্র আসিয়া রাধাবল্লভের বদনের প্রসন্নতা দর্শনেই বুঝিলেন প্রভু দর্শন দিয়াছেন। পরে রাধাবল্লভের মুখে শুনিলেন। সকল শুনিয়া রমেশের আনন্দ ধরে না। তার প্রিয়জনকে প্রভু গ্রহণ করিয়াছেন, এই ভাবনাতেই রমেশচন্দ্র পরম সুখী।

অপর একদিন রাত্রিতে রাধাবল্লভ বাগানবাড়ীতে হলের মধ্যে শয়ন করিয়া আছে। শেষরাত্র ৩টায় প্রভু রমেশচন্দ্রকে লইয়া বুড়ীগঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছেন। স্নান করিয়া ফিরিতেছেন। ফিরিয়া নিজগৃহে প্রবেশকালে যেখানে রাধাবল্লভ শয়ন করিয়া আছে, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ চরণখানি রাধাবল্লভের ঠিক বক্ষস্থলে রাখিলেন। শীতল স্পর্শ-সুখে অভিভূত রাধাবল্লভ নয়ন খুলিল। প্রভু দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মস্তক গিয়া দালানের কড়িবর্গায় ঠেকিয়াছে। সেদিন যাহা দেখিয়াছেন তাহারও প্রায় দুই গুণ বড়। কি আশ্চর্য্য মূর্ত্তি! কি মনোমদ গন্ধ!! কি স্নিগ্ধ শীতল সুখস্পর্শ!!!

অপর একদিন সন্ধ্যাবেলা শ্রীশ্রীপ্রভু ফরিদপুর যাইবেন ইচ্ছা করিয়া রমেশচন্দ্রকে টিকেট আনিতে বলিতেছেন। রমেশের ইচ্ছা আরও কয়েকদিন থাকেন। তিনি এখন না যাইবার পক্ষে

নানা ওজর দেখাইতেছেন। তাহাতে প্রভু একটু অভিমান করিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া একটা বেগুণ ক্ষেতের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাধাবল্লভ ভক্ত ভগবানের কোন্দল দেখিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ শুভবস্ত্রে ঢাকা। হঠাৎ শ্রীনাসিকা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। রাধাবল্লভের দৃষ্টি সেইদিকে পড়িল। আর ফিরান গেল না। কি যে সে নাসার গড়ন ভাষায় প্রকাশের সামর্থ্য কাহারও নাই। তিলফুল নাসা, খগরাজ নাসা ইত্যাদি মহাজনদের পদে আছে! রাধাবল্লভের মনে হইল, ঐ সকল উপমাই তুচ্ছ। বন্ধুর শ্রীনাসিকা শুধু তাঁহার নাসিকার মতই। দৃষ্টান্ত আর নাই। এই সকল কথা বলিতে রাধাবল্লভ আজও চোখের জলে ভাসে।

"গরম গরম ভাল লাগে"

রমেশচন্দ্র প্রভুর জন্য রান্না করিতেছেন। কতগুলি পটল ভাজিয়া বাটীতে ঢাকা দিয়া রাখিয়াছেন। জল আনিবার জন্য রমেশ কলসী লইয়া ঘাটে গিয়াছেন।

প্রভু ধীরে ধীরে তাহার থাকিবার ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরে আসিয়াছেন। অতি সন্তর্পণে পটল ভাজা খাইতে আরম্ভ করিলেন। খাওয়া প্রায় শেষ এমন সময় রমেশ জল লইয়া আসিলেন। "পটলগুলি অমনি খেলে, শেষে ডাল দিয়ে

কি খাবে?" রমেশের প্রশ্নে প্রভু বলিলেন "রমেশ রে, পটলভাজা গরম গরম ভাল লাগে। এখনও আমি খাব, তখনও আমি খাব।" প্রভুর শিশুর মত ব্যবহার ও কথায় ভক্তগণ আনন্দে বিভোর হইলেন।

শ্রীঅঙ্গনের সূচনা

"এই স্থানে আমার আসন হবে"

শ্রীশ্রীপ্রভু ঢাকা হইতে ফরিদপুর আসিয়া বদরপুর বাদলগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন অপরাহ্ন বেলায় সর্ব্বদেহ বস্ত্রের আবরণে ঢাকিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু নবদ্বীপ দাস সঙ্গে যশোহর রোড দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে পশ্চিমদিকে আসিতে লাগিলেন।

যশোহর রোড গোয়ালচামট গ্রামের পশ্চিম দিক হইতে উত্তর পার্শ্ব ঘেষিয়া আসিয়া গ্রামকে দুইভাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণকান্দা গ্রাম রাস্তার দক্ষিণপার্শ্বে। বদরপুরও গোয়ালচামট গ্রাম রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। যশোহর রোডের উপর দরবেশের পুল নামক একটি সেতু আছে। ঐ সেতুর দক্ষিণ পার্শ্বে একটি নাতিবৃহৎ জলাশয় আছে। জলাশয়কে দরবেশের জোলাও বলা হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, ফরিদশাহ দরবেশের নামানুসারে ফরিদপুর জেলা হইয়াছে। তিনিই একসময় এইস্থানে থাকিয়া ভগবানের ভজন করিতেন। এই জনশ্রুতির প্রমাণ সংগ্রহ করা

কঠিন। তবে ফরিদশা না হইলেও অপর কোন খ্যাতনামা ফকীর দরবেশ যে এখানে বাস করিতেন তাহা সংশয় নাই।

দরবেশের জোলা (জলাশয়) দেবখাত। ইহা কোন মনুষ্যকৃত নহে। গ্রাম্য লোকে ইহাকে "কুম" বলিয়া থাকে। কুম শব্দে গভীর গর্ত্ত বুঝায়। বর্ষাকালে পদ্মানদী হইতে অতি প্রবলবেগে জলস্রোত আসিয়া ঐ জোলায় পতিত হয়। তাহাতেই ঐ কুম বা গভীর গর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ স্থানে গভীর কুম সৃষ্টি করিয়া জলরাশি দক্ষিণ দিকবর্ত্তী এক স্রোতস্বিনী বহিয়া গ্রাম গ্রামান্তরে চলিয়া যায়। এই দরবেশ জোলাই প্রভুবন্ধুর কৃপাস্পর্শ পাইয়া পরবর্ত্তী কালে ভক্তগণের আদরের বন্ধুকুণ্ড নামে অভিহিত হন।

উক্ত জলাশয়ের পূর্ব্বতীরে এক নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্য দিয়া এক সরু পথ। শ্রীশ্রীপ্রভু বেড়াইতে বেড়াইতে দরবেশের পুলের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া বন্ধুসুন্দর ঐ সরুপথ ধরিয়া গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে নবদ্বীপ মুগ্ধের মত পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন।

অনেকদূর ভিতরে যাইবার পর দেখা গেল ঐ ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যেও খানিকটা স্থান বেশ পরিষ্কার ও অপেক্ষাকৃত উঁচু। পার্শ্বে একটি ছোট চালিতা বৃক্ষ। এখানে পরবর্ত্তী কালে যে মন্দিরের অন্ধকার কক্ষে নীরবে সুদীর্ঘ ষোল বৎসর আটমাস কাল লোকলোচনের অন্তরালে বাস করিয়াছেন, সেই স্থানটিতে শ্রীপাদপদ্ম দুখানি রাখিয়া বন্ধুসুন্দর মৃদুমধুস্বরে নবদ্বীপদাসকে বলিলেন—"এই স্থানে আমার আসন হবে।"

"এখানে শ্রীঅঙ্গন করিব"

ঐরূপ নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রভুর আসন হবে শুনিয়া নবদ্বীপ বিস্মিত হইয়া প্রভুর শ্রীমুখের দিকে তাকাইলেন। প্রভু বলিলেন "নবা, এই জায়গাটি কার, জান ?" নবদ্বীপ অনুমানে কহিলেন, "বোধ হয় পার্শ্ববর্ত্তী মুদীদের।"

গোয়ালচামট গ্রামের কুঞ্জবিহারী সরকার শ্রীশ্রীপ্রভুর ভক্ত। প্রভু নবদ্বীপকে দিয়া কুঞ্জ সরকারকে ডাকাইয়া আনিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর ইচ্ছা এ'স্থানে আঙ্গিনা করেন। এই ইচ্ছার কথা কুঞ্জবিহারীর নিকট ব্যক্ত করেন। কুঞ্জকে আদেশ করিলেন, ঐ স্থানের মালিককে লইয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হইতে।

আদেশমত একদিন কুঞ্জ উক্তস্থানের মালিক শ্রীরামসুন্দর মুদী মহাশয়কে লইয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীচরণ সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন। রামসুন্দর প্রণত হইলে শ্রীশ্রীপ্রভু বলিলেন, "রামসুন্দর, তুমি আমাকে ঐ স্থানটি একেবারে ছেড়ে দাও, আমি ওখানে শ্রীঅঙ্গন করিব। ভবিষ্যতে ঐ স্থানের কোন দাবী করিতে পারিবে না।"

শ্রীযুক্ত মুদী মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রভুর আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেন। কয়েকদিবস পর শ্রীশ্রীপ্রভু নবদ্বীপ দাসের হাত দিয়া কুঞ্জবিহারীর নিকট আশী টাকা পাঠাইয়া দিলেন, ঐ স্থান পরিষ্কার করিয়া চারি ভিটিতে চারিখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য।

শ্রীযুক্ত রামসুন্দর সাহা মুদি

কুঞ্জবিহারী কাজ আরম্ভ করাইয়া দিলেন। আরও অনেক টাকার প্রয়োজন বুঝিয়া নবদ্বীপদাস অর্থ ভিক্ষা করিবার জন্য কুমারখালীর দিকে রওনা হইলেন।

ভক্ত সঙ্গে ভক্তের কৌতুক

জ্যৈষ্ঠের শেষভাগে প্রভু ঢাকা হইতে আসেন। তৎপর রমেশচন্দ্র ও কালিন্দীমোহন কলিকাতা চলিয়া যান। পূর্ণচন্দ্র বহরমপুর হইয়া কলিকাতা আসেন। পূর্ণচন্দ্রের ইচ্ছা রথযাত্রায় পুরীতে জগন্নাথ দর্শনে যাবেন। রমেশচন্দ্র বলিলেন, "পূর্ণ, প্রভু বলেছেন, তোরা এখন পুরীতে যাস না, আমার সঙ্গে যাবি। চল আমরা ফরিদপুর প্রভুর দর্শনে যাই। প্রভুই আমাদের জগন্নাথ জগদ্বন্ধু।"

রমেশচন্দ্র, কালিন্দীমোহন, পূর্ণচন্দ্র ফরিদপুর পৌঁছিলেন। প্রভু বদরপুর বাদলগৃহে আছেন। রমেশচন্দ্র বাদলের সঙ্গে কৌতুক রহস্য করিবার জন্য পূর্ণকে বলিলেন, "তোমাকে বাদল চিনে না, তুমি একা বাদলের নিকট গিয়া বলিবে, আপনার বাড়ীতে প্রভু আছেন, আপনি সাক্ষাৎ শ্রীবাস। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে প্রভু দর্শন করাইবেন। এই বলিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিবে—দেখি বাদল কি বলে।" তাহাই ঠিক হইল। বাদল বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীর কাছে আসিয়া রমেশচন্দ্র ও

কালিন্দীমোহন যশোর রোডের উপরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। পরিচয় লইয়া পূর্ণ বাদলের চরণতলে সাষ্টঙ্গে দণ্ডবৎ করিল। পূর্ণ বলিলেন, "বিশ্বাস মহাশয়, আপনি তো স্বয়ং শ্রীবাস। আপনার গৃহে সাক্ষাৎ প্রভু বিরাজমান আপনি কৃপা করিয়া আমাকে প্রভুর দর্শন করাইবেন।"

বিশ্বাস মহাশয় পূর্ণের পরিচয় চাহিলে পূর্ণ বলিলেন, "নাম যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ, বহরমপুর হইতে আসিয়াছি। (পূর্ণ-চন্দ্রের কোষ্ঠীর নাম ছিল যোগেন্দ্র) পরিচয় লইয়া বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন, "দেখ, প্রভুর দর্শন অত সহজ নয়। যুগযুগান্তর ধরিয়া যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ কঠোর সাধন ভজন ধ্যান ধারণা করিয়া যাহাকে পায়না, প্রভু সেই সাধনদুর্ল্ভ ধন। এসেই অমনি তাঁকে দর্শন পাওয়া যায় না। এখানে থাক, প্রভুর সেবা কর। কৃপা হইলে দর্শন দিবেন।" কিন্তু এই ব্যক্তি যে অনেকদিন পূর্ব্বেই প্রভুর পরম কৃপাদর্শন লাভ করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস মহাশয় বুঝিতে পারেন নাই।

বাদল পূর্ণচন্দ্রকে বলিতেছেন, এমন সময় ঝমাঝম বৃষ্টি আসিল। রমেশচন্দ্র ও কালিন্দীমোহন ভিজিতে ভিজিতে দৌড়াইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বাস মহাশয় রমেশচন্দ্র ও কালিন্দীমোহনকে চিনিতেন। তাহাদিগকে আদরে বসিতে দিয়া বিশ্বাস মহাশয় বাড়ীর ভিতরে যাইতেছেন, এমন সময় প্রভু একখানি কাগজ দরজার উপর দিয়া বাহির করিয়া দিলেন। বাদল তাহা দেখিবার আগেই পূর্ণচন্দ্র উহা

প্রভুর হাত হইতে ধরিয়া নিলেন। ঐ কাগজে লেখা ছিল,—

"পূর্ণ ডি ছি ঘোছেরা এছেছেন
ফর্দ্দ লেমনেড দিবা লেভেণ্ডার
ওডিকলম গোলাপজল এছেনসন
মণিঅর্ডর নোট পার্শ্বেল ডজন জুতা বার।"

প্রভুর হাত হইতে 'যোগেন্দ্র' বাবু যে কাগজ খানা লইলেন ইহাতে বিশ্বাস মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন কারণ প্রভু যাকে তাকে ঐরূপ ফর্দ্দ দেন না এবং যে সে লোক প্রভুর হাত হইতে ঐরূপ কিছু নিতে সাহসী হয় না।

বিশ্বাস মহাশয় রমেশচন্দ্রকে কহিলেন "রমেশ, লিমনেডের বোতল খুলিতে প্রভুর আঙ্গুল কাটিয়া গিয়াছে।" কথাটা শুনিয়া রমেশ বিশেষ দুঃখিত হইলেন। পূর্ণ ও কালিন্দী সঙ্গে প্রভু দরজার কাছে আসিলেন। পূর্ণ বলিল, "প্রভুর নাকি হাতের আঙ্গুল কাটিয়া গিয়াছে কতখানি কাটিয়াছে দেখি! লিমনেডের বোতল খুলিয়া দেবার কি আর কেউ ছিল না?" এই কথা বলিতে বলিতেই প্রভু দরজার উপর দিয়া হাত বাহির করিয়া দিলেন। পূর্ণ আঙ্গুল ধরিয়া দেখিল বেশী কাটে নাই, ঘা শুকাইয়া গিয়াছে।

একজন অপরিচিত যোগেন্দ্র বাবুর হাতের উপর প্রভু হাত বাহির করিয়া দিলেন ইহাতে বিশ্বাস মহাশয় আরও চমৎকৃত হইলেন।

পূর্ণচন্দ্র করতাল লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। "জয় জয় প্রাণচন্দ্র নিত্যানন্দ রাম।" রমেশচন্দ্র, কালিন্দীমোহন যোগ দিলেন। প্রভু গৃহের ভিতরে থাকিয়া খোল বাজাইতে-আরম্ভ করিলেন। খুব উল্লাস করিয়া অনেকক্ষণ বাজাইলেন। কীর্ত্তনান্তে তাহারা বিদায় লইয়া ফরিদপুর সহরস্থ সুরেশচন্দ্রের গৃহে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

প্রভু গৃহ হইতে উল্লাসে খোল বাজাইলেন। যোগেন্দ্র বাবুর কীর্ত্তনে বাদল একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। অতি প্রিয়জনের কীর্ত্তন ছাড়া প্রভু কখনও মৃদঙ্গ বাজান না। যোগেন্দ্রবাবু কি কোন মহাপুরুষ, বাদলচন্দ্র কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলেন।

প্রভুর ফর্দ্দমত পূর্ণচন্দ্র লেভেণ্ডার, ওডিকলম, এসেন্স প্রভৃতি কিনিয়া লইয়া পরদিন অপরাহ্নে আবার বাদল গৃহে উপনীত হইলেন। পূর্ণ কয়েকটি কচি শশাও আনিয়াছে প্রভুর জন্য। উহা প্রভুকে দেবার জন্য বিশ্বাস মহাশয়ের হাতে দিতেই তিনি বলিলেন, প্রভু কচি শশা খান না। পূর্ণচন্দ্র নিজেই চাকু দিয়া তৈয়ারী করিয়া কলাপাতায় করিয়া প্রভুর উদ্দেশ্যে ধরিলেই প্রভু উহা হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিলেন।

এই দৃশ্য দেখিয়া বিশ্বাস মহাশয়ের বিস্ময় চরমে উঠিল। তিনি করজোরে যোগেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, বলুন আপনি কে ও কোথাকার কোন্ মহাপুরুষ তাহা দয়া করিয়া পরিচয় দেন। গোয়ালচামটের প্রভুর প্রিয় ভক্ত কেদার শীল মহাশয় তথায় ছিলেন। তিনিও পূর্ণচন্দ্রকে পূর্ব্বে দেখেন নাই। তবু তাহার

হাব ভাব ও যোগ্যতা দেখিয়া সন্দেহ হইল। কেদার বলিলেন, বাদল, আমার মনে হয়, এই ঢাকার পূর্ণ ঘোষ। বাদল বলিলেন, "আপনি পূর্ণ ঘোষ?" পূর্ণ হাসিয়া দিল। বাদল তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। সকলে পরম হাস্য কৌতুক ভরে জয় জয় জগদ্বন্ধু বলিতে লাগিলেন।

"পুণ্ণ রে বাপ নাহি তাপ"

বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ী প্রভু যে গৃহখানিতে আছেন তাহা অতি সাধারণ। আষাঢ় মাসে বর্ষার দরুণ তাহা অত্যন্ত সেতসেতে হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রভু পরমানন্দে বিরাজ করিতেছেন।

ঐরূপ ঘরে প্রভু থাকেন দেখিয়া পূর্ণচন্দ্রের মনে বড় দুঃখ হইয়াছিল। যাহাকে তাহারা পরম যত্নে কত পবিত্র ভাবে সেবাযত্ন করিয়াও রাখিতে পারেন না, তিনি এইভাবে কেন আছেন এই প্রশ্ন পূর্ণের মনে জাগিয়া উঠিল। পূর্ণ গোলাপ, এসেন্স আনাইয়া সাত কলসী জলে গোলাপী গন্ধ করিয়া তাহা দ্বারা প্রভুর অভিষেক করিলেন। সমস্ত ঘর সেই গোলাপ জল ও গোবর দিয়া মার্জ্জন করিয়া দিলেন—প্রভু পূর্ণকে অপর একখানা কাগজে লিখিয়া দিলেন,—

"পুণ্ণরে বাপ নাহি তাপ
পুত্রভার মাতৃ স্নেহ।
ইলিসের গন্ধে রৌরব মরে॥"

পূর্ণচন্দ্র বুঝিলেন যে, বাদলের পিতৃ-বাৎসল্য ও বাদল গৃহিণীর মাতৃ-বাৎসল্য এতই মধুর যে, উহা আস্বাদনের লালসায় বন্ধুহরি সকল প্রকার উদ্বেগ অসুবিধাই উপেক্ষা করিতে পারেন। তিনি একমাত্র ভক্তিবশ, আর কিছুরই নহেন।

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"

ভক্তাধীনত্বই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য !

শ্রীশ্রীমহাগ্রন্থ হরিকথা

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দর ঢাকা রামধন শাহ মহাশয়ের বাগানে অবস্থান করিতেছেন। বাংলা ১৩০৬ সাল, পৌষ মাস। একদিন শ্রীমান রমেশচন্দ্রের নিকট দুইখানি খাতার প্রয়োজন জানাইলেন। রমেশচন্দ্র ফুলস্ক্যাপ সাইজের দুইখানি বড় খাতা আনিয়া দিলেন। খাতা লইয়া প্রভু গৃহে বদ্ধ হইলেন। সপ্তাহ কাল আর বাহিরে আসিলেন না। বহির্জ্জগতের সর্ব্ববিষয় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিলেন। কি কার্য্যে কি ভাবে এমন তন্ময় হইয়াছেন, কেহই বুঝিতে পারিল না।

সপ্তাহ অন্তে বাহির হইয়া রমেশচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "এই লও মহাউদ্ধারণ গ্রন্থ শ্রীহরিকথা। প্রত্যেকে প্রত্যহ পাঠ করিবে। অবিলম্বে মুদ্রিত করাইয়া আনিবে।" রমেশচন্দ্র গ্রন্থ ও আদেশ শিরোধারণ করিলেন।

প্রথম খাতাখানিতে ১১২ পৃষ্ঠা। দ্বিতীয় খানিতে ১১৩ পৃষ্ঠা হইতে ২৯৭ পৃষ্ঠা। আগাগোড়া লেখা। অন্যূন পঁচিশ ত্রিশটি

লীলা কীর্ত্তন। ব্রজকথা ও গৌরকথার অপূর্ব্ব আস্বাদন। পালার মত সাজান। প্রভাতের বর্ণনা ও খণ্ডিতা নায়িকার ভাবদশার আস্বাদন লইয়া গ্রন্থের আরম্ভন। নিভৃত নিকুঞ্জ ও মিলন বর্ণনায় গ্রন্থ শেষ।

শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীহস্তলিপি

"যমুনা" শীর্ষক কীর্ত্তন গানটির নীচে শ্রীহস্ত লিখিত খাতার ২৭৫ পৃষ্ঠায় (শ্রীহস্তাক্ষরে মুদ্রিত শ্রীশ্রীহরিকথা গ্রন্থের ২২৬ পৃষ্ঠায়) ইংরেজী অক্ষরে শ্রীহস্তের নাম স্বাক্ষর দিয়া, তলে "ঢাকা" লিখিয়াছেন। (তাহা দেখান হইল)

গ্রন্থের মধ্যে কোথাও কাটাকুটি নাই, ভ্রমসংশোধন নাই। একেবারেই অন্তরের আস্বাদন যেন অমৃত প্রবাহিনীর মত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক পদের বামে অঙ্ক দেওয়া আছে। পদের

সঙ্গে কীর্ত্তনের জন্য আঁখর সংযুক্ত আছে। বহু প্রকার সুর ও তালের নাম আছে। বহু বীজমন্ত্র আছে। কোনও অক্ষরে আকার উকার ইকার এমন ভাবে দিয়াছেন যে, উহা উচ্চারণ করা যায় না। বহুপ্রকার চিহ্ন প্রয়োগ করিয়াছেন। অভিধানে পাওয়া যায় না এমন নব নব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই সকল কারণে মাঝে মাঝে গ্রন্থ বিশেষভাবে দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে।

কৃপাদেশ শিরে ধারণ করিয়া রমেশচন্দ্র ঢাকা আদর্শপ্রেস হইতে ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন ১৩০৭ সনে। শ্রীসুরেশচন্দ্র ঐ গ্রন্থ দ্বিতীয় সংস্করণ করেন ১৩২৩ সনে। মহানাম সম্প্রদায় নামক প্রভুবন্ধুর ত্যাগী ভক্তসম্প্রদায় শ্রীগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৩৪১ সনে। সম্প্রতি ১৩৬০ সনে ঐ গ্রন্থের রাজ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণে শ্রীশ্রীপ্রভুর অবিকল শ্রীহস্তাক্ষরে উহা মুদ্রিত হয়। প্রথম খাতাখানি কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছেন, জানা যায় না। দ্বিতীয়খানি ভক্তবর নবদ্বীপ দাসজীর গৃহে এতাবৎকাল সযত্নে পূজিত হইতেছিলেন।

হরিকথা প্রভু বন্ধুসুন্দরের স্বানুভাবানন্দে আস্বাদন বৈচিত্র্য পূর্ণ এক অভিনব মহাগ্রন্থ। গ্রন্থের একটি নিরুপম আলোচনা করিয়াছেন শ্রীবন্ধুগোবিন্দ দাস (পাটনা হাইকোর্টের এড্-ভোকেট শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ এম. এ. বি. এল মহোদয়)। আলোচনাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ও॥ ॥কেদার॥

॥একতালী॥

জয় রাধা-শ্যাম বিশ্ব-উদ্ধারণ-হে॥
জয় নন্দ সখীগণ:- বন্ধু-স্মরণ-হে।

(জয় জয় হে)

(জয় জীব-উদ্ধারণ)

॥প্রভু জগদ্বন্ধু হরি॥

॥ইতি॥

॥প্রভু-সমাপ্তি॥

॥ইতি॥

॥বন্ধু-গীতি॥

॥ইতি॥

॥ইতি॥

॥পৌষ, ১৩০৬॥

শ্রীশ্রীহরিকথা গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠাখানি

শ্রীশ্রীহরিকথা আস্বাদন

"হরিকথা" সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেই সর্ব্বপ্রথম এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়,—"হরিকথা" মোটে বুঝাই যায় না। এ পড়িয়া কি হবে?"—এ প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং প্রভুই দিয়া বলিয়াছেন, "এ মহাউদ্ধারণ গ্রন্থ। অবিরাম পড়িলে রসও পাবে, বুঝিতেও পারিবে। হরিকথা পাঠে তোমরা নির্ম্মল (ছাপ, সাদা,) বরফের মত হ'য়ে যাবে। কৈতব থাক্‌বে না। ভাগবত গ্রন্থের মত, শুচিভাবে পৃথক্ রাখিয়া নিত্য পাঠ করিও। এ গ্রন্থ সময়ে সবাই বুঝিবে, আমিই বুঝাইব; যারা মাহেশ ব্যাকরণ পড়িবে, তারা বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিবে। তোমরা সব মুখস্থ ক'রে রাখ।"

সুতরাং "হরিকথা" পাঠ করিবার প্রয়োজন আছে এ কথা শ্রীশ্রীপ্রভুর বাক্য অনুযায়ী সিদ্ধ হইল। এটি মহাউদ্ধারণ গ্রন্থ, নিত্য পাঠ্য ও নিত্য আলোচ্য এবং সময়ে এ গ্রন্থ শ্রীশ্রীপ্রভুই সকলকে বুঝাইবেন এই আশায় বুক বাঁধিয়া প্রভুকৃপায় যতটুকু রস সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, বৈষ্ণব সাধু ও বান্ধবগণ আমার এ ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। আমার ভরসা আছে, এই অরসিকের কাছে রসের কথা শুনিয়া যদি কোন রসিক ভক্ত প্রাণের অতৃপ্ত লালসা লইয়া হরিকথার রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে অচিরেই রসের সাগরে স্নান করিয়া, লীলামৃতরসধারা পান করিয়া এবং জগতের জীবকে দান করিয়া ভক্তজীবনের চরমসার্থকতা লাভ করিতে পারিবেন।

হরিকথা সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে প্রথমতঃ ইহার নামটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার; তৎপর বস্তুবিষয়ক আলোচনা ও সর্ব্বশেষে উহার ভাষা ও কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। আমি এই ক্রম

ধরিয়াই দু'চারিটি কথা বলিতে চেষ্টা করিব। হরিকথা এই নামটি বুঝিতে হইলে হরিকথার যিনি গ্রন্থকার তাঁহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা আবশ্যক এবং তিনি "হরি" শব্দের যে পরিভাষা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাও জানা দরকার। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর হরিকথার গ্রন্থকর্ত্তা। তাঁহার স্বীয় পরিচয় তিনি শ্রীহস্তে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার একটি নাম "হরি মহাবতারণ।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "হরিনাম শব্দ হরিঠাকুরের নাম নহে। যেমন—পুষ্পবৎ বা পুষ্পবন্ত শব্দে চন্দ্র সূর্য্য বুঝায়, সেই রকম গুরু-গৌরাঙ্গ-গোপী-রাধা-শ্যাম সব মিলিয়া এক হরিনাম। হরিবোল্ বল্‌লে সবই বলা হয়।" পুনশ্চ, "আমি একক সর্ব্বসমষ্টি।" "হরিনাম—প্রভু জগদ্বন্ধু" এ সকলও প্রভু শ্রীমুখে উক্তি করিয়াছেন।

সুতরাং 'হরি' এক সার্ব্বভৌম ও সার্ব্বজনীন নাম, যাহা দ্বারা নিতাই, গৌর গোপী, রাধাশ্যাম, তদ্ধাম ও তৎপরিকর সকলকেই বুঝায়। শ্রীশ্রীপ্রভু যে মহাগ্রন্থে সপরিকর ব্রজলীলা ও গৌরাঙ্গলীলার কথা এবং তত্তৎধামের বর্ণনা করিয়াছেন উহাই হরিকথা। এই গ্রন্থে ব্রজের ও গৌড়মণ্ডলের প্রকটলীলা অতি মধুর। সুধা-সুমধুর পদবিন্যাসে অপূর্ব্ব ছন্দে, অতি মনোরম কবিত্বের দ্বারা প্রভু বর্ণনা করিয়াছেন এবং উক্ত উভয়লীলা বর্ণনা-প্রসঙ্গে একটি ভাবী মহালীলার আভাস দিয়াছেন। সে লীলার নাম মহাউদ্ধারণলীলা। রূপ তাহার মহাসম্মেলন; কাল—মহাপ্রলয়যুগ; দেশ—চারিটী মহাদেশ; পাত্র—প্রতি অণু-পরমাণু। এই মহালীলার ইঙ্গিত করিতে যাইয়া প্রভু হরিকথার বহুস্থলে প্রলয়াগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন ও জীবকে নামাশ্রয় করিতে আদেশ করিয়াছেন। এ সমস্ত বিষয় আমরা হরিকথার বস্তুতত্ত্বালোচনা করিবার সময় নির্দ্দেশ করিব। সুতরাং হরিকথা সাধারণ পদাবলীর মত গ্রন্থ নহে, উহার নামের অর্থ উপর্য্যুক্ত

মহাবাণী হইতে গ্রহণ করিয়া ভক্ত পাঠকগণ উহাকে হয় হরিসম্বন্ধীয় কথা অথবা মহাবতারণ হরি শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের কথা, ইহার যে কোনও অর্থে গ্রহণ করুন না কেন তাহাতেই হরিকথার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এখন হরিকথার বস্তুতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর এই মহাগ্রন্থে "ব্রজলীলা" ও "গৌরলীলা" এই উভয়লীলারই কিছু গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা প্রভুর আবির্ভাবের পুর্ব্বে জগতে প্রচারিত হয় নাই। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর যে "হরি মহাবতারণ" লীলাগহনের এই গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার তাহার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিশেষ করিয়া "দশমী" তত্ত্ব ও মহাভাবের দশানির্দ্দেশ, দশমী লীলায় চন্দ্রা উদ্ধার, দশমীর গুরুকরণ, দশমীরহস্য গৌরলীলায় প্রকটন বা "প্রকটরহস্য" এই কয়েকটি বিষয় ও কলির পরমায়ু হ্রাস সম্বন্ধে আমরা হরিকথায় শ্রীশ্রীপ্রভুর যে বাণী পাইয়াছি, তাহাতে যে নবীন বার্ত্তা পাওয়া যায় উহা বৈষ্ণব মাত্রেরই বিশেষ ভাবে আলোচনা ও প্রণিধান করা প্রয়োজন। আমরা 'দশমী' হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে এই রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

লীলারসিক ব্যক্তিমাত্রই জানেন শ্রীমতীর মহাভাবের দশম দশা ঘটিত। এই দশম দশার নাম 'মৃতি' বা "মৃত্যু"। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীল শ্রীযুত রূপগোস্বামীপাদ এই দশাকে ব্যভিচারীভাবেও পরিগণনা করিয়াছেন, কিন্তু তথায় উহা দশমদশা বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। ইহা দশম দশা বলিয়া উক্ত হইয়াছে বিপ্রলম্ভরসের দশাবিশেষে। প্রথমতঃ পুর্ব্বরাগের দশম দশা "মৃত্যু" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ প্রবাসের বা ভুতবিরহের অবস্থা বিশেষে দশম দশা 'মৃত্যু' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুর্ব্বরাগের দশম দশাকে উজ্জ্বলনীলমণিকার "মরণোদ্যমঃ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন

এবং প্রবাসের দশম দশাতে নাসাগ্রে তুলা ধরিয়া শ্বাস পরীক্ষা করা হইতেছে, ঈদৃশী দশা বর্ণনা করা হইয়াছে, এ সব প্রকটলীলার কথা।

কিন্তু দশম দশায় যদি স্থধু মরণোদ্যমই বর্ণনা করা যায় তবে উহাকে নবমদশা যে "মোহ" তাহা হইতে বিলক্ষণ করিয়া দেখান যায় না; কেন না মোহ দশায়ও সংজ্ঞাহীন অবস্থা ও শ্বাস লোপ ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। বিশেষতঃ "দশমী" বলিয়া যে দশা, তাহাকে 'মৃত্যু' না বলিলে কৃষ্ণপ্রেমের যে অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য এবং কৃষ্ণবিরহের যে তীব্রতা এবং যে প্রেমে "বিয়োগ হইলে কভু না জীয়য়" ঈদৃশী প্রসিদ্ধি ও সিদ্ধান্ত মহাজনগণ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার কোন নিদর্শন থাকে না। বিশেষতঃ প্রকটলীলায় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে পুনরাগমন দেখা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৭৮ অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকে দন্তবক্র বধের পর স্থধু পুরীগমনই দেখা যায় এবং দন্তবক্র বধ দ্বারকাপুরীর দ্বারদেশে সংঘটিত হইয়াছিল ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায়। তদন্তে শ্রীকৃষ্ণেয় ব্রজে পুনরাগমনের কোন প্রসঙ্গই শ্রীমদ্ভাগবতে নাই। সেখানে পরিষ্কার পাওয়া যায়।—

"উপগীয়মানবিজয়ঃ কুসুমৈরভিবর্ষিতঃ।
বৃতশ্চ বৃষ্ণিপ্রবরৈর্বিবেশালঙ্কৃতাং পুরীম॥" ৫

…"বৃষ্ণিপ্রধানদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, বিজয়াভিনন্দনে অভিনন্দিত হইয়া, বর্ষিত কুসুমরাশির দ্বারা শোভিত হইয়া সালঙ্কৃতা পুরীতে প্রবেশ করিলেন"

এখন এই ভাগবতীয় বাক্যের সঙ্গে পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডের কাহিনীর সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেননা তথায় দুই মাস কাল অবস্থান করিয়া ৪৪ বৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত বিহার করিয়া পুনরায় পুরীতে (দ্বারকা) প্রত্যাগমন করেন বলিয়া লিখিত আছে। এই পাদ্মোত্তরখণ্ডের বিরোধ সমাধানের জন্য

গোস্বামিপাদগণ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তনের শপথবাক্য সংগ্রহ করিয়া এই সমাধান করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সুতরাং তিনি সত্যব্রতী ও সত্যসন্ধ সুতরাং তাঁহার শপথ মিথ্যা হইতে পারে না। অতএব যদিও কোন কারণে মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের ব্রজে পুনরাগমন বর্ণনা না-ও করিয়া থাকেন তথাপি তাঁহার শপথবাক্যের অবিতথতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া পাদ্মোত্তর খণ্ডের বাক্যকে প্রামাণিক রূপে গ্রহণ করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হইবে। কিন্তু যে নাগর-কৃষ্ণ শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রেয়সীগণের নিকট মিথ্যা শপথ করিয়া "বিপ্রলব্ধা" "খণ্ডিতা" ও "মানবলীলা"র অভিনয় ঘটাইতে তিনি যে "লীলাবৈচিত্র্যের" জন্য, একটা ভাবী মহালীলার জন্য এবং শ্রীদামের অভিশাপ পূরণের জন্য, সেই বৃন্দাবনেরই প্রেয়সীগণের নিকট তদ্রূপ বৃথা শপথ করিতে পারেন না, তাহাও জোর করিয়া বলা চলে না। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে "শ্রীমদ্ভাগবতম্ প্রমাণমমলং।"—"মধ্যস্থ শ্রীভাগবতপুরাণ "(শ্রীঠাকুর নরোত্তম) সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতে যে প্রসঙ্গ নাই তাহা পুরাণান্তর আশ্রয় করিয়া মানিবার কোন নিত্যবিধি নাই। এইজন্য চণ্ডীদাসের মত প্রাচীন মহাজনও "মাথুরের" পরে "ভাব-সম্মিলনে"ই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলাও এই সাক্ষ্য দিতেছে যে, শূন্য বৃন্দাবনে বিরহিণী গোপীকুল নিরন্তর কাঁদিয়াই আকুল এবং সেই অবস্থায় অধিরূঢ় মহাভাবের বিপ্রলম্ভ দশা সমস্তই গৌরসুন্দর আস্বাদন করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবসমাজে 'মাথুর' বা 'প্রবাসের' পর শ্রীকৃষ্ণের "ভাবসম্মিলন" কথাটা একেবারে নূতন কথাও নয় এবং লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরও হরিকথায় এই দশমদশার পরে "দশমী"কে স্বীকার করিয়া গৌরলীলার এক নূতন তথ্য বৈষ্ণব জগতের সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন; সেটী এই যে, শ্রীমতী সখীগণসহ

দশমীতে মহাবিরহের দশায় নিত্যধামে প্রয়াণ করেন এবং ভাবী গৌরলীলার বীজ দশমীতেই উপ্ত হয়। কথাটি পরিষ্কার করিয়া বলা ও বুঝা দরকার। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলিতেছেন, শ্রীমতীর মহাবিরহের দশমদশার কথা।

"সখী-অঙ্কে হিমবপু রসনা অবশ।
পাণিতল ধরাতলে, শেষ দশাদশ॥"

"বরজগৌরব-রবি গেল অস্তাচলে।
প্রাণপ্যারী হেরি-বন্ধু, ভাসে অশ্রুজলে"

"ভালে উঠিয়াছে আঁখি, উড়ে গেছে প্রাণপাখী
শূন্য ক'রে ও দেহ পিঞ্জর ;
দশেন্দ্রিয় ছেড়ে গেল, নবদ্বার বন্ধ এ'ল,
শব প্রায় প'ড়ে কলেবর।"

"বৃন্দাবনচন্দ্রমসী পশ্চিম-অচলে।
দ্বাপরের উদ্ধারণ-শেষ বন্ধু বলে॥"

এই দশমদশার প্রৌঢ়াবস্থায় শ্রীমতীর তিরোভাব বর্ণনাকে প্রভু "দশমী" আখ্যা দিয়াছেন। দশমী বর্ণনার পুর্ব্বে যে 'বিরহ' বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেই এই দশমীর আভাস দিতেছেন। দশমীর পুর্ব্বে যে 'বিরহ' তাহার ভাব এই যে শ্রীমতী স্বীয় অন্তিমদশা উপলব্ধি করিয়া সখীগণকে গোপীমন্ত্রে দীক্ষা দিতেছেন। এই মহামন্ত্র জগতে প্রচার করিবার জন্য নাম বিমুখ,—'তাপিনী' চন্দ্রাবলীকে প্রেমের স্বরূপ দেখাইয়া তদীয় সখী শৈব্যার নিকট চন্দ্রার জন্য হরিনাম মহামন্ত্র পাঠাইয়া দিতেছেন। চন্দ্রার নেতৃত্বে সখীগণ যেন সংকীর্ত্তন প্রচাররূপ গুরুদক্ষিণা দান করিয়া শ্রীমতীর "উদ্ধারণলীলা" পূর্ণ করেন, সখীদের নিকট এই যাচ্ঞা করিতেছেন। শ্রীমতী তাঁহার সর্ব্বস্বধন অমূল্যনিধি গোপীমন্ত্র সখীদিগকে ও সাধের নীলমণি পর্য্যন্ত হাসিমুখে

শৈব্যা ও চন্দ্রাকে দান করিয়া সখীগণকে তুলসীমঞ্জরী ও তুলসী পত্রে রাই-অঙ্গ সুশোভিত করিয়া গোপীচন্দনে কৃষ্ণনাম লিখিয়া দিয়া প্রাণবধুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীমতি 'দশমী' দশাশ্রয় করিতে উদ্যতা হইলেন, এমন সময় চন্দ্রাবলী নাম গ্রহণে ভাবান্তরপ্রাপ্ত হইয়া মহাভাবময়ী রাধিকার প্রেমের গাঢ়তা ও তীব্রতা দর্শন করতঃ স্বীয় প্রেমের ন্যূনতা উপলব্ধি করিয়া ও নামদানে শ্রীমতীর যে ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব তাহা ভাবিয়া মুগ্ধ হইয়া, শ্রীমতীকে দর্শন করিতে আসিয়া, শ্রীমতীকে গুরুবুদ্ধি করতঃ তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন। শ্রীমতী তখন চন্দ্রাবলীকে সংকীর্ত্তন প্রচাররূপ গুরুদক্ষিণা দেওয়ার যে আদেশ করিয়াছিলেন তাহা শিরোধার্য্য করিয়া তাপদানরূপ স্বীয় অপরাধের জন্য শ্রীমতীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী চন্দ্রাকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন এবং তাঁহার অন্যান্য গোপীগণের শিরে সংকীর্ত্তন প্রচার দ্বারা জগদুদ্ধারের ভার সমর্পণ করিলেন। প্রভু বলিলেন,—

"দশমী কারণ, চন্দ্রা উদ্ধার।
বন্ধু ভয় নাই ;-; হ'বে আবার।

ইহার পরেই 'দশমী' বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে, শ্রীমতীর—

"খঞ্জন নয়ন, ক্ষোভনিমীলন,
ঘন কম্পন অঙ্গ,
সুধাংশু-বদন, কালিমাগ্রহণ,
ভাব অমিয় ভঙ্গ।
পাণি পদতল, শুভ্রশ্বেত হ'ল,
তনু শতদল-ক্ষীণ,
কটাক্ষ করুণ, আদর-তরুণ.
মহানিশাম্বরে লীন॥

সোণার প্রতিমা খাইল নীলিমা,
শ্রীরাধিকা শব হায় ;
হায়রে ললিতা, কাল কবলিতা,
কুন্দলতা, মৃতাপ্রায়।
হা হা বীরা হা হা, ব'লেছিলি যাহা,
পৌর্ণমাসী সনে গেলা।
হা প্রেমমঞ্জরী, তুঙ্গবিদ্যাধরি,
বৃন্দা-কুন্দে হা হা, এ'লা ॥

"বরজ ঐশ্বর্য্য রাই শয়নে র'ল।
বন্ধুবাণী ভক্তগণ, শ্রীরাধে বল ॥

এই মহাশয়নেই দ্বাপরের লীলার পরিসমাপ্তি। ইহাই প্রভু জগদ্বন্ধু-সুন্দরের মতে দশমী দশা। এ দশার প্রয়োজন ভাবী লীলার চরিত্রসৃষ্টি ও উপকরণসংগ্রহ ; কেন না জগদ্বন্ধুর মতে শুধু শ্রীমতী নহেন, সখীগণসহ শ্রীমতী রাধিকা নিত্যধামে প্রয়াণ করেন এবং গৌরলীলায় এই 'দশমীর' তাপ মিটাইবার জন্য শ্রেষ্ঠা গোপীগণ সকলেই 'পঞ্চতত্ত্বের' ভিতরে থাকিয়া নাম প্রেম প্রচারে ও স্বরূপ রস আস্বাদনে মত্ত হন। প্রভুর মতে "হরিনামই রাই ঋণ", সুতরাং মহাবিরহাবস্থায় যে 'হরিনাম' অহর্নিশ জপ করিয়া ও দশমীতে প্রচার করিয়া 'রাই' শ্যামকে ঋণী করিয়াছিলেন, শ্যামচাঁদ সেই ঋণ শোধ করিবার জন্যই সমস্ত গোপীগণের সঙ্গে জগন্ময় হরিনাম করিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং পঞ্চতত্ত্বের ভিতর যে যে গোপী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তদতিরিক্ত মহাপ্রভুর সকল পার্ষদ ও পরিকরের ভিতরেই "মানসরূপক" রূপে ব্রজসুন্দরীগণ আবির্ভূতা হইয়া 'দশমী'র দায় উদ্ধার করিয়াছেন। প্রভু জগদ্বন্ধু হরিকথার 'প্রকটরহস্যে' এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ নূতন এবং এক রহস্য বটে এবং

প্রভু জগদ্বন্ধু যে "হরি মহাবতারণ" এ সম্বন্ধে এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ।
প্রকট রহস্যে প্রভু দেখাইয়াছেন যে,—

"শৈব্যা চন্দ্রাবলী লক্ষ্মী মঞ্জু সরস্বতী।
প্রভু নিত্যানন্দচন্দ্র দশমী ভকতী॥
(নামে মত্ত হ'লরে) (প্যারীর দশমী ল'য়ে)

অর্থাৎ 'দশমী'তে শ্রীমতীর নিকট হরিনাম মহামন্ত্রলাভ করতঃ, গৌরলীলায় 'দশমীর' গুরুদক্ষিণা দান করিবার জন্য, চন্দ্রাবলী 'উদ্ধারণে দায়ী' হইয়া সংকীর্ত্তন প্রচারণে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, দশমীর ভকতি-রূপা চন্দ্রাবলী, শৈব্যা, লক্ষ্মী মঞ্জু ও সরস্বতী এই চারি গোপীকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চতত্ত্বে এক তত্ত্ব হইয়া দয়াল নিতাইরূপে কলির জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য জগতে প্রকট হইয়াছিলেন। এই প্রকার বিরহ প্রতাপে মহাযোগে একত্র হইয়া রাধা, শ্যাম, বীরা (বৃন্দা), কুন্দলতা ও ললিতা—"একে পঞ্চ—দশমী সন্তাপে" হইয়া মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রঙ্গঃরাণী, বনদেবী, প্রেমমঞ্জরী পৌর্ণমাসী ও বিশাখা এই পঞ্চতত্ত্ব সম্মিলনে শ্রীশ্রীপ্রভু অদ্বৈত। যমুনা, মুরলী, ধরা, মাধবী ও মালতী এই পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া "শ্রীপ্রভু শ্রীবাসচন্দ্র।" শ্যামা-সখী, তুঙ্গবিদ্যা, শ্রীরূপমঞ্জরী, শারি, কেকী—এই পঞ্চ সম্মিলনে শ্রীগদাধর পণ্ডিত।

প্রভু হরিকথায় শুধু 'দশমী'র কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আরও দুইটি কথা বলিয়াছেন যাহা আমরা প্রভুর উক্তির পূর্ব্বে জানিতাম না। সে দুইটির একটি কথা "অবশ দ্বাদশভাব" আর একটি "ত্রয়োদশ দশা।" তন্মধ্যে প্রথমটি প্রভু "কল্যাণকুণ্ডে মিলন বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিতেছেন,—

"অবশ দ্বাদশভাব", "প্রভুবলে, লো বিলা'ব",
"শ্রীললিতা" "অচৈতন্যা প্রায়॥"

এই যে 'অবশ দ্বাদশ ভাব'—ইহা স্থদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের চরম পরিণতি দ্বাদশ দশারূপে মহাভাব-রসরাজরূপী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে প্রকট হইয়াছিল। কেন না এই কল্যাণকুণ্ড লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রভু স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—

"এই অবতার শেষ, "দশমী" অদূরে।"

তারপর, "নেপথ্যে মৃদঙ্গ বাজে, নাম সংকীর্ত্তন।
বন্ধু বা! বা। এই কিবা কলি-উদ্ধারণ॥"

স্থতরাং "অবশ দ্বাদশ ভাবের" দ্বারা স্থদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের বিকারময় দ্বাদশ দশাকেই কেবল লক্ষ্য করা হইতেছে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। এখন এই দ্বাদশ দশা কি, তদুত্তরে প্রভু ভক্ত সকাশে বলিয়াছেন ব্রজলীলায় দশমীতে লীলা শেষ হয়; তৎপরে গৌরলীলায় মহাভাবের আরও দুইটি দশা অধিক হয়, তাহার একটি "অস্থি-সন্ধি-বিচ্যুতি", আর একটি "কুর্ম্মাকৃতি।" মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলায় এই দুইটি দশা হইত এবং যদিও উহাতে নবমী দশার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না, তথাপি উহাকে এযাবতকাল নবমী দশার অন্তর্দ্দশা বলা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রভু জগদ্বন্ধু আসিয়া বলিলেন, এই দুই দশা ব্রজলীলায় হয় নাই—গৌরলীলায় মহাবিরহের এই দুই দশা বেশী। অবশ্য ব্রজলীলায় শ্রীমতীর এই দশাদ্বয়ের অনুভূতি বা আস্বাদন ছিল কিন্তু উহা প্রকট হয় নাই। তদ্রূপ গৌরলীলায় উক্ত দ্বাদশ দশার অতিরিক্ত আর একটি দশা বা 'ত্রয়োদশ' দশার আস্বাদন ছিল বটে কিন্তু জগতে উক্ত দ্বাদশ দশা পর্য্যন্ত প্রকট হইয়াছিল, ত্রয়োদশ দশা প্রকট হয় নাই। উহা প্রলয় যুগে বা উপসংহার যুগে, উপসংহার বা মহাসমন্বয় লীলায় প্রকটীকৃত হইবে। এই ত্রয়োদশ দশার কথাও প্রভু হরিকথায় সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

সুরধুনী তটে স্থিতি, সদাসংকীর্ত্তন প্রীতি,
ত্রয়োদশ দশা আস্বাদনে ॥
(প্রভু এই করে গো) (জাহ্নবীর তীরে তীরে)

"মহাবতারণ হরি" এবার মহাসম্মেলন লীলায় স্বয়ং এই ত্রয়োদশ দশা আস্বাদন করিয়া উহা জীবজগতে প্রকট করিতেছেন। উহার লক্ষণ পূর্ণতন্ময়ত্ব ও ঐশ্বর্য্যলেশবিহীন শুদ্ধ মাধুর্য্য।

হরিকথায় লীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া প্রভু দুইটি বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমতঃ ব্রজলীলার যেখানেই মিলন বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ধামের অপ্রাকৃতত্ব ও চিন্ময়ত্ব সার্থক ও ভাবগর্ভ দুই চারিটি পদের দ্বারা বর্ণনা করিয়া, দ্বিতীয়তঃ সেখানে যে প্রাকৃত মদনের অধিকার নাই, এইটি বিশেষরূপে পাঠক ও শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণকুহরে ধ্বনিত করিয়া দিতেছেন। হরিকথার নানাস্থানে প্রভু অতি মনোরম ভাবে শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন ভাব ও তাঁহার জগন্মোহন লীলাটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রভু উপধর্ম্মের কবল হইতে প্রেম ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য ধরায় প্রকট হইয়া প্রেমলীলার প্রকৃত স্বরূপ অন্যভাবে প্রাকৃতভাব বর্জ্জিত করিয়া বুঝান অসম্ভব দেখিয়া, কাম-কলুষিত চিত্ত জীবকে বলিয়াছেন— "রাধাকৃষ্ণ সহোদর সহোদরা", প্রভু অন্যত্র বলিয়াছেন—"ছয় বৎসর বয়সে শ্যাম রাস করেন, শ্রীমতীর বয়স তখন আট বৎসর, উভয়েই অস্ফুট ও অক্ষত। তবে কন্দর্প কোথা ?" কাজেই যখনই প্রভু যুগলমিলন-মাধুরী জীবকে পান করাইতে চাহিতেছেন, তখনই বলিতেছেন—সাবধান ! সাধু অবধান !! "পয়োধর উপস্থ কটাক্ষ ইত্যাদি মায়িক জীবের কল্পনা মাত্র"—রাধাগোবিন্দলীলায় কামকলুষিত নয়নে ওসব কামসাধন কল্পনায়ও যেন মনে স্থান দিও না, কেন না, সে রাজ্যে কামের কোন অধিকার নাই। তথায় "কুসুমেষু ভূঃপতন", "কুসুমেষু কোপীপলায়ন"

(খণ্ডিতা) "দর্পকে সম্বরে। কামে সামালেরে, কোকিলা সপ্তমে গেয়ে" (বিপ্রলব্ধা) "নিশিথিনী অনীকিনী অনঙ্গ সম্বরে" (কুঞ্জভঙ্গ) "মার শূন্যতূণে" (কৃষ্ণরূপ) "মদনে দমে রে" (কৃষ্ণরূপ) ইত্যাদি।

ধামের চিন্ময়ত্ব ও অপ্রাকৃত ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই প্রভু বর্ণনা করিয়াছেন এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনে যে স্থাবর, জঙ্গম পর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবা ও রাই পূজা করিতে সর্ব্বদা তৎপর তাহা অতি মধুর কবিত্বসহকারে প্রভু বর্ণনা করিয়াছেন,

"মালতিকা মাধবিকা মঞ্জিষ্ঠা উচ্ছ্বাস।
কোরকপ্রসূন ফলে প্রণতি বিলাস॥
(প্রেমে ঢর ঢর রে) (সবে কৃষ্ণ পূজা করে)

"পরিবারে কাতরে কালিন্দী প্রণাম।"
গভীর কল্লোলে ধ্বনী কৃষ্ণগুণ গায়।
কল কল ক্ষেমরোলে তরঙ্গ বাজায়॥
(প্রেমে বাজাইছে গো) (রস রঙ্গে তরঙ্গে)

কমল কুমুদে পুজে রাজীব চরণ।
ঢর ঢর ঝর ঝর বীচ্যশ্রুপতন॥
(ঝর ঝর ঝরে রে) (ভাবঅশ্রু অবিরল)"

"তুলসী মঞ্জরী পত্র পড়ে কৃষ্ণ পায়।
ভদ্রশ্রী অগম ঘাম সেবাবেশে যায়।
(চন্দন ঘামেরে) (কৃষ্ণ পাদপদ্ম পূজায়)"

চন্দন কাষ্ঠ সেও আজ কৃষ্ণপাদপদ্ম পূজা করিবে বলিয়া সেবাবেশে সাত্ত্বিকভাব প্রণোদিত হইয়া ঘামিয়া ঘামিয়া চুয়াইয়া চুয়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে ঝরিয়া পড়িতেছে। মরি! মরি! কি অপূর্ব্ব ভাব! কি মাধুর্য্য পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য্য! কি মনোহর কবিত্ব! এই সকল পদ এত

মধুর এবং শুষ্ককাষ্ঠরূপী চন্দনের দ্রব হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে চুয়াইয়া পড়া এ সব ভাব এত মৌলিক যে, বৈষ্ণব-পদসাহিত্যে ইহার তুলনা নাই।

এই তো গেল প্রভুর ব্রজলীলা বর্ণনা। গৌরলীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া প্রভু এমন একটি উদ্ধারণ ভাবের বিস্তার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গৌরলীলার কোনও মহাজন তেমন জীবন্ত ভাবে সে চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। গৌররূপ বর্ণনায় যে অদ্ভুত কবিত্ব ও অপরূপ শব্দচিত্র প্রভু অঙ্কন করিয়াছেন, সাহিত্যের দিক দিয়া তাহার দিঙ্‌ নির্দ্দেশ আমরা পরে করিব—কিন্তু গৌরলীলায় কি প্রকারে জগন্ময়, "অবনী অম্বর ভেদিয়া" শূন্য হইতে মহাশূন্যে, এক ভুবন হইতে চৌদ্দ ভুবনে নামের ঝঙ্কার চলিয়া যাইতেছে ও উদ্ধারণ সাধিত হইতেছে প্রভু তাহা অপূর্ব্বভাবে গৌরলীলার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে সকল স্থান হইতে পদ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না—তবে দু' একটি স্থলের মাধুর্য্য আস্বাদন না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যথা—

"নগর-তোরণ বনপথ প্রান্তর।
হরিনাম অবিশ্রাম গঙ্গা অম্বর॥
(মঙ্গল মঙ্গল রে) (হরিনাম প্রচারণ)
(কৈতব পলায়ন)"
"কাশ্যপী কম্পিল রে, বন্যা বাদর।"

"উদ্ধারণ" বা 'গৌরলীলাসিদ্ধির' বর্ণনা করিতে যাইয়া প্রভু যেন দেখিতেছেন, যথা—

"করতাল তালে, মাদল রসালে,
প্রচারণ সংকীর্ত্তন।
প্রচণ্ড তাণ্ডব, খণ্ডন কৈতব,
কলি ঘোর উদ্ধারণ॥

মহাবন্যা ধায়, মহাম্বর ছায়,
কলমষ পলায়ন।
ঘন হরিনাম, আবেশ বিরাম,
হরেকৃষ্ণ উচ্চারণ ॥"
"আবাল শিশুকৈশোর, প্রৌঢ় যুবা বৃদ্ধভোর,
শ্বাপদ তির্য্যক মীন গায় ॥
(জয় জয় বলরে) (সবে হরিনাম নিল)"

"অবনী অম্বর ভরি, হরেকৃষ্ণ নাম।
মঙ্গল মহোৎসব, ভাব অবিরাম ॥"

এখন এই যে হরিনাম ইহার বিশেষ সার্থকতা কি? হরিনামে পাপ তাপ খণ্ডন হয়, জীবের স্বরূপ জাগিয়া উঠে, কৈতব দূর হয়, লীলা-স্ফুরণ হয়, উদ্ধারণ হয় (স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গের উদ্ধার হয়), এসব কথা আমরা জানিতাম কিন্তু প্রভু আসিয়া হরিনামের আর এক ফল নির্দ্দেশ করিলেন, সেটি হইতেছে এই যে, হরিনামে প্রলয়দমন হয়। প্রভু দেখিতেছেন যে মহাপ্রলয় অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, জগতে প্রলয়ের তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হইয়াছে, এই প্রলয়নৃত্যে জগতের সমস্ত ধ্বংসের শক্তি যোগদান করিয়াছে, মহামারী, ঝঞ্ঝা, ভুমিকম্প যুদ্ধবিগ্রহ, বন্যা, অগ্ন্যুৎপাৎ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার প্রলয়কাণ্ড পৃথিবীকে পীড়ন করিতেছে, ইহা ক্রমেই বহুব্যাপক হইয়া সৃষ্টিবিনাশ করিতে উদ্যত হইবে। অচিরে মহাপ্রলয় আসিয়া উপস্থিত হইবে। হে কলির জীব! যদি প্রলয় হইতে ত্রাণ পাইতে চাও তবে সময় থাকিতে হরিনাম কর, এই হরিনামই প্রলয় হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়, হরিনাম ব্যতীত প্রলয়ের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। এই যে প্রলয়াগমন এ সম্বন্ধে প্রভুর বহু উক্তি হরিকথার নানা পালার ভিতর দিয়া পাওয়া যায়। এমন কি নিভৃত নিকুঞ্জে যখন

প্রভু যুগলমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন, তখনও প্রভু জীবের প্রলয়াক্রমণ দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিতেছেন,—

"শুভক্ষণে, মিলন ,—মাধবী তলায় ॥ ও ॥
বন্ধু অধীন নতি ;—ধরম, অমায় ॥ ও ॥
(এবে রা'খহে) (প্রলয়ে, অতলে, যায়)"

এই যে প্রলয়াগমনবার্ত্তা, ইহাই "হরি মহাবতারণের" তৃতীয় বার্ত্তা। যাহা আমরা সর্ব্বপ্রথম প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখাৎই অবগত হই। অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন এখন তো প্রলয় আসিতে পারে না, কেননা সবে মাত্র কলির প্রথম সন্ধ্যা চলিতেছে। কলির পরমায়ু ৬০,০০০ ষাটহাজার বৎসর, তন্মধ্যে মাত্র ৫০০০ পাঁচহাজার বৎসর অতীত হইয়াছে এখন তো প্রলয় হইতে পারে না ? প্রভু জগদ্বন্ধু এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই যেন বলিয়াছেন,—

" (কলি সংখ্যা পূর্ণ বটে) (পঞ্চসহস্র মাহে বটে)
(ঐ মাত্র সংখ্যা বটে) "

প্রভুর মতে কলিসংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে। আমরা এই মনে করি যে মহাপ্রভুর আগমনের দ্বারা কলির আয়ুসংখ্যা প্রভূত পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কাজেই কলির জীবন গতপ্রায় এবং মহাপ্রলয় আগতপ্রায় দেখিয়াই প্রভু বলিয়াছেন,—

"হরিনাম ল'ও ভাই, আর অন্যগতি নাই,
হের' প্রলয় এ'ল প্রায়।
(যদি, সৃষ্টি রাখ ভাই) (হরিনাম প্রচার কর)"

"ভাব" বা আবেশ হও, কীর্ত্তনাবরণে র'ও,
ভবভার প্রলয়-স্বনে ।
(গৌর, রা'খ, প্রভুরে !) (মহাপ্রলয় আ'সে)
(কাঁপে ভব, তরাসে) (প্রলয়াম্বুভয় বাসে)
(রাখ ঐ অবকাশে)"

মহাবন্যা ধায়, মহাম্বর ছায়,
কলমষ পলায়ন।
ঘন হরিনাম, আবেশ বিরাম,
হরেকৃষ্ণ উচ্চারণ ॥"
"আবাল শিশুকৈশোর, প্রৌঢ় যুবা বৃদ্ধভোর,
শ্বাপদ তির্য্যক মীন গায় ॥
(জয় জয় বলরে) (সবে হরিনাম নিল)"

"অবনী অম্বর ভরি, হরেকৃষ্ণ নাম।
মঙ্গল মহোৎসব, ভাব অবিরাম ॥"

এখন এই যে হরিনাম ইহার বিশেষ সার্থকতা কি? হরিনামে পাপ তাপ খণ্ডন হয়, জীবের স্বরূপ জাগিয়া উঠে, কৈতব দূর হয়, লীলা-স্ফুরণ হয়, উদ্ধারণ হয় (স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গের উদ্ধার হয়), এসব কথা আমরা জানিতাম কিন্তু প্রভু আসিয়া হরিনামের আর এক ফল নির্দ্দেশ করিলেন, সেটি হইতেছে এই যে, হরিনামে প্রলয়দমন হয়। প্রভু দেখিতেছেন যে মহাপ্রলয় অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, জগতে প্রলয়ের তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হইয়াছে, এই প্রলয়নৃত্যে জগতের সমস্ত ধ্বংসের শক্তি যোগদান করিয়াছে, মহামারী, ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প যুদ্ধবিগ্রহ, বন্যা, অগ্ন্যুৎপাৎ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার প্রলয়কাণ্ড পৃথিবীকে পীড়ন করিতেছে, ইহা ক্রমেই বহুব্যাপক হইয়া সৃষ্টিবিনাশ করিতে উদ্যত হইবে। অচিরে মহাপ্রলয় আসিয়া উপস্থিত হইবে। হে কলির জীব! যদি প্রলয় হইতে ত্রাণ পাইতে চাও তবে সময় থাকিতে হরিনাম কর, এই হরিনামই প্রলয় হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়, হরিনাম ব্যতীত প্রলয়ের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। এই যে প্রলয়াগমন এ সম্বন্ধে প্রভুর বহু উক্তি হরিকথার নানা পালার ভিতর দিয়া পাওয়া যায়। এমন কি নিভৃত নিকুঞ্জে যখন

প্রভু যুগলমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন, তখনও প্রভু জীবের প্রলয়াক্রমণ দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিতেছেন,—

"শুভক্ষণে; মিলন ,—মাধবী তলায় ॥ ও ॥
বন্ধু অধীন নতি ;—ধরম, অমায় ॥ ও ॥
(এবে রা'খহে) (প্রলয়ে, অতলে, যায়)"

এই যে প্রলয়াগমনবার্ত্তা, ইহাই "হরি মহাবতারণের" তৃতীয় বার্ত্তা ; যাহা আমরা সর্ব্বপ্রথম প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখাৎই অবগত হই। অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন এখন তো প্রলয় আসিতে পারে না, কেননা সবে মাত্র কলির প্রথম সন্ধ্যা চলিতেছে। কলির পরমায়ু ৬০,০০০ ষাটহাজার বৎসর, তন্মধ্যে মাত্র ৫০০০ পাঁচহাজার বৎসর অতীত হইয়াছে এখন তো প্রলয় হইতে পারে না? প্রভু জগদ্বন্ধু এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই যেন বলিয়াছেন,—

" (কলি সংখ্যা পূর্ণ বটে) (পঞ্চসহস্র মাহে বটে)
(ঐ মাত্র সংখ্যা বটে) "

প্রভুর মতে কলিসংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে। আমরা এই মনে করি যে মহাপ্রভুর আগমনের দ্বারা কলির আয়ুসংখ্যা প্রভূত পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কাজেই কলির জীবন গতপ্রায় এবং মহাপ্রলয় আগতপ্রায় দেখিয়াই প্রভু বলিয়াছেন,—

"হরিনাম ল'ও ভাই, আর অন্যগতি নাই,
হের' প্রলয় এ'ল প্রায়।
(যদি, সৃষ্টি রাখ ভাই) (হরিনাম প্রচার কর)"

"ভাব" বা আবেশ হও, কীর্ত্তনাবরণে র'ও,
ভববার প্রলয়-স্বনে ।
(গৌর, রা'খ, প্রভুরে !) (মহাপ্রলয় আ'সে)
(কাঁপে ভব, তরাসে) (প্রলয়াম্বুভয় বাসে)
(রাখ ঐ অবকাশে)"

উক্তরূপ বহুপদ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে যাহাতে প্রভু প্রলয়াগমনের সূচনা দিয়াছেন। ভক্তগণ 'হরিকথা' পাঠ করিলেই উক্ত সব পদ দেখিতে পাইবেন, সুতরাং আর বেশী উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকার কলেবর বৃদ্ধি করা সঙ্গত মনে করি না।

প্রভুর যে বার্ত্তাত্রয়ী তাহার উল্লেখ করিয়া এখন আমরা তাঁহার পদসম্বন্ধে কিঞ্চিদালোচনা করিয়া, আত্মশোধন করিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রভু হরিকথায় ব্রজলীলা, গৌরলীলার কথাই গাহিয়াছেন। তন্মধ্যে লীলাস্মরণের জন্য 'গৌররূপ', 'কৃষ্ণরূপ'ও বর্ণনা করিয়াছেন। সে রূপবর্ণনায় যে একটা নবীনত্ব ও নিগূঢ় মাধুর্য্য রহিয়াছে এবং তাহার যে অলোকসামান্য ও অভূতপূর্ব্ব কবিত্ব ও ভাব রহিয়াছে, তাহা ভক্তপাঠক পড়িবামাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, প্রভুর রূপবর্ণনার বৈশিষ্ট্য পাঠ না করিলে বুঝান দুষ্কর বলিয়া সামান্য কিছু এখানে আলোচনা করিব—

"শ্যামল কালিন্দীজল কালরূপময়।
আলোকে দুকূল ধু'য়ে কুল কুল বয়॥
(সব আলোকিত রে) (তীর সৈকত গগন)
(তরঙ্গ পুলিন বন)"

"শত কাদম্বিনী জিনি, রূপাপরূপ রে।
শত পত্রে, সমাসীন, শ্রীরসভূপ রে॥
(কত দোলনে মা) (অন্য মনে ভাবে রে)"

"বৃন্দাবনে, বিভূষণে, ধুনীতীরে, হরি।
বেণুরব, "সুরসব" মহাম্বর ভরি॥
(সব ভ'রে গেল রে) (প্রাবৃট্ ধারার মত)"

"প্রদোষ কৃষ্ণচন্দ্র, কদম্বশাখায়।
ছায়ামায়, মিশায়,—সম যমুনায়॥

(কালছায়া, প'ড়েছে মা !) (শীতল যমুনা-জলে)
(মিশে ! না ! মা ! ঢল ! ঢলে !) (কেলিকিলা, খল-খলে !)
(পিক-পঞ্চম-বিহ্বলে)"

উপরে যে কয়টি পদ উদ্ধৃত করা হইল ইহার সবটিতে এক একটি ধ্যানের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে একটা অনন্তের ভাব, একটা রূপের প্লাবন, ভুবনবিজয়ী রূপের উল্লাস এবং সে রূপ যে জগতের সব রূপকে ম্লান করিয়া ফেলিতে পারে তাহার ইঙ্গিত ছত্রে ছত্রে পদে পদে ফুটিয়া উঠিতেছে। পদের একটা মাদকতা, ছন্দের একটা হিন্দোল, বর্ণনার একটা সৌকুমার্য্য, সর্ব্বোপুরি সুরের ঝঙ্কার এই রূপের পদগুলিকে একটা এমন অনির্ব্বচনীয়তা দান করিয়াছে, যাহার তুলনা জগতে নাই। প্রত্যক্ষ-দর্শী ছাড়া কেহ বুঝি এমন পদ রচনা করিতেই পারে না।

কৃষ্ণরূপের বর্ণনায় যে বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়, প্রভুর গৌররূপের বর্ণনায় তদপেক্ষা অধিক বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। গৌররূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রভু একসঙ্গে গৌরের নাগরভাব, আচার্য্যভাব ও ভগবদ্ভাব অতি চমৎকার পদপ্রয়োগে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, সর্ব্বত্রই গৌরাঙ্গ রসরাজের ধ্যানের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন; গৌররূপের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থারও এমন একটি সুরঙ্গীন চিত্র প্রভু আঁকিয়াছেন যে, উহাতে পাঠক ও শ্রোতা উভয়েরই হৃদয় ভরিয়া যায়, সুর তাল লয়ে গীত হইলে তাহাতে যে কি শক্তি খেলে তাহা ভক্তগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। গৌররূপের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা উদ্ধারণ ভাবও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, আর কোনও মহাজনের রচনায় তাহা পাওয়া যায় না। ভক্তগণ হরিকথায় 'গৌররূপ' সব কয়টি পড়িলেই এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন। আমি শুধু কয়েকটি পদ এখানে উল্লেখ করিতেছি।—

"অগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গরায়, মঞ্জির বাজিছে পায়,
ঠমকে ঠমকে চলি যায়।
(হেলে দু'লে যায় রে) (ললিত মধুর ঠারে)
(প্রিয়অঙ্গ, অঙ্গীকারে)

নবোদিত ভানুসম, মুখ পদ্ম নিরুপম,
বিধু, পদ-নখর, আভায়॥
(বিধু পদে রয় বা) (পদ-মকরন্দ লোভে)
(বাস ত্যজি পদে শোভে)"

"কর্ণ রদ সুললিত, সর্ব্বঅঙ্গ সুগঠিত,
চারুমুখে হরিনাম গায়।
(হরিনাম গায় মা) (দুইবাহু উর্দ্ধ ক'রে)
(যেন কোকিলা কুহরে)"

"অরুণ ঈক্ষণে সখী, মোরে দেখিল নিরখি,
সে চাহনি সদা জাগে মনে।
(পাশরিতে ও নারি মা) (মানস ধসিয়া র'ল)
(নৈরাশ্যই, সার হ'ল)"

"ত্রিঅংশ অধিক তিন, মৃগদেহ সুনবীন,
তপ্তরুক্ম-সুধানিধি কায়॥
(বর্ণ তিন মা গো) (হেম-নিধি-শতপত্র)

"আজানুলম্বিত ভুজ, আরক্তিম মুখাম্বুজ,
তুলসী চন্দন পুষ্প, পায়॥
(বড় সাধনের নিধি রে) (সবে, সদা পুজা করে)
(হে'রে হরিনাম করে) (রূপে, তাপত্রাস হরে)
(দুইকর শুভ্রাম্বরে)"

"স্বর্ণ শৈল সংহনন, মার-মারণ নয়ন,
নখবিংশে, সুধাকর, ভয়॥
(শশী ভয় বাসে মা) (রাকা শশী কে ! বা ! বা !)"

এই প্রকার 'রূপের' যত পদ সকলই যেন এক একটি ছবি। উচ্চারণ মাত্রই হৃদয়ে একটি নয়নাভিরাম প্রাণোন্মাদিনী মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে। 'রূপের' পদের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর 'প্রার্থনা'র পদগুলিও অতি অপূর্ব্ব এবং বৈষ্ণবের প্রার্থনাভাণ্ডারে অতুলনীয়। প্রভুর 'প্রার্থনা' সকলের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে প্রভু নিজের জন্য কিছুই প্রার্থনা করিতেছেন না ! 'অকৈতব' প্রভুর প্রার্থনার সমস্ত পদ কৈতবাবিহীন। প্রভু প্রার্থনা করিতে যাইয়া সমস্ত জীবের উদ্ধারণ কামনায় কাঁদিয়া আকুল। জীব-হিতব্রতী বৈষ্ণবেরই মত বৈষ্ণবের ঠাকুর প্রভু জগদ্বন্ধু বলিতেছেন,—

"কারুণ্যেক্ষণে, হের, "কীটইন্দ্রজাল।
বন্ধু-বাঞ্ছা ; "শুভদৃষ্টি ; প্রভু দয়াল॥
(জীবে দয়া ক'র) (কেবল , ও কীটকুহক "ও" ॥

"মঙ্গল—করতাল—কীর্ত্তন-তাণ্ডব।
বন্ধু—চর্চ্চা ;—চারণ ;—প্রচারণ ; সব॥
(অনন্য গতি রে) (সংকীর্ত্তন-উদ্ধারণ)"

"হে প্রভু ! কি কর। এই উদর উদ্ধার।"
চাহি'য়া চম'কি, গোরা ; "সৃষ্টি বিস্তার॥"
(হরি হরি ব'লে গো) (গৌরহরি-উদ্ধারণে)"

"হা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, মহাউদ্ধারণ।
পতিত নিস্তার কর ; জীব অকিঞ্চন॥

(কোন দোষ নাই হে) (কীট কুহক-জাত)
(কীটগুরু তাপ তাত) (কীট স্বনাম বিখ্যাত)
(জেনে ও, কি ? জাননা ত ! ?)"

"হা ! হা ! প্রভু দয়াময়, হ'ওহে প্রলয়াশ্রয়,
উদ্ধারণ, অতলে যায় ॥
(আর রক্ষা নাই হে) (প্রাণ গৌর বিশ্বম্ভর)
(কাতরে, কটাক্ষ কর) (নিজ উদ্ধারণ ধর)
(জীবগণে, ক্ষমা কর) "

উক্ত প্রকারে সর্ব্বত্রই প্রভুর প্রার্থনা শুধু জীবের জন্য। নিজে কোথাও চাহিয়াছেন তো কেবল 'সেবা'ই চাহিয়াছেন আর কিছুই নহে। 'প্রার্থনার' সঙ্গে সঙ্গে দৈন্যবোধিকাতেও প্রভু জগদ্বন্ধুর বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। তথায় প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর যে বৈষ্ণবেরই ঠাকুর, এ পরিচয় তিনি পরিষ্কার-ভাবে দিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যে 'অসাম্প্রদায়িক' নহেন, তাহা জিজ্ঞাসুমাত্রেই তাহার 'দৈন্যবোধিকা' পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন এবং তিনি যে এক মহাধর্ম্মের বার্ত্তা জগতে ঘোষণা করিয়াছেন, সেটি এই দৈন্যবোধিকায় সূত্ররূপে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। যথা :—

"মনঃপ্রাণে জীবে কর কারুণ্য কল্যাণ।
ক্ষমা দয়া ধর্ম্মদান উদ্ধার বিধান ॥
(উদ্ধারণ ধর রে) (সবে হরিনাম দান)
(এই কল্যাণ বিধান)

শ্রেষ্ঠাচার পরচার হরেকৃষ্ণ মালা।
বন্ধু বলে হেন হ'লে যাবে সব জ্বালা ॥
(সব জুড়াইবে ভাই) (হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ)
(মানস আহ্নিক তপ)"

সর্ব্বশেষে হরিকথায় যে অপ্রাকৃত কবিত্বসুধা বৃষ্টি হইয়াছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ ভক্তগণের নিকট পরিবেশন করিয়া এই আস্বাদনের উপসংহার করিব। প্রভু জগদ্বন্ধুর পদমালা কোন অংশেই কোনও মহাজন পদ হইতে রচনা-সৌকুমার্য্য, ভাবগাম্ভীর্য্য, রসালতা ছন্দো-বৈচিত্র্য, যোগ্যতা ও সার্থকতা গুণে নিকৃষ্ট তো নহেই বরং স্থানে স্থানে হরিকথার পদ্ম সকল এমন ভাবের নন্দনকানন সৃষ্টি করিয়াছে যে, জগতের সাহিত্যে তাহার তুলনা মিলে না, বৈষ্ণব পদাবলীতে তো নহেই। বিশেষভাবে ক্ষুদ্র দুই একটি পদের দ্বারা অনন্তের ভাব বিকাশ করা, অতি সাধারণ দুইটি কথায় প্রেমতত্ত্বের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ, উৎপ্রেক্ষা অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি অলঙ্কার, কাব্যের প্রসাদগুণ ইত্যাদি যাহা কিছু কাব্যের উৎকর্ষ জন্মায়, তাহা হরিকথার পদে বহুল পরিমাণে বর্ত্তমানে থাকিয়া পদসকলকে কাব্য সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান প্রদান করিতেছে।

বিশেষতঃ—প্রভুর পদে যে একটা লীলাচিত্র জল্‌জল্ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে উহা অন্যত্র দুর্লভ। 'লীলা' চিত্র আঁকিতে বসিয়া প্রভু যেমনই লেখনী ধরিয়াছেন, অমনই লীলানুযায়ী ভাবপ্রকাশক পদাবলী যেন লীলোদ্যানে ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্যের রীতি বৈদর্ভী রীতির মত সরল সহজ ও কৃত্রিমতাবর্জ্জিত। পাখীর গানে যে সাহজিক ঝঙ্কার, তটিনীর কলতানে যে স্বাভাবিক প্রাণের উচ্ছ্বাস, ভ্রমর গুঞ্জনে যে আকুল মূর্চ্ছনা, কোকিলের পঞ্চমতানে যে প্রাণোন্মাদক সুর,—হরিকথার পদাবলীতে যেন তাহারা সকলেই একটা আশ্চর্য্য মিলনে মিলিত হইয়া একটি অনির্ব্বচনীয় কবিত্বকুসুমের নিকুঞ্জকানন সৃষ্টি করিয়াছে। হরিকথার পদ আস্বাদন করিতে করিতে স্বতঃই মহর্ষির সেই অমোঘ বাক্য মনে হয়, "স্বাদু স্বাদু পদে পদে।" একে তো আমি নিতান্ত অনধিকারী, তার উপর এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব, কাজেই বাধ্য হইয়া আমাকে সংক্ষেপে শুধু দিঙ্‌মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষান্ত

হইতে হইতেছে। নিম্নে উদ্ধৃত পদ সকল আলোচনা করিলে ভক্তগণ হরিকথার কবিত্বের কিছু আভাস পাইতে পারেন।

"আশুগতি উষাবতী সতী ললনা।
অমল আশুগ অগ্রে শুভ্র বসনা॥
(শাদা বাসে ঢাকা গো) (মলয় মরুত সনে)॥"

"শাখী-শাখে পাখীগণ যুগল জাগায়।
অরুণাঁখি, অঙ্গরাখি, নিরখি ঘুমায়।
(চেয়ে চেয়ে ঘুমায় রে) (এই রাধাকৃষ্ণ প্রেম)"

ভক্তগণ! উপরিলিখিত চিত্রটি ধ্যান করুন! রাধাশ্যাম কুঞ্জের ভিতরে ঘুমাইয়া আছেন, কিন্তু মুখে মুখ দিয়া উভয়ে উভয়ের বদন পানে চাহিয়াই রহিয়াছেন। দর্শনলালসা এত শক্তিমতী যে, নিদ্রার প্রবাহকে অতিক্রম করিয়া উভয়ের অক্ষিযুগল উন্মীলিত হইয়াই রহিয়াছেন, অপলক নয়নে উভয়ে উভয়কে দেখিতেছেন, কি জানি পাছে 'পলকে প্রলয় হইয়া যায়, চক্ষু মুদিলে যদি ইষ্টরূপ আর না দেখিতে পাই এই আশঙ্কায় কারও আঁখি নিমীলিত হয় নাই। মরি! মরি!! এই পদের ভাবসমৃদ্ধির তুলনা নাই। অপ্রাকৃত রাধাগোবিন্দ লীলাতে অসম্ভব সম্ভব হইয়া যায়, যুগলপ্রেম, যুগলমাধুরী যে কি অপরূপ সামগ্রী, এই অপরূপ পদে প্রভু তাহাই দেখাইতেছেন। ইহা সাধারণ পদ নহে—লীলাকারীর প্রত্যক্ষানুভূতি। সেই যে মহাজনের বাণী শুনিয়াছি, "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।" সেই বাণীর চরম সার্থকতা আজ আমরা এই পদের ভিতর পাইতেছি। তারপর,—

"নাগর বর রস গরগর।
রাই কোরে রে প্রেম ঢরঢর॥
অলস মুদিত অরুণ আঁখি।
মিলিত দুতনু শপথ রাখি॥

দুঁহু তনু এমন গাঢ় মিলনে মিলিত হইয়াছে যে, অরুণোদয়ে কুঞ্জভঙ্গ হওয়ার সময় আসিয়াছে, সখীগণসহ বনদেবী বৃন্দাবনের পশু ও পক্ষীকুল-সহ আকুল হইয়া যুগল জাগাইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু যুগল জাগিয়াও জাগিতেছেন না। চেষ্টা করিয়াও একে অন্যের অঙ্গ হইতে নিজ অঙ্গ বিশ্লেষ করিতে পারিতেছেন না, মনে হয় যেন উভয়ের তনু শপথ করিয়া একে অপরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার! কি অপূর্ব্ব কবিত্ব! কি মধুর মধুর ভাব !!

"ভ্রমরক কেশপাশী, বালকচ শিখা হাসি,
শীর্ষণ্য শিরস্থ ঢলঢল।
নীলিমাঙ্ক ধরাধরে, বারিধি বীচি সম্বরে,
কালিন্দী কল্লোল কলকল ॥"

সান্ত সবিগ্রহ, পরমেশ্বরের রূপবর্ণনায় অনন্তের আভাস কি সুন্দর-ভাবে দেওয়া হইয়াছে। রাধাশ্যাম যুগল হইয়া কুঞ্জাভ্যন্তরে ঘুমাইতেছেন, একের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে কেমন গাঢ়ভাবে মিলিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া পরস্পরের কেশদাম কিভাবে মিলিত হইয়া কি শোভাধারণ করিয়াছে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন। তন্বী শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠলগ্না হইয়া শুইয়া রহিয়াছেন। শ্রীমতীর কুঞ্চিত কেশপাশ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষের উপর পড়িয়াছে, তদুপরি উভয়ের প্রশ্বাস বায়ু লাগিয়া উহা ঈষদান্দোলিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া কবি উৎপ্রেক্ষা করিতেছেন, যেন নীলিমাঙ্ক-বিশিষ্ট পর্ব্বতের কোলে আসিয়া সাগর তাহার নীলবারি-রাশি ঢালিয়া দিতেছে, কেশপাশ আন্দোলনে ঈষৎ শব্দও হইতেছে, তাহা দেখিয়া কবি উৎপ্রেক্ষা করিতেছেন, হয়তো কালিন্দীতরঙ্গ আসিয়া গিরিরাজের কোলে কলকল শব্দে শুইয়া পড়িতেছে।

"গভীর কল্লোলে ধুনী কৃষ্ণগুণ গায়।
কলকল ক্ষেমরোলে তরঙ্গ বাজায়॥
(প্রেমে বাজাইছে গো) রসরঙ্গে তরঙ্গে)

এই পদের পরের সমস্ত পদ অপূর্ব্ব কবিত্বময়। ভক্তগণ নিজেরা আস্বাদন করিয়া ধন্য হউন। অর্থ স্ফুট। রূপের সমস্ত পদে এইরূপ মাধুর্য্য।

"অমল কমলদল পরিমল লোভে।
নভ ত্যজি, রবিশশি নখ-দশে শোভে॥
(ভু'লে ভু'লে র'ল) (গগন ভবন ছাড়ি)"

কি অনুপ্রাসের ছটা! উৎপ্রেক্ষার কি উচ্চভাব!! 'রাসের' পদ-মাধুর্য্য ইতঃপূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি; নিম্নে আর একটি পদ উদ্ধৃত হইল—

"কৈরবিনী চকোরিণী, চন্দ্রিকা পান।
তারারাজি শুভ সাজি, সখ্য মান॥
(মান হয় হয় না) (চিচি থু'য়ে পিপি কয়)
(জলদ, নেহারি রয়)"

উল্লিখিত পদে পদকর্ত্তা প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলিতেছেন, রাসপূর্ণিমার রজনীতে পূর্ণচন্দ্র আকাশে উদিত হইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রও যমুনার তীরে উদিত হইয়াছেন, তদ্দর্শনে কৈরবিনী ও চকোরিণী উভয়েই সুধাপানাভিলাষিণী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন কিন্তু চন্দ্রদেবের চারিপাশে তারকারাজিকে দর্শন করিয়া চকোরিণী মানিনী হওয়ার উপক্রম করিয়া যেমনই নবজলধর শ্যামের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি তিনি চকোরবৃত্তি পরিত্যাগ করতঃ চাতকীর ভাগ্যকে স্বীকার করিলেন এবং স্বীয় চি চি বুলি পরিত্যাগ করিয়া চাতকীর পি পি বুলিতে শ্যামজলদের নিকট কৃপাবারি যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন, আর

তাঁহার মান করা হইল না। দুটি পয়ারের ভিতর যে এত বড় একটি চিত্র লুক্কায়িত আছে ইহা ভাবিলেও চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়। এ যেন এক সূত্রাকারে কাব্য লেখা—কথা অতি কম—অথচ প্রকাণ্ড এক ভাবের মূর্ত্তি তাহার ভিতর লুক্কায়িত। যে প্রভু সপ্তদশ বর্ষকাল দুশ্চর মৌনব্রত ধারণ করিয়া মহাগম্ভীরালীলা করিয়াছেন, এই প্রকার পদ তিনি ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা রচিত হওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

হরিকথায় সর্ব্বাপেক্ষা মধুর কাব্য 'অলস'। ইহাতে প্রথমতঃ বাছা বাছা পদ—যাহার প্রত্যেকটির ভিতর এক একটি অপ্রাকৃত ভাব ভরা রহিয়াছে এবং যাহা সাধকের প্রাণে যুগল পীরিতির এক সোনার ছবি ফুটাইয়া তোলে; তদুপরি লীলার ক্রমানুযায়ী ছন্দের পরিবর্ত্তন, সঙ্গে সঙ্গে রসপরিপুষ্টি—এ এক অপূর্ব্ব সামগ্রী।

"নিকুঞ্জ নিবিড়ে ;—কলি পরাগ-বাসর
কুন্দ, মন্দতন্দ্রাধীরা, দ্বাররক্ষা-বর ॥
(কুন্দলতা তন্দ্রায়) (আর সবে ঘুমায়েছে)"

ভাবুক ও রসিক ভক্ত এই 'অলস'ই প্রভু জগদ্বন্ধুর মতে এবং প্রেমধর্ম্মের মতে 'ভজন রস'। সমস্ত রস পাকপ্রাপ্ত হইয়া এই অলসেই সিতামিশ্রিত্ব গাঢ়ক্ষীরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহার যত পরিপাক শক্তি, যাঁহার ভজন শক্তি যত বেশী, তিনি ততই ইহা আস্বাদন করুন এবং প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে 'অলসের' চিত্র একটির পর একটি হৃদয়ে ফুটাইয়া লীলা দর্শন ও আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হউন। প্রভু 'প্রকট রহস্যে' যে তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন 'অলসে'ও সেই তত্ত্বের আভাষ দিতেছেন।—

"ললিতার জানুদ্বয়, রাধাশ্যাম শিরাশ্রয়,
তিনতনু অলস-মিলনে ॥"

দেখুন ললিতার স্বরূপ কি !

"স্বর্ণতরু পাদে যেন, মতি মণি শোভে হেন,
কঞ্জ-দলে মহানিধি ধনে ॥
(থু ! থু ! ধন-কি মা) (রাইধন, রাইধন)"

প্রভু বলিতেছেন সুধু ধন বলিলে কি রাইয়ের সঙ্গে তুলনা হয় ? রাইধন রাইধনেরই মতন—অন্য ধন বলিলে সে যে প্রাকৃত বস্তু হইয়া পড়ে—তাহার সঙ্গে তো রাইধনের তুলনা হয় না ! আরও দেখুন,—

"পালঙ্কার্দ্ধ কোকনদ, তদুপরি চারিপদ,
মণিদীপ নূপুরে নিভায় ॥
(এত ব্যস্ত কেন ভাই) (আমি, নিভায়ে দিব)

যুগল কিশোর-কিশোরী কোকনদ প্রায় পালঙ্কের অর্দ্ধাংশে মেঘে-বিজুরী জড়াজড়ির মত শুইয়া রহিলেন, নিকুঞ্জ মন্দিরের মণিদীপকে নূপুর দিয়া ঢাকিয়া নিতে যুগল ব্যস্ত। পদকর্ত্তা ইহা দেখিয়া বলিতেছেন, "এত ব্যস্ত হ'য়ো না, নিঃসঙ্কোচে ঘুমাও আমি দীপ নিভায়ে দিব।" আহা ! এ মহাউদ্ধারণ গ্রন্থের পদলালিত্য ও লীলাচিত্রের কথা কার সাধ্য নিঃশেষে বর্ণনা করে ?

হরিকথার সর্ব্বত্র এই প্রকার গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য একাধারে রাখিয়া প্রভু পদযোজনা করিয়াছেন, স্বয়ং প্রভু এগ্রন্থ বুঝাইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, সুতরাং লীলাময় নিজে আপনি লীলা না বুঝাইলে কাহারও সাধ্য নাই যে এগ্রন্থের ষোল আনা ভাবোদ্ধার করিতে পারে। তবে যে অনধিকার চর্চ্চা করিলাম সে কেবল তাঁহারই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া। কেন না তিনি বলিয়াছেন, "অবিরাম পড়িলে রসও পাবে, বুঝিতেও পারিবে।" এখন বৈষ্ণব ও বান্ধবদিগের শ্রীচরণ শিরে ধারণ করিয়া এ জীবাধম এই প্রার্থনা করিতেছে যে, আপনারা কেহই

যেন এ মহাগ্রন্থ পাঠে বঞ্চিত না হন। ইহা আমার মৌনী প্রভুর রচনা, সুতরাং ইহাতে নিরর্থক পদ একটিও নাই। এই জীবাধম কেবল আত্মশোধনের জন্য গুরুবাক্য শিরে ধারণ করিয়া তাঁহারই আদেশে অসাধ্যসাধনে ব্রতী হইয়াছে। ইহাতে যদি কিছু গুণ থাকে তো তাহা সব সেই গুণময় তথা নির্গুণ প্রভুর, আর দোষ যাহা কিছু তজ্জন্য আমি দায়ী। ভক্তগণ এই পামরকে ক্ষমা করিয়া দোষত্রুটী উপেক্ষা করিয়া হরিকথারূপ শক্তিসুধা নিত্য পান করুন, ইহাই আমার সানুনয় নিবেদন। জয় জগদ্বন্ধু হরি

মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলী

গ্রন্থ		মূল্য
শ্রীশ্রীহরিকথা—		২৲
চন্দ্রপাত ও ত্রি[illegible]ল গ্রন্থ—		।০
শ্রীশ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলী—		৸০
চন্দ্রপাত মাধুর্য্য বিন্দু		১৲
মহামৃত্যু রঙ্গ—		১৲
মহাকীর্ত্তন মাধুরী—		।৵০
বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী	১ম খণ্ড	২॥০
,,	২য় ,,	২॥০
,,	৩য় ,,	২॥০
,,	৪র্থ ,,	২॥০
,,	৫ম ,,	২৸০
বন্ধুবার্ত্তা		৩৲
বাণীবিজয়—		১৲
ব্রহ্মগায়ত্রী—		॥০
গীতা ধ্যান—		১৸০
উপনিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ		২৲

গ্রন্থ	মূল্য
সংকীর্ত্তন পদামৃত	১৲
শ্রীশ্রীবন্ধু স্মরণ-মঙ্গল—	॥০
শ্রীশ্রীগৌর স্মরণ-মঙ্গল—	১৲
শ্রীশ্রীহরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল—	৸০
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ-মঙ্গল—	॥০
বন্ধুগীতি কুসুমাঞ্জলি —	৸০
বন্ধু কে ?	।০
মহানাম মহাকীর্ত্তন আস্বাদন—	৵০
ধর্ম্মপ্রসঙ্গে মিসনারী ও ভারতীয় সাধু—	॥০
প্রেমের বাণী—	।৵০
ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বজ্যোতিঃ	॥০
শ্রীশ্রীকেদার-বদ্রী দর্শন	।০
রামচরিত মানস—	১৲
প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি, রঙ্গিন	।০
,, ,, সাদা	৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীধাম শ্রী[illegible]—পোঃ শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর

মহাউদ্ধারণ[illegible]—৫৯, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা—১১

যোগীভূষণ [illegible]—৯৭ বি, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীশ্রীহরিসভা[illegible]: নবদ্বীপ, নদীয়া

মহেশ লাইব্রেরী—২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা

দাসগুপ্ত এণ্ড কোং—৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।